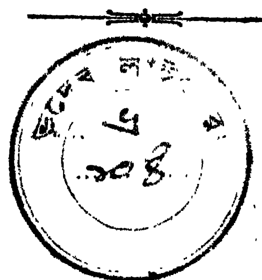
ভ্রমণ-কাহিনী



শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এম্ এ

মূল্য এক টাকা চার আনা মাত্র

১৩ এ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট; কলিকাতা, ভূদেব প্রিণ্টিং এণ্ড
পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩, এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বুধোদয় প্রেস হইতে
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং

স্বর্গীয়

অভিলাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের

তৃপ্ত্যর্থ

এই গ্রন্থ

ভক্তি পূর্ব্বক

উৎসর্গ

করিলাম।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

—— :*: ——

এই ভ্রমণ-কাহিনীগুলি পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সাহিত্য, উদ্বোধন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

দিল্লী
অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

—:o:—

ভ্রমণ-কাহিনী

তক্ষশিলা

লাহোর হইতে পেশোয়ার যাইবার পথে সরাইকালা জংশন নামে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। সরাইকালা রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত। এখান হইতে হাভেলিয়ান্ পর্য্যন্ত একটী শাখা রেলপথ বিস্তৃত,—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের গ্রীষ্মাবাস অ্যাবটাবাদে এই পথে যাইতে হয়। এই সরাইকালা ষ্টেসনের নিকটেই তক্ষশিলা নামক বিখ্যাত প্রাচীন নগরের লুপ্তোদ্ধার হইয়াছে। সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশে প্রত্নতত্ত্বহিসাবে এই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মূল্যবান্। *

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা সরাইকালা রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনে কোন টাঙ্গা † দেখিতে পাইলাম না। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে টাঙ্গা আনিবার জন্য একটী মুসলমান বালককে পাঠাইলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কোন ফল হইল না। কিছু দূরে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের আফিস দেখা যাইতেছিল; আমরা পদব্রজে আফিস অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

আফিসের কর্ম্মচারিগণ অধিকাংশই বাঙ্গালী। লুপ্তোদ্ধারগুলি দেখিবার জন্য তাঁহারা একটী ছাপা অনুমতিপত্র দিলেন। তাঁহাদের

* এই প্রবন্ধ যখন লিখিত হইয়াছিল তখন রোপার লুপ্তোদ্ধার হয় নাই।

† পঞ্জাবের প্রচলিত দ্বিচক্র অশ্বযান।

নিকটে সন্ধান লইয়া জানিলাম, ৪।৫ জায়গায় খনন কার্য্য চলিতেছে,—স্থানগুলির মধ্যে ব্যবধান কোন কোন স্থলে প্রায় ৪ মাইল। আফিসের নিকটেই একটী মিউজিয়ম। সেখানে বহুসংখ্যক সুগঠিত বৌদ্ধমূর্ত্তি, একটী শিলালিপি এবং নানাপ্রকার তৈজসপত্র ও গৃহসজ্জা দেখিলাম। প্রাচীন নগরের লুপ্তোদ্ধার করিবার সময়ে একটী লোহার Folding chair এবং কয়েকখণ্ড কাঁচের শিশি-বোতল ভাঙ্গা পাওয়া গিয়াছিল। সেই বহু প্রাচীন কালেও যে এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার ছিল, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই।

মিউজিয়ম দেখিয়া আমরা 'চীর টোপ' দেখিতে চলিলাম। দুইপার্শ্বে শস্যক্ষেত্র, মধ্য দিয়া পথ। পথ অনবরত নামিয়া চলিয়াছে। স্থানে স্থানে এত দ্রুতভাবে নামিতে হইতেছিল যে, আশঙ্কা হইতেছিল, গাড়ী পাছে উল্টাইয়া যায়। অবশেষে আমরা গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে পদব্রজে কিছু পথ আরোহণ করিয়া একটা স্তূপমূলে উপস্থিত হইলাম। এই স্তূপের নাম 'চীর টোপ'। একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর এই স্তূপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মধ্যস্থলে স্তূপ, চারিদিকে স্তম্ভ, কক্ষ প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। একস্থানে একটী জলের সুবৃহৎ চৌবাচ্চার ন্যায় রহিয়াছে,—তাহা হইতে বোধ হয় এই স্থানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জল সরবরাহ হইত। একটী কক্ষ মধ্যে চারিটি মনুষ্য-মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটি খুব ছোট, একটী তদপেক্ষা বৃহৎ, তৃতীয়টি আরও বড়, চতুর্থ মূর্ত্তিটি প্রকাণ্ডকায়। এই চতুর্থ মূর্ত্তিটির মাত্র গুল্‌ফ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, উপরের সমস্ত অংশটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পদতলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ফিট; সুতরাং অভগ্ন অবস্থায় মূর্ত্তিটি ৩৫ ফিট উচ্চ ছিল—প্রায় আড়াইতলা বাটীর ন্যায় উচ্চ হইবে। এরূপ বিভিন্ন আকারের মনুষ্য-মূর্ত্তি কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। আমাদের

প্রত্নতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ চক্ষে মনে হইল, ইহারা হয় ত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের মনুষ্যদেহের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতেছে।

'চীর টোপ' হইতে 'সিরকপ' চলিলাম। হাঁটা পথ। পথের ধারে কিছু চাষ হইয়াছিল; কিন্তু চারিদিকের বৃক্ষলতাবর্জ্জিত শিলাময় পাহাড়গুলি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে নিরতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য সেই এক মাইল পথ যাইতেই আমাদের খুব কষ্ট হইল। পথের ধারে পাহাড়ের উপর একটী স্তূপ দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম। ইহার নাম 'কুণাল-স্তূপ'। অশোকের পুত্রের নাম কুণাল। কুণাল অশোকের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাহার চক্ষু দুইটি কুণাল পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্র ও মনোহর ছিল বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল কুণাল। কুণালের বিমাতা কুণালের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট অন্যায় প্রস্তাব করিয়াছিল, কুণাল তাহাতে রাজি হয় নাই। এজন্য ক্রুদ্ধা রমণীর চক্রান্তে কুণালকে তক্ষশিলায় পাঠান হয় এবং তথায় তাহার চক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অন্ধ কুণাল মগধে পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল এবং কেহ কেহ বলেন, পুনরায় দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিল। পুত্র-স্নেহ-প্রণোদিত হইয়া অশোক এই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কুণাল-স্তূপের নীচেই 'সিরকপ' নামক স্থানে প্রাচীন নগরের সুস্পষ্ট নিদর্শন সকল আবিষ্কার করা হইয়াছে। নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে—কুণাল-স্তূপের নিকটেই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। নগরের পশ্চিমপ্রান্তে সুবৃহৎ তোরণ। এই দুই স্থানের মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমভাবে বিস্তৃত রাজপথ। পথের দুই পাশে ঘরবাড়ী, দেবালয়, বৌদ্ধ মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পথের ঠিক ধারেই যে প্রকোষ্ঠগুলি অবস্থিত ছিল, সেগুলি কতকটা দোকান-ঘরের ন্যায় বোধ হইল। কোথাও দ্বার অতিক্রম করিয়াই প্রাঙ্গণ—প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রকোষ্ঠ। সাধারণতঃ প্রকোষ্ঠ

গুলির আয়তন কিছু ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইল। বলা বাহুল্য, ইষ্টকালয়-গুলির কেবলমাত্র নিম্ন অংশগুলিই এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, উপরের অংশগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রধান রাজপথের দুইপাশে প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত কতকগুলি সঙ্কীর্ণ গলি দেখিতে পাইলাম। একটা মন্দিরের গাত্রে কতকগুলি হিন্দু-তোরণ, বৌদ্ধ-স্তূপ এবং গ্রীক স্তম্ভশীর্ষের (Capital) প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তক্ষশিলাতে যে এই তিনটি প্রাচীন সভ্যতার সংমিশ্রণ হইয়াছিল, ইহা তাহার একটা সুন্দর নিদর্শন।

তক্ষশিলাতে তিনটি স্থলে প্রাচীন নগরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নগরের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে. প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের আফিসের ঠিক পার্শ্বেই। সম্ভবতঃ গ্রীক অভিযানের পূর্ব্বে এই নগর বর্ত্তমান ছিল। এ স্থানটি এখনও বিস্তারিতভাবে খনন করা হয় নাই; এবং এখানে এ পর্য্যন্ত প্রাচীন লোকালয়ের মাত্র যৎসামান্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী যুগের নগর ছিল বর্ত্তমান শিরকপ নামক স্থানে। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খনন করা হইয়াছে। রাজপথ, দেবালয়, প্রাসাদ, তোরণ, প্রাচীর, পরিখা প্রভৃতি প্রাচীন নগরের নিদর্শনগুলি অতি পরিষ্কারভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এখানে একাধিক নগর অবস্থিত ছিল; কারণ, কখন কখনও প্রকোষ্ঠের নীচে খুঁড়িতে খুঁড়িতে প্রকোষ্ঠের মাঝখান দিয়া আর একটা দেয়াল বাহির হইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে। অনুমান হয় যে নীচের দেয়াল প্রাচীনতর নগরের চিহ্ন, যাহার ধ্বংসের উপর পরবর্ত্তী যুগের নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৃতীয় আর একস্থানে প্রাচীন নগরের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে—এখন সেখানে একটা গ্রাম। এই তৃতীয় নগরের ধ্বংসোদ্ধার সিরকপের

লুপ্তোদ্ধারের ন্যায় সুস্পষ্ট বা কৌতূহলোদ্দীপক নহে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পথের উপরেই তক্ষশিলা অবস্থিত ছিল বলিয়া তক্ষশিলা বহুবার বিদেশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এজন্য তক্ষশিলাতে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন যুগের নগরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আমরা শিরকপের প্রাচীন রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলাম। পথের মধ্যস্থলে লৌহবর্ত্ম পাতা হইয়াছে। তাহার উপর ক্ষুদ্র লৌহ-শকটে (truck) মাটি বোঝাই করিয়া নগরের পশ্চিমপ্রান্তে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে যে মাটি বাহির হইতেছে, তাহা এই উপায়ে নগরের পশ্চিমে প্রাচীর ও পরিখার বাহিরে, প্রকাণ্ড স্তূপাকারে পরিণত করা হইয়াছে। পথের দুইধারে প্রাচীন গৃহগুলির মধ্যস্থলে সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান প্রস্তুত হইয়াছে, লাল-নীল-পীত নানাবর্ণের ফুলগুলি বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য—প্রাচীন নগরের শিলাময় নিদর্শনগুলি সুন্দরতর করা। শুনিলাম ক্রীট, গ্রীস, প্রভৃতি য়ুরোপের যে সকল স্থলে প্রাচীন কীর্ত্তির লুপ্তোদ্ধার করা হয়, সেই সকল স্থানও এই ভাবে ফুলগাছ দিয়া সাজান হয়।

নগরের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত তোরণ-পথে নির্গত হইয়া আমরা অদূরবর্ত্তী 'জণ্ডিয়াল' মন্দির দেখিতে গেলাম। প্রথমে সোপানাবলি আরোহণ করিয়া মন্দির-সংলগ্ন উচ্চ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম;—আরও কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দির-মূলে উপনীত হইলাম। সম্মুখে চতুষ্কোণাকারে অবস্থিত চারিটি বৃহৎ স্তম্ভ, তাহার পর একটি কক্ষ; তাহার পরের কক্ষটি গর্ভগৃহ বলিয়া বোধ হইল; এই কক্ষ-মধ্যে একটী উচ্চ মঞ্চ রহিয়াছে; মঞ্চে আরোহণ করিবার সোপানাবলি এখনও বর্ত্তমান। চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার পথ দেখিতে পাওয়া গেল।

মন্দিরটি যে একটা বৃহৎ ব্যাপার ছিল তাহা ধ্বংসাবশেষ দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হয়। Sir John Marshall মনে করেন যে, ইহা গ্রীক-মন্দির, কারণ গ্রীকদের নির্ম্মিত মন্দিরের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু গ্রীক-প্রভাব-সম্পর্কহীন হিন্দু দেবালয়ের সহিতও ইহার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাকে হিন্দু-মন্দির মনে করিতে কিছুমাত্র কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না।

শিরকপ হইতে ৪।৫ মাইল দূরে জৌলিয়াঁ ও মোরা মরাদো নামক স্থানে বৌদ্ধ-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যানাভাবে আমাদের সেখানে যাওয়া হয় নাই।

তক্ষশিলার উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় সিন্ধু-নদের উভয় তীরবর্ত্তী রমণীয় দেশে গন্ধর্ব্বগণ বাস করিত।

অয়ং গন্ধর্ব্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।
তং রক্ষন্তি গন্ধর্ব্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকোবিদাঃ॥

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ১০০ সর্গ ১০ ও ১১ শ্লোক।

"গন্ধর্ব্বদের এই দেশ ফলমূল প্রভৃতি দ্বারা শোভিত। ইহা সিন্ধু-নদের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত এবং পরম রমণীয়। অস্ত্রধারী এবং যুদ্ধে পারদর্শী গন্ধর্ব্বগণ এই দেশ রক্ষা করিয়া থাকে।"

শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের শেষভাগে ভরতের মাতুল কেকয়রাজ যুধাজিতের অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র সিন্ধু-তীরবর্ত্তী গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিবার জন্য ভরতের অধীনে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তক্ষ ও পুষ্কল নামক ভরতের পুত্রদ্বয়ও এই সৈন্যের সহিত গমন করিয়াছিল। তাঁহারা

গন্ধর্ব্বদেশের নিকটবর্ত্তী হইলে যুধাজিৎ সসৈন্যে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। * গন্ধর্ব্বগণ তাহাদের দেশ আক্রান্ত হইতে দেখিয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইল। তাহাদের সৈন্য সংখ্যা তিন কোটি। সপ্তরাত্রি ব্যাপিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল অবশেষে ভরতের শৌর্য্যে গন্ধর্ব্ব-সৈন্য পরাস্ত হইল। অতঃপর ভরত গন্ধর্ব্বরাজ্যে দুইটী নগর স্থাপন করিয়া তাঁহার দুই পুত্রকে দুই নগরে অভিষিক্ত করিলেন। তক্ষের নগরের নাম হইল তক্ষশিলা এবং পুষ্কলের নগরের নাম হইল পুষ্কলাবত। নগরদ্বয়ের সৌন্দর্য্য রামায়ণে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা পড়িলে বোধ হয় তাদৃশ প্রাচীন সময়েও নগর-নির্ম্মাণ-বিদ্যায় হিন্দুগণ যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিয়াছিল।

হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে॥
তক্ষং তক্ষশিলায়াং চ পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্ববিষয়ে রুচিরে গান্ধার বিষয়ে চ সঃ॥
ধনরত্নৌঘ সঙ্কীর্ণে কাননৈরুপশোভিতে।
অন্যোন্য-সংঘর্ষ-কৃতে স্পর্দ্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ।
উভে সুরুচিরপ্রখ্যে ব্যবহারৈরকিল্বিষৈঃ।
উদ্যানযানসংপূর্ণে সুবিভক্তান্তরাপণে॥
উভে পুরবরে রম্যে বিস্তরৈরুপশোভিতে।
গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্বিমানৈর্বহুভির্বৃতে॥

---

* ইহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে কেকয় রাজ্য বর্ত্তমান পঞ্জাবের নিকটে অবস্থিত ছিল। প্রবাদ এই যে আধুনিক কাঙ্গড়াই প্রাচীন কেকয় রাজ্য।

শোভিতে শোভনীয়ৈশ্চ দেবায়তনবিস্তরৈঃ।
তালৈস্তমালৈস্তিলকৈর্বকুলৈ-রুপশোভিতে॥

উত্তরকাণ্ড ১০১ম সর্গ—১৫ শ্লোক।

"সেই সকল গন্ধর্ব্বগণ নিহত হইবার পর কেকয়ী-পুত্র, ভরত দুইটি সমৃদ্ধিশালী নগর নির্ম্মাণ করিলেন। তক্ষকে তক্ষশিলাতে এবং পুষ্কলকে পুষ্কলাবত নগরে স্থাপিত করিলেন। তক্ষশিলা গন্ধর্ব্বদেশে অবস্থিত ছিল এবং পুষ্কলাবত গান্ধারদেশে অবস্থিত ছিল। নগরদ্বয় প্রভূত ধনরত্ন সংযুক্ত এবং বহুসংখ্যক কাননের দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাহারা যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া অশেষ গুণশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধর্ম্ম-ন্যায়োপেত ব্যবহারে উভয় নগর বিখ্যাত হইয়াছিল। তাহারা উদ্যান ও যানে পরিপূর্ণ ছিল; আপণিসমূহ নির্দ্দিষ্ট অন্তরালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উভয় নগরই বিস্তর পদার্থে সুশোভিত ছিল। উৎকৃষ্ট সুবৃহৎ গৃহ, সপ্ততল প্রাসাদ (বিমান), অসংখ্য দেবমন্দির প্রভৃতির দ্বারা নগরদ্বয় সুশোভিত ছিল। তাল, তমাল, তিলক, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা নগরদ্বয় উপশোভিত হইয়াছিল।"

শিরকপের ভূগর্ভ-প্রোথিত রাজপথ দিয়া চলিবার সময় মনে হয় যেন রামায়ণ-বর্ণিত "সুবিভক্তান্তরাপণ" "গৃহমুখ্যৈঃ দেবায়তন বিস্তরৈরুপ-শোভিত" প্রভৃতি বিশেষণগুলি প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রামায়ণের বর্ণনা তক্ষশিলার প্রাচীনতম নগর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে,—শিরকপ বহুকাল পরবর্ত্তী নগর।

রামায়ণের উপরি-উদ্ধৃত অংশে উক্ত হইয়াছে যে, তক্ষশিলা গন্ধর্ব্ব-দেশে এবং পুষ্কলাবত গান্ধারদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গন্ধর্ব্বদেশ সিন্ধুর উভয় তীরে এবং গান্ধারদেশ আরও পশ্চিমে (বর্ত্তমান পেশোয়ার জেলা) অবস্থিত ছিল। পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী চার্ষাদা নামক স্থানে

এই পুষ্কলাবত নগর ছিল বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন। কালিদাস রঘুবংশে এই দুই নগরের স্থাপন-কাহিনী উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাসের বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত অথচ কবিত্বপূর্ণ।

ভরতস্তত্র গন্ধর্ব্বান্ যুধি নির্জ্জিত্য কেবলান্।
আতোদ্যান গ্রাহয়ামাস সমত্যা জয়দায়ুধং ॥
স তক্ষপুষ্কলৌ পুত্রৌ রাজধান্যো-স্তদাখ্যয়োঃ।
অভিষিচ্যা-ভিষেকার্হৌ রামান্তিকমগাৎ পুনঃ ॥

রঘুবংশ, ১৫ সর্গ, ৯০ ও ৯১ শ্লোক।

"ভরত যুদ্ধে গন্ধর্ব্বদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করাইয়া কেবল বীণা গ্রহণ করাইলেন। তিনি তক্ষ ও পুষ্কল নামক পুত্রদ্বয়কে তাহাদের নামানুযায়ী নগরে অভিষেক করিয়া পুনরায় রামের নিকট ফিরিয়া গেলেন।"

গন্ধর্ব্বগণ যে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিল, কালিদাস এখানে সেই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

বৌদ্ধযুগে তক্ষশিলা অত্যন্ত বিখ্যাত নগর হইয়াছিল। বৌদ্ধ-জাতক গল্পে বহুস্থানে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধপ্রবাদ অনুসারে এখানে বুদ্ধদেব কোন পূর্ব্ববর্ত্তী বোধিসত্ত্ব বিগ্রহে এক ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের তৃপ্তির জন্য তাঁহার মস্তক অর্পণ করিয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই শিরকপ নামের উৎপত্তি হয়। ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান, পারস্য, আরব প্রভৃতি নানাস্থানের বণিকগণ তক্ষশিলাতে সমবেত হইত। কিন্তু শুদ্ধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যই যে তক্ষশিলা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে; এখানে বহুসংখ্যক স্তূপ ও বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল;—এখনও নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর সেই সকল স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ পথিকের নয়নগোচর হয়। অনতিকাল-মধ্যে তক্ষশিলা বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান

কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করিল। সে সময় ভারতবর্ষের বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ তক্ষশিলায় উপস্থিত হইত। তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ণ শাস্ত্র ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুশীলনে সমধিক অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীক-সম্রাট আলেকজন্দর সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া যে রাজ্যে উপস্থিত হইলেন, তাহার রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। এই রাজ্য বিতস্তার * পূর্ব্বতীরবর্ত্তী দেশের বিখ্যাত রাজা পুরুর অধীন ছিল। তক্ষশিলার রাজপ্রতিনিধি, অম্ভি সেই সময় বিদ্রোহী হইয়া আলেকজন্দরের সহিত যোগদান করিয়া পুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। আলেকজন্দর পঞ্জাব পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার প্রতিনিধি ফিলিপাস তক্ষশিলার চতুর্দ্দিকের দেশ শাসনে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীক-শাসন স্থায়ী হয় নাই। যে বীরপুরুষের শৌর্য্যে এই সময় ভারতবর্ষ হইতে বিদেশীর প্রভুত্ব বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তাঁহার নাম চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে তাঁহার পৌত্র বিখ্যাত অশোকের সময় পর্য্যন্ত তক্ষশিলা (এবং সমগ্র উত্তর-ভারত) মগধরাজের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। অশোকের পর বিদেশীসৈন্য পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। খৃষ্টের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে শকগণ পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল জয় করিয়া তক্ষশিলাতে রাজত্ব করিয়াছিল। শকদের পর কুশানেরা রাজত্ব করে। কনিষ্কের রাজত্বের সময় কাশ্মীর ও সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ কুশানদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কনিষ্ক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং শকাব্দ প্রচলিত করেন। ক্রমশঃ কুশানদের অবনতি হয়। পঞ্চম খৃষ্টাব্দে হূনেরা তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া উত্তর ভারতে রাজত্ব স্থাপন করে। হূনবংশীয় বিখ্যাত মিহিরকুল বিক্রমাদিত্য দ্বারা পরাজিত

* বর্ত্তমান ঝেলম্ নদ।

ও নিহত হইবার পর সমগ্র উত্তর ভারত বিক্রমাদিত্যের শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হুয়েণ সাং তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত উভয় নগরই পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তক্ষশিলার নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আমরা অপরাহ্নে ধীরে ধীরে রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। সেই অতীতকালের দুই চারিটি দৃশ্য আমার মানস-নেত্রে আবিষ্কৃত হইল। বহু-জনাকীর্ণ রাজপথ—কত বিভিন্ন দেশের লোক, ভারতবাসী, চীন, পারস্য, আরব, গ্রীক,—তাহাদের বিচিত্র বেশভূষা। রাজপথের উভয় পার্শ্বে বিপণীশ্রেণী নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। দোকানে ক্রয় বিক্রয় চলিয়াছে; রাজপথে গোযান, অশ্বযান, মনুষ্য-বাহ্যযান, নানাপ্রকার যান চলিয়াছে। সমুচ্চ অট্টালিকাসকল পথপার্শ্বে শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে "তাল-তমাল তিলক-বকুল" প্রভৃতি পরিপূর্ণ উপবন,—নগরবাসিগণ তাহাদের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় নগরের অসংখ্য দেবালয় হইতে আরতির ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। অধিক রাত্রে বিলাসীদের গৃহ হইতে সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি শোনা যাইতেছে, কারণ তক্ষশিলা সঙ্গীত কুশল গন্ধর্ব্বদের নগর। কোন-দিন নগর উৎসববেশে সজ্জিত হইত, গৃহসকল বিবিধবর্ণের বিচিত্র বস্ত্রে মণ্ডিত হইত, রাজপথের উপর পুষ্পমালাসংবৃত তোরণ নির্ম্মিত হইত, হয়ত রাজা বা মন্দিরের দেবতা শোভাযাত্রা করিতেন; রাজপথ-পার্শ্বস্থিত গৃহবাতায়নসমূহে কৌতূহলী রমণীবৃন্দের নয়নসকল ফুল্লেন্দীবরবৎ শোভা পাইত। নগরের বাহিরে বিদ্যার্থিগণ গুরুসমীপে নিবিষ্টচিত্তে পাঠাভ্যাস করিত, ছুটি বা উৎসবের দিন দল বাঁধিয়া নগরে বেড়াইতে আসিত। গভীর নিশীথে নগরের দ্বার রুদ্ধ হইত; ক্রমশঃ সকল কোলাহল থামিয়া যাইত,

"কেবল প্রাচীরের উপর প্রহরী সতর্ক-পাদবিক্ষেপ করিয়া চলিয়া বেড়াইত। কোনও একদিন অশ্ব ছুটাইয়া সৈনিক আসিয়া সংবাদ দিল শত্রুসৈন্য সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছে। নগরে যুদ্ধের সাড়া পড়িয়া গেল, সৈনিকগণ বর্ম্ম পরিয়া দ্রুতপদে গমনাগমন করিতে লাগিল, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং অশ্বের পদশব্দে রাজমার্গ মুখরিত হইল। শত্রু-সৈন্য নগর আক্রমণ করিল, ভীষণ যুদ্ধ হইল, রাজপথে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল, হয়ত শত্রু-সৈন্য জয়লাভ করিয়া নগরধ্বংস করিয়া ফেলিল, আবার অদূরে নূতন নগর নির্ম্মিত হইল, আবার নগরবাসিগণ আনন্দ কোলাহলের মধ্যে জীবন যাত্রা আরম্ভ করিল। ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি যদি কথা বলিতে পারিত, কত শত অতীত কাহিনী বলিয়া আমাদিগকে বিস্মিত পুলকিত ও বিচলিত করিতে পারিত। সেই গৌরবের দিন অতীত হইয়াছে। আজ আর কিছুই নাই—কত গৌরবের দৃশ্য, কত বীরত্বের অভিনয় কত শোকাবহ ঘটনা কালসমুদ্রে ফুটিয়া উঠিয়া আবার চিরতরে মিলাইয়া গিয়াছে। কিছুই নাই। আছে কোন স্মৃতি—ক্ষীণ, অস্পষ্ট, অর্দ্ধবিস্মৃত। সত্যই কবি বলিয়াছেন—

যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

"যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গিয়াছে? রঘুপতির উত্তর কোশলই বা কোথায়? ইহা চিন্তা করিয়া মন স্থির করিবে। এই জগৎ যে সত্য নহে তাহাই নিশ্চয় করিয়া জানিবে।"

ডালহাউসী ও চাম্বা

ডালহাউসী যাইব বলিয়া এক নিদাঘের অপরাহ্ণে আমরা লাহোর হইতে যাত্রা করিলাম। বাসা হইতে যখন বাহির হইলাম তখন ৮টা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু লাহোরে তখনও সন্ধ্যা হয় নাই! মোজাংএর বস্তি পার হইয়া, মল্ (Mall) বা "ঠাণ্ডি সড়ক্" অতিক্রম করিয়া আমরা ষ্টেশনের রাস্তা ধরিলাম। সমস্ত দিন প্রবল গ্রীষ্মাভিতপ্ত হইয়া প্রদোষকালে নাগরিকগণ অগণিত টাঙ্গা এবং মোটরকারে চড়িয়া বায়ুসেবনার্থ লরেন্স গার্ডেন উপবন অভিমুখে চলিয়াছে। টাঙ্গাগুলি ঢং ঢং শব্দ করিয়া ছুটিয়াছে, মোটরের হর্ণ অনবরত বাজিতেছে, ক্বচিৎ কোন মোটর অত্যন্ত কর্কশ ও উদ্ধত চীৎকারে পদাতিকগণকে সচকিত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। যখন ষ্টেশনে পৌছিলাম, তখনও ট্রেণ ছাড়িতে অনেক বিলম্ব। ধীরে সুস্থে টিকিট করিয়া পুল (overbridge) দিয়া বিশাল লাহোর ষ্টেশনের প্লাটফরমগুলি অতিক্রম করিয়া ট্রেণের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আশ্রয় লইলাম।

ডালহাউসী হিমালয় পাহাড়ের উপর একটি শৈলনিবাস। ইহা লাহোরের উত্তরে অবস্থিত। লাহোর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত ১০০ মাইল রেলে আসিতে হয়। পাঠানকোট হইতে ডালহাউসী পর্য্যন্ত ৫২ মাইল পার্ব্বত্য পথ, মোটর বা টমটমে আসিতে হয়। ডালহাউসী গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা (subdivison)। ডালহাউসীর চারিদিকে চাম্বারাজ্য। পূর্ব্বে ডালহাউসী পাহাড়টিও চাম্বা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া ইংরেজ সরকার চাম্বারাজ

কর্ত্তৃক দেয় রাজকর কমাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে স্থানটি অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ডালহাউসীর অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা ৬৫০০ ফিট হইতে ৮০০০ ফিট, অর্থাৎ স্থানটি প্রায় দার্জিলিংএর সমান উচ্চ। ধওলাধর নামক হিমালয়ের অন্তর্গত চির তুষারাবৃত শৈলশ্রেণী হইতে যে সকল শাখা পর্ব্বত বিভিন্ন দিকে নামিয়া গিয়াছে, তাহারই পশ্চিম দিকের পাহাড়ের উপর ডালহাউসী অবস্থিত। এই ধওলাধরের শিখরগুলি ১৭০০০—১৮০০০ ফিট উচ্চ। ইহার একদিকে চাম্বারাজ্য, অপর দিকে কাঙ্গড়া (প্রাচীন নগরকোট রাজ্য)।

রাত্রি ১০টার পর আমাদের ট্রেণ ছাড়িল। অমৃতসর পর্য্যন্ত Main line ধরিয়া আসিয়া অমৃতসর হইতে পাঠানকোট পর্য্যন্ত ট্রেণ শাখালাইনে চলিল। যখন পাঠানকোট পৌছিলাম, তখনও প্রভাত হয় নাই। প্রভাত পর্য্যন্ত ট্রেণেই বিশ্রাম করিলাম। পাঠানকোট গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের পাদদেশস্থিত একটি তহশিল। এখানে যে সকল প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া কানিংহাম স্থির করিয়াছেন যে প্রাচীনকালে উদুম্বরেরা এখানে বাস করিত। তাহারা পুরাণোল্লিখিত ত্রৈগর্ত্তের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। তাহাদের রাজধানী ছিল নূরপুর। পাঠানকোট হইতে কাঙ্গড়া যাইবার পথে প্রাচীন নূরপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নূরপুরের রাজপুত রাজাদের উপাধি ছিল পাঠানিয়া। তাহা হইতেই পাঠানকোট নামের উৎপত্তি। পাঠানকোট হইতে ৬ মাইল দূরে শাপুরের নিকট রাবী নদীর তীরে গুহার মধ্যে মুক্তেশ্বরের মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে পাণ্ডবগণ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাঠানকোটের ১৫ মাইল পূর্ব্বে ডেরানানক নামক স্থানে শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নানক শেষ জীবনে বাস করিতেন। এইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

পাঠানকোটে স্নান এবং জলযোগ সারিয়া আমরা মোটরে উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র নগরটি ছাড়াইয়া গেলাম। পথের দুই ধারে সুবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী। দূরে আকাশের গায়ে পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। পাঠানকোট হইতে ৬ মাইল দূরে আসিয়া একটি পথ কাঙ্গড়া অভিমুখে, অপর পথ ডালহাউসী অভিমুখে গিয়াছে। এইবার সমতলভূমি ছাড়িয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। হিমালয়ের পাদদেশে যে অনুচ্চ শৈলশ্রেণী হিমালয়ের সহিত সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত আছে, তাহা শিবালিক পাহাড় নামে পরিচিত। বাঙ্গালা দেশে শিবালিক পাহাড় দেখা যায় না; হরিদ্বারে দেখা যায়। আমরা ক্রমে ক্রমে শিবালিকের দুইটি শ্রেণী (ridge) অতিক্রম করিলাম। আমাদের মোটর অনবরত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছিল; কখনও উপরে উঠিতেছিল, কখনও নীচে নামিতেছিল। চারিদিকে পাহাড়। পথের ধারে কোথাও গভীর খাত দেখা যাইতেছিল। এক স্থান হইতে বহু দূরে পর্ব্বতের ক্রোড়ে রাবী নদীর প্রবাহ দেখিতে পাইলাম। ধাওয়াল, ধর প্রভৃতি ছোট ছোট স্থান অতিক্রম করিয়া বেলা ৯টার পর আমরা দুনেরায় উপস্থিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত পথ অতিশয় আঁকাবাঁকা। দুনেরা পাঠানকোট হইতে ২৯ মাইল, এবং ডালহাউসী হইতে ২৩ মাইল। এখান হইতে ডালহাউসী খুব বেশী রকম চড়াই। তাহার উপর পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এ জন্য দুইটি মোটর পাশাপাশি যাওয়া বিপদ্‌জনক। সকাল ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এই পথে মোটর নামিতে পারে, কিন্তু উঠিতে দেওয়া হয় না; ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত মোটর উঠিতে পারে, নামিতে দেওয়া হয় না। এ জন্য দুনেরার ডাক বাঙ্গলোতে আমাদিগকে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। বেলা প্রায় ১১টার সময় উপর হইতে মোটর ও লরি নামিল; তখন আমরা উঠিতে

আরম্ভ করিলাম। মোটর বহু আয়াস সহকারে পাহাড়ের পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছিল। এক একটি পাহাড়ের শীর্ষে উঠিয়া আবার একটু নামিয়া অপর একটী পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। এই ভাবে বাকলো, নাইনিখত, চাওয়ারা ও ভানিখেত অতিক্রম করিলাম। বাকলোতে গোরা পল্টনের একটী ছাউনি আছে। ভানিখেতে প্রাচীন নাগদেবতার মন্দির আছে। এখানে আষাঢ় মাসে একটি বড় মেলা বসে। আমরা যে পাহাড়গুলি অতিক্রম করিলাম, সে গুলি প্রস্তরময়, এবং প্রায় বৃক্ষলতাদি হীন। পথের ধারে বহু নিম্নে একটি স্রোত প্রস্তরাকীর্ণ পথের উপর দিয়া ঝির ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে সুবিন্যস্ত সোপান শ্রেণীর ন্যায় ছোট ছোট ক্ষেতগুলি, এবং তাহার পাশে দুই চারিটি কৃষকদের ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছিল। পথের ধারে মাঝে মাঝে দুই চারিটি দোকানঘর। বেলা ১টার পর আমরা দূর হইতে নিবিড় বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন ডালহাউসী পাহাড় দেখিতে পাইলাম। একটু পরে আমাদের মোটর থামিল। এখান হইতে পদব্রজে মাইল খানেক পথ গিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থিরকৃত বাসায় উপস্থিত হইলাম।

পোট্রেন, টেহ্‌রা বা মোতিটিব্বা এবং বকরোটা এই তিনটি পাহাড়ের শিরোদেশে ডালহাউসী নগর অবস্থিত। ডালহাউসী দার্জ্জিলিংয়ের ন্যায় উচ্চ হইলেও গ্রীষ্মকালে তত ঠাণ্ডা হয় না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, গ্রীষ্মকালে পঞ্জাবের সমতলভূমি বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী গরম হয়। ডালহাউসী বেশ নির্জ্জন স্থান। উপরিউক্ত তিনটি পাহাড়ের চারিদিক বেষ্টন করিয়া তিনটি পথ আছে; সেগুলি মল্ (Mall) নামে অভিহিত। কোথাও পথ হইতে পঞ্জাবের সমতলভূমি চিত্রিতের ন্যায় দেখা যায়। দুইটি নদী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিবালিক শৈলশ্রেণী ভেদ করিয়া বনানী-শোভিত সমতলভূমির উপর দিয়া বিচিত্র

গতিতে প্রবাহিত হইয়া দূর দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। একটি নদীর নাম রাবী—এই রাবী নদীর উপর লাহোর অবস্থিত। অপর নদীর নাম চক্কি। ইহা বিয়াস বা বিপাশা নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। চক্কি যেখানে বিপাশার সহিত মিশিয়াছে, সে স্থানটিও এখান হইতে দেখা যায়। খুব পরিষ্কার দিনে পঞ্জাবের আরও দুইটি বড় নদী—শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা (Sutledge এবং Chenab), ও এখান হইতে দেখা যায়। কখনও কখনও বর্ষার মেঘমালা দক্ষিণ হইতে ভাসিয়া আসিয়া এই সুন্দর দৃশ্যটি ঢাকিয়া ফেলে। আবার বর্ষণের পর সমতলভূমি নূতন সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত হয়। তখন সমতলভূমি ঈষৎ নীলাভ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় প্রতিভাত হয়। কোন স্থান হইতে তুষারশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি আকাশের গায়ে চিত্রিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যালোকে বরফগুলি ঝলমল করিতেছে! বরফের পাহাড় এখান হইতে বেশী দূর নহে। পর্ব্বত শিখরস্থ বরফ হইতে মধ্যে মধ্যে স্রোত নামিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। স্থানে স্থানে বিশাল বরফের হ্রদ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিম্নে গভীর খদ, তাহার মধ্য দিয়া একটা স্রোত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। স্রোতের তীরে এবং নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর গৃহ এবং ক্ষেত্র। দূর হইতে গৃহগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র খেলার ঘরের ন্যায় বোধ হয়। চারিদিকে বৃহৎ পর্ব্বতগুলি তরঙ্গায়িত।

আমরা এক দিন দুই ক্রোশ দূরে পঞ্চপুল নামক স্রোত দেখিতে গিয়াছিলাম। পাহাড়ের ধার দিয়া পথটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে উপরে ও নীচে ঘন বৃক্ষশ্রেণী। চিউ বৃক্ষের লাল ফুলগুলি পাহাড় আলো করিয়া রাখিয়াছিল। ছোট ছোট পাহাড়ী বালিকা দুর্গম পর্ব্বত-গাত্রে আরোহণ করিয়া গরু, ভেড়া ও ছাগল চরাইতেছিল। পথে সাতধারা.

নামক স্থানে পাথরে বাঁধান ঝরণা হইতে ক্ষীণ জলধারা পড়িতেছে দেখিলাম। শুনা যায়, এই জল খুব উপকারী। আরও কিছু দূর গিয়া আমরা পঞ্চপুলের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে দুইটি পাহাড় মিশিয়াছে এবং সঙ্গমস্থলে দুইটি ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে। প্রায় চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের উপর অসংখ্য বৃক্ষ এবং বড় বড় পাথর। নির্ঝরের কলধ্বনি এবং বিহগকাকলীতে স্থানটি মুখরিত হইয়াছিল। এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে চিত্ত স্থির হয়। আমরা যখন ফিরিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। পাহাড়ের উপর আলোক ম্লান হইয়া আসিয়াছিল। নীচে একটী পার্ব্বত্য পল্লীতে মৃত্তিকালিপ্ত সমতল ছাদের উপর বসিয়া কয়েকটি পাহাড়ী বালক খেলা করিতেছিল।

ডালহাউসীর নিকট ডাইনকুণ্ড * নামক একটী শৈলশৃঙ্গ আছে, উহা ৯০০০ ফিট উচ্চ। আমরা একদিন প্রাতঃকালে ডাইনকুণ্ড দেখিতে চলিলাম। টেহরা পাহাড পার হইয়া বকরোটার চড়াই উঠিতে লাগিলাম। এই চড়াই উঠিতে বেশ বেগ পাইতে হয়। এখান হইতে নীচে বাথরু উপত্যকা এবং উপরে বরফের পাহাড় সুন্দর দেখায়। চড়াই উঠিয়া তার পর সমতল রাস্তা। এই রাস্তা প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ, বকরোটার চারিদিকে ঘুরিয়াছে। এই পথ দিয়া বকরোটার অপর প্রান্তে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে চাম্বা যাইবার পথ ধরিলাম। দুই পাশে চীড় এবং দেওদার গাছ। তাহার মধ্য দিয়া পথটি বেশ রমণীয়। প্রায়ই মেঘ আসিয়া অন্ধকার করিতে ছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বৃষ্টি হয় নাই। পাহাড়ীরা পিঠে ঝুড়ি বোঝাই করিয়া দুধ, কলা, আপেল,

* ডাইনকুণ্ড নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি শুনিলাম যে, বহুদিন পূর্ব্বে এখানে একটি ঋষির আশ্রম ছিল। এই ঋষি সর্ব্বদা ধ্যান করিতেন বলিয়া পাহাড়ের নাম ধ্যানকুণ্ড বা ডাইনকুণ্ড হইয়াছে।

কড়াইসুঁটি প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিতেছিল। কোথাও কোন পাহাড়ী বালক বা রমণী গরু ভেড়া প্রভৃতি চরাইতেছিল। কদাচিৎ পথের ধারে দুই একটি দোকান দেখা যাইতেছিল। আমরা ইংরাজ রাজ্য ছাড়াইয়া চাম্বা রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। এক স্থানে অশ্বারোহীকে অশ্ব হইতে নামিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। সেখানে পথ অতি সঙ্কীর্ণ। এক দিকে গভীর খদ অপর দিকে অত্যুচ্চ পাহাড়,আমাদের পথ ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা লকড়মণ্ডী নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে কয়েকটি কাঠের গুদাম আছে। স্থানটি ইংরাজীতে যাহাকে বলে saddle—দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ, তাহার মধ্যে পর্ব্বতপৃষ্ঠ। এখান হইতে চাম্বা যাইবার রাস্তা ছাড়িয়া আমরা ডাইনকুণ্ড পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। সে পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ—পর্ব্বতের উপর ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রস্তরাকীর্ণ পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, পথের পাশ দিয়া একটি স্রোত ঝর ঝর শব্দ করিতে করিতে নামিয়া গিয়াছে। সেখানে কোন লোকালয় নাই, উপরে আকাশ,—নীচে পাহাড় ও অরণ্য। মনে হইল যেন প্রকৃত দেবী লোকালয় হইতে বহু দূরে আসিয়া একান্ত নিভৃতে বসিয়া হৃদয় খুলিয়া তাঁহার মর্ম্মের করুণকাহিনী গাহিতেছেন,—কোন সুদূর অতীতে সে গান আরম্ভ হইয়াছে, আবার কবে তাহার শেষ হইবে কে বলিতে পারে?

দুই একজন পাহাড়ী এই দুর্গম স্থানে গরু ও মহিষ চরাইতেছিল। বনে ছোট ছোট ঝোপে এক প্রকার লাল ফল দেখিলাম, এগুলি পাকিলে কাল হয়, এবং খাইতে কতকটা জামের মত। অবশেষে আমরা পাহাড়ের প্রায় চূড়ার উপর উঠিলাম। এখানে খানিকটা সমতল যায়গা আছে, কিন্তু গাছপালা একেবারে নাই। জঙ্গল হইতে কাঠ কুড়াইয়া, পাথরের উনান

করিয়া কাঠের আগুন ধরান হইল। খিচুড়ি আলু ও কড়াইশুঁটির তরকারি ও কয়েকটা ভাজা হইল। রৌদ্রে বড় কষ্ট হইতেছিল। দুইটা বড় পাথরের উপর একটা কম্বল টাঙ্গান হইল। কেহ কেহ তাহার নীচে বসিয়া, কেহ বা ছাতা মাথায় দিয়া খাইতে বসিলাম। মধ্যে মধ্যে নীচের দিক হইতে মেঘ ভাসিয়া আসিতেছিল— সিক্ত ও শীতল সমীরণ স্পর্শে আমাদের রৌদ্রতপ্ত শরীর জুড়াইয়া যাইতেছিল।

আকাশ পরিষ্কার থাকিলে ডাইনকুণ্ডের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। দক্ষিণ পশ্চিম মুখে দাঁড়াইলে, ডানদিকে কালা টোপ (৯০০০ ফিট) এবং বকরোটা, টেহরা পোট্রেন, কাটলাগ প্রভৃতি ডালহাউসীর পাহাড়গুলি রাবীর দিকে নামিয়া গিয়াছে দেখা যায়। বামে—বেশী দূরে—বাক্‌লোর ছাউনি। তাহার পর শিবালিকের পাহাড় এবং উপত্যকা। চক্কি নদী যেখানে সমতল ভূমিতে নামিয়াছে, তাহার নিকটে পাঠানকোট। পাঠানকোটের উত্তর পশ্চিমে রাবীর তীরে শাপুর। শিবালিকের মধ্য দিয়া দুইটি সমান্তরাল নদী। পূর্ব্বের নদীর নাম চক্কি—উহা বিপাশায় পড়িয়াছে। পশ্চিমের নদীর নাম রাবী। তাহা ছাড়া সমতল ভূমির উপর শতদ্রু, বিপাশা, এবং চন্দ্রভাগা (Sutledge, Beas and Ravi) দেখা যায়। উত্তরের দিকে চাহিলে পাহাড়, অরণ্য, উপত্যকা এবং স্রোত একটী সুন্দর দৃশ্য উদ্ঘাটিত করে। পশ্চিমে কুণ্ডকপিলাশ এবং দাগনিধর পাহাড়। তাহাদের পশ্চাতে জম্মুরাজ্যের অন্তর্গত ভদ্রাওয়া এবং বলেশায় বরফাবৃত পাহাড়। দুইটি তুষারাবৃত শৈল-শিখরশ্রেণী দেখা যায়। একটির নাম পঙ্গি—ইহা উত্তর-পশ্চিম দিকে; অপরটির নাম ধওলাধর—ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে।

ডালহাউসী হইতে চাম্বানগরী ১৯ মাইল। পার্ব্বত্য পথ। ঘোড়া

এবং ডাণ্ডি ব্যতীত অপর কোন যান চলে না। অর্দ্ধপথে খাজিয়ার নামক স্থানে বিশ্রাম করা যায়। এজন্য সমস্ত পথটি হাঁটিয়া যাওয়াও বিশেষ কঠিন নহে। আমরা যেদিন চাম্বা যাইব ঠিক করিয়াছিলাম, সেদিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম, আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমরা যাইবার আশা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। অপরাহ্ণে আকাশ একটু পরিষ্কার দেখিয়া ভরসা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ডালহাউসী হইতে খজিয়ার দশ মাইল। লক্কড়মণ্ডি পর্য্যন্ত ৫ মাইল চড়াই। সেখান হইতে ৫ মাইল উতরাই। পার্ব্বত্য পথ— ঘন জঙ্গলাবৃত। এক পাশে উচ্চ পাহাড়, অপর দিকে খদ। কখনও নীচে উপত্যকা দেখা যায়, কখনও উর্দ্ধে বরফের পাহাড় দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে ঝরণা পাহাড়ের উপর হইতে আসিয়া নীচে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পথে কদাচিৎ দুই একটি পথিকের সহিত দেখা হইল। পর্ব্বতের সুগভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে বিহগ-কাকলী শোনা যাইতেছিল। এই ভাবে ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমরা খজিয়ারে পৌঁছিলাম। খজিয়ারের সমতল ভূমিখণ্ড যখন প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, তখন মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদয় হয়। চারিদিকে পাহাড় দিয়া ঘেরা কিঞ্চিৎ সমতল ভূমিখণ্ড মধ্যস্থল অভিমুখে ঢালু হইয়া গিয়াছে। পাহাড়গুলি ঘনবৃক্ষরাজি-সমাবৃত। বৃক্ষশ্রেণী পাহাড়গুলি সমাচ্ছন্ন করিয়া সমতল ভূমির কিয়দংশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমতল ভূমির মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র হ্রদ— এ দেশের ভাষায় ডাল। হ্রদের চারিদিক জলজ গুল্ম-সমাচ্ছন্ন। গুল্ম-রাজির নীচে গভীর পাঁক। পাঁকের উপর গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। পথের উপর দিয়া সন্তর্পণে চলিলাম। শুনিলাম, পাঁকে পড়িলে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। ইংরাজি

বহিতে লেখা আছে যে. হ্রদের মধ্যস্থলে ১৫ ফিট্ গভীর জল। এখানে লোকেরা বলিল জলের তল পাওয়া যায় না। তাহারা এক আজগুবি গল্প বলে যে, একজন সাধু একটি জাঁতাতে দড়ি বাঁধিয়া ৬ মাস ধরিয়া অনবরত দড়ি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তল পান নাই। হ্রদে যেখানে গভীর জল, সেখানে একটি ভাসমান দ্বীপ দেখিলাম। বলা বাহুল্য, দ্বীপটি অতিশয় ক্ষুদ্র—দূর হইতে দেখিতে কতকগুলি দীর্ঘাকার জলজ উদ্ভিদের সমষ্টিমাত্র। দ্বীপটি হাওয়াতে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে অতি ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে। হ্রদের চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত শ্যামলশস্পাবৃত নয়নাভিরাম হরিদ্বর্ণের মাঠ—কে যেন অতিশয় কোমল একটী নূতন গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছে। মাঠের উপর ইতস্ততঃ ঘোড়া. ছাগল, ভেড়া চরিতেছে। মাঠের মধ্য দিয়া চাম্বা যাইবার পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। পথের উপর দুই চারিটি পথিক ভিজিতে ভিজিতে চাম্বা অভিমুখে চলিয়াছে। কাহারও মাথায় বা পিঠে বোঝা—কেহ বা গরু ভেড়া ও ছাগলের দল লইয়া চলিয়াছে।

হ্রদের অনতিদূরে—একটু উচ্চে একটি মন্দির। মন্দিরের ছাদ শ্লেটপাথরে আচ্ছাদিত—চারিদিক হইতে ঢালু ত্রিকোণ ছাদগুলি ঊর্দ্ধে যেখানে মিশিয়াছে তাহার উপর একটি পিত্তল কলস। মন্দির-সংলগ্ন একটী বৃহৎ গৃহ—তাহার মধ্যে সারি সারি কাঠের স্তম্ভ—চারিপাশ প্রায় খোলা—যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম করে। মন্দিরটি খাজি নাগের। অন্ধকার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে একটী দণ্ডায়মান কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মন্দিরের বাহিরে দুই চারিটি প্রস্তরোৎকীর্ণ মূর্ত্তি—কাঠের উপরেও খোদাই করা মূর্ত্তি, ফুল-লতা-পাতা প্রভৃতি রহিয়াছে। মন্দিরের পাশেই একটি দোকান এবং দুই চারিটি ঘর। ইহার কিছু ঊর্দ্ধে

ডাক-বাঙ্গলা। ডাকবাঙ্গলাটি কাঠের তৈয়ারী, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বলা বাহুল্য, খজিয়ার চাম্বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাত্রে লেপ গায়ে দিয়াও যেন শীত করিতেছিল। খজিয়ার ৬,৬০০ ফিট উচ্চ—অর্থাৎ প্রায় ডালহাউসীর সমান উচ্চ। হ্রদটি নিকটে থাকায় আর্দ্রতা খুব বেশী। চারিপাশে জঙ্গলে বাঘ ভালুক আছে শুনিলাম। পর দিন আহারাদির পর আমরা চাম্বা যাত্রা করিলাম। চাম্বার উচ্চতা ৩,৩০০ ফিট, পথ অনবরত উত্তরাই। দুই পাশে অনেক কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষক-পল্লী দেখিতে পাইলাম। খজিয়ার হইতে চাম্বা ৮ মাইল পথ। প্রায় চার মাইল পথ আসিয়া একটা পাহাড়ের উপর হইতে চাম্বা নগরী দেখিতে পাওয়া গেল। আমরা কিছুক্ষণ বসিয়া অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলাম। বহু নিম্নে চারিদিকে উচ্চ পাহাড়ে ঘেরা ক্ষুদ্র একখণ্ড সমতল ভূমি—তাহার উপর নগরের গৃহগুলি দূরত্ববশতঃ অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে। নগরের পাশ দিয়া রাবী নদী রজতধারার ন্যায় দেখাইতেছে। মেঘদূতের অলকানগরীর বর্ণনা মনে পড়িল।

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত গঙ্গা দুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনী বাভ্রবৃন্দম্ ॥

ক্রমে যত নীচে যাইতে লাগিলাম, ততই চাম্বানগরী আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল। নিকট হইতে রাবী নদী ক্রমশঃ বড় দেখাইল; তাহার জলের বেগ, তরঙ্গের আস্ফালন স্পষ্ট দেখা গেল। নদীর শব্দ প্রথমে মর্ম্মর ধ্বনি রূপে, পরে প্রচণ্ড গর্জ্জন রূপে শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে আমরা নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে দাঁড়াইয়া

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। দুই পাশে উচ্চ তীরের মধ্য দিয়া রাবীর ঈষৎ আবিল জলরাশি বৃহৎ তরঙ্গ তুলিয়া প্রচণ্ড আস্ফালন করিয়া ঘোর রবে গর্জ্জন করিতে করিতে প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে বিপুলকায় পাহাড়গুলি নীরবে দাঁড়াইয়া শৈলদুহিতার এই উদ্দাম চঞ্চলতার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। কি মধুর সে স্রোতস্বিনীর চঞ্চলতা! কি গভীর সে পর্ব্বতমালার নিস্তব্ধতা! লছমনঝোলার নিকট গঙ্গার যে শোভা, দার্জ্জিলিং-এর সানুদেশে তিস্তা ও রঙ্গিতের যে শোভা, এখানে রাবীর সেই শোভা। পৃথিবীতে বোধ হয় এই দুই দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক,—তীর হইতে সমুদ্রের শোভা, এবং পর্ব্বতমালা বেষ্টিত স্থানে নদীর উদ্দাম প্রবাহ।

নদীর তীর ধরিয়া আমরা চলিলাম। একটী সদ্যোবর্ষণপুষ্ট স্রোত রাবীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহার উপর একটি ছোট পোল আছে। ইহা পার হইবার একটু পরে রাবীর উপর একটী বৃহৎ সেতু আছে। ইহা একটী suspension Bridge। দুই পাশে দুইটি তোরণ হইতে দুই সুবৃহৎ লৌহ-শৃঙ্খল ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই শৃঙ্খল হইতে বহুসংখ্যক লৌহদণ্ড লম্বমান হইয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুটি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমরা এই সেতু দিয়া নদী পার হইলাম। এখানে নদী অত্যন্ত বক্রগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রচণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে নদী ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে এক বিশাল পর্ব্বতে অবরুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—

মার্গাচলব্যাতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ—

তাহার পর নদী একটু ঘুরিয়া আসিয়া আবার উন্মুক্ত পথ পাইয়া সুদূরবর্ত্তী আরবসাগরের সন্ধানে পূর্ব্বের ন্যায় লাফাইতে লাফাইতে

পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। যেন এক মুহূর্ত্তের বিলম্বও সহ্য হয় না। এত চপলতা, এত অশোভন ব্যস্ততা দেখিয়া লোকে কি বলিবে তাহার জন্য ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত নাই।

সেতু পার হইয়া আমরা চাম্বানগরীতে প্রবেশ করিলাম। সেতুর দুইটী পাশে দুই ফটক। ফটক পার হইয়া টোলঘর (Toll house)। যে সকল জিনিষ আমদানি-রপ্তানি হয়, এখানে তাহাদের উপর মাশুল সংগ্রহ করা হয়। এখান হইতে সহরে যাইতে হইলে অনেকখানি চড়াই উঠিতে হয়। কিছু দূর উঠিয়া বৃহৎ চৌগাঁও তোরণের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই তোরণের পার্শ্বেই একটি সুগঠিত মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। ইহা বস্তুরায়ের (শ্রীকৃষ্ণের) মন্দির। এই তোরণটি পার হইয়া চৌগাঁও মাঠ পার্ব্বত্য অঞ্চলে এতখানি বিস্তৃত সমতল ভূমি সচরাচর দেখা যায় না। এই মাঠটির চারিপাশে হাঁসপাতাল, মিউজিয়াম, কাছারি, Guest House, Post Office, প্রভৃতি বাড়ী এবং সারি সারি দোকানঘর আছে। চাম্বাতে আমরা দুইদিন ছিলাম। এখানে বেশ সুন্দর দোতালা ডাকবাঙ্গলো আছে। সহরের একপাশে, হাঁসপাতালের পশ্চাতে এই এই ডাকবাঙ্গলো অবস্থিত। এখান হইতে সর্ব্বদা রাবী নদীর শব্দ শোনা যায়। ডাকবাঙ্গলোতে অনেক রকম গাছের মধ্যে আঙ্গুর গাছ দেখিলাম। তাহাতে গুচ্ছে গুচ্ছে আঙ্গুর ধরিয়া রহিয়াছে।

চৌগাঁওয়ের একটু উপরে সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের পার্শ্বেই একটী প্রাচীর-বেষ্টিত সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণে পাশাপাশি ছয়টী মন্দির রহিয়াছে। তিনটি বিষ্ণু মন্দির এবং তিনটি শিবালয়। মন্দিরগুলির নাম লছমীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রগুপ্ত (শিবালয়), পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ, গৌরীশঙ্কর, এবং লছমীদামোদর। এতদ্ভিন্ন প্রাঙ্গণে নানা স্থানে কতকগুলি বিগ্রহ

আছে,—হনুমান, নন্দী প্রভৃতির। মন্দিরগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত এবং সুগঠিত। লছমীনারায়ণের মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—নারায়ণের বিগ্রহটিও খুব বড, এবং শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত; লছমীর বিগ্রহটি ছোট। অন্যান্য বিগ্রহগুলি পাথরের; কেবল গৌরীশঙ্করের বিগ্রহ দুইটি পিতলের। দুর্গার মুখের ভাব খুব সুন্দর। মন্দিরগুলির বাহিরের দিকে দেওয়ালের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি, পৌরাণিক ঘটনার ছবি প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। প্রাঙ্গণের চারিদিকে যাত্রীদের জন্য বিশ্রামের স্থান, পূজারিদের থাকিবার ঘর প্রভৃতি আছে। শিবালয়-গুলির উপর ত্রিশূল এবং বিষ্ণুমন্দিরগুলির উপর চক্র আছে। সব মন্দিরের উপরে কাঠের বৃহৎ ছাতার ন্যায় আছে, বোধ হয় বৃষ্টি এবং তুষারপাত হইতে মন্দিরগুলি রক্ষা করিবার জন্য এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

চাম্বাতে আরও কতকগুলি মন্দির আছে। চম্পাবতী বা চামেশ্বরীর মন্দিরটিও সহরের মধ্যে—রাজ-আফিসের উপরে অবস্থিত। এই মন্দিরটিও প্রস্তর নির্ম্মিত এবং সুগঠিত। ইহার মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার মূর্ত্তি পূজিত হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল পূর্ব্বে ব্রহ্মপুর। ৯২০ খৃঃ অব্দে রাজা সহিল বর্ম্মা রাজধানী ব্রহ্মপুর হইতে চাম্বাতে আনেন। রাজার কন্যা চম্পাবতী এই স্থানটি মনোনীত করিয়াছিলেন বলিয়া নগরীর নাম হইল চাম্বা। কথিত আছে যে, চম্পাবতী অতিশয় ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। ধর্ম্মালাপ করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ এক সাধুর নিকট যাইতেন। ইহাতে রাজার মনে সন্দেহের উদয় হয়। এক দিন তিনি উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে রাজকন্যার পশ্চাদ্গামী হন। সাধুর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, গৃহ শূন্য। সহসা রাজা এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। ঐ আকাশবাণী রাজকন্যার উপর সন্দেহ করার জন্য রাজাকে ভৎর্সনা করিল এবং বলিল যে, ইহার শাস্তি স্বরূপ তি ন

আর রাজকন্যাকে ফিরিয়া পাইবেন না। আকাশবাণী রাজাকে ঐ স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিল। রাজা তদনুসারে এই চম্পাবতীর মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। এখানে চম্পাবতী দেবীরূপে পূজিতা হন। বৈশাখ মাসে এই মন্দিরে একটী মেলা বসে।

চাম্বা নগরীর ঊর্দ্ধে পাহাড়ের উপর চামুণ্ডাদেবীর মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর সুদীর্ঘ প্রস্তরময় সোপানাবলি আরোহণ করিয়া এই মন্দিরে যাইতে হয়। এই মন্দিরে উঠিবার পথে নরসিংহের মন্দির আছে। চামুণ্ডার মন্দির এবং নরসিংহের মন্দির পার্ব্বত্য প্রথায় নির্ম্মিত—এগুলি অনতিউচ্চ ক্ষুদ্র গৃহবিশেষ। মধ্যস্থলে একটী কক্ষ যাহার মধ্যে বিগ্রহ থাকে, চারিদিকে বারাণ্ডা, বারাণ্ডার উপরে ঢালু ছাদ, কাঠ বা শ্লেটপাথরে নির্ম্মিত। চামুণ্ডার মন্দিরে প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি। এখানে পশুবলি হয়। এই মন্দিরের নিকট দাঁড়াইলে বহু নিম্নে নগর, চৌগাঁ ও মাঠ, রাবী নদী এবং চারিদিকের পাহাড় বেশ সুন্দর দেখায়।

চাম্বানগরীর নিকট পাহাড়ের উপর আর একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি করুণ কাহিনী শোনা যায়। রাজধানী যখন ব্রহ্মপুর হইতে চাম্বাতে স্থানান্তরিত হয়, তখন চাম্বানগরীর জল সরবরাহের জন্য সরোভ নামক স্রোত হইতে শাহ মাদার পাহাড়ের উপর দিয়া একটী প্রস্তরের পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হয়। কিন্তু জল এই প্রণালীতে চলিল না। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন * হয় রাণী নয় তাঁহার কোন পুত্রকে বলি দিলে জল এই প্রণালীতে চলিবে। রাণী নিজেকে বলি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন রাজা সহিল বর্ম্মা ইহাতে মত করেন নাই। কিন্তু রাণী জেদ করিতে থাকেন এবং শেষ পর্য্যন্ত রাণীর মতই

* আর এক প্রবাদ এই যে, রাজা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

গ্রহণ করা হয়। দাসীগণ-পরিবৃত হইয়া রাণী ধীর পাদবিক্ষেপে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলেন। সতী হইবার সময় রমণীগণ যেরূপ অনাবৃত মস্তকে যায়, রাণীও সেইরূপ চলিলেন। যেখানে জল স্রোত ছাড়িয়া প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, সেখানে একটি সমাধি প্রস্তুত হইল। রাণী জীবন্ত প্রোথিত হইলেন। কথিত আছে যে, সেই হইতে স্রোতের জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রণালীর মধ্য দিয়া চাম্বা অভিমুখে প্রবাহিত হইল। সহিল বর্ম্মার পুত্র যুগাকরের এক তাম্র-শাসনে এই রাণীর উল্লেখ আছে। তাঁহার নাম নেনা দেবী। রাণী পাহাড়ের উপর যেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন, রাজা সহিল বর্ম্মা সেখানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ১৫ই চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত এই মন্দিরে মেলা বসে। মেলার নাম সুহি মেলা। কেবল রমণী এবং শিশুরা এই মেলায় যায়। মন্দিরের নিকটে গিয়া তাহারা রাণীর প্রশংসাসূচক গান গায় এবং ফুল উপহার দেয়। ১৮০০ খৃঃ অব্দে রাজা অজিত সিংহের রাণী সারদা দেবী পাহাড়ে উঠিবার জন্য মন্দির পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত সোপাণশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহুদূর হইতে এই সোপানগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

চাম্বাতে আরও কয়েকটী মন্দির আছে। চৌগাঁও তোরণের পার্শ্বে বন্ধু রায় ব. হরি রায়ের মন্দিরের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। রাজ-বাড়ীর নিকটে বংশীগোপালের একটি মন্দির আছে। মন্দিরগুলি ব্যতীত এখানকার যাদুঘর (Museum) একটি দেখিবার জিনিষ। ভূতপূর্ব্ব রাজা স্যর ভূরিসিংহ এই যাদু ঘরটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এজন্য ইহা ভূরিসিংহ মিউজিয়ম নামে পরিচিত। চৌগাঁও মাঠের পার্শ্বে একটী সুন্দর দ্বিতল গৃহে এই মিউজিয়মটি রক্ষিত হইয়াছে। এখানে কয়েকটী প্রাচীন প্রস্তরলিপি দেখিতে পাইলাম। চাম্বানগরের এবং

রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানের বহুসংখ্যক মন্দির দুর্গ প্রভৃতির অনেকগুলি সুন্দর আলোকচিত্র (Photograph) এখানে দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন এখানে বহুসংখ্যক প্রাচীন চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। চিত্রগুলি বহুবর্ণে সুরঞ্জিত এবং নিপুণ ভাবে অঙ্কিত। অধিকাংশ চিত্রই পৌরাণিক ঘটনা বিষয়ক। রামায়ণের প্রায় সব প্রধান ঘটনাগুলি চিত্রে অঙ্কিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের অনেক লীলারও ছবি আছে। এই সকল চিত্র দেখিয়া বোঝা যায়, প্রাচীন কালে কাঙ্গড়াতে যেরূপ চিত্র বিদ্যার চর্চ্চা হইত, চাম্বাতেও প্রায় সেইরূপ হইত। মিউজিয়মে কতকগুলি প্রাচীন অস্ত্র-শস্ত্রও দেখিলাম।

চাম্বার রাজগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। ইঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। অনুমান ৫৫০ খৃঃ ব্রহ্মপুরে প্রথম রাজ্যস্থাপন হইয়াছিল। চাম্বার রাজগণের মধ্যে সহিল বর্ম্মার নাম সমধিক বিখ্যাত। ইঁহার পত্নী নেনা দেবীর আত্মোৎসর্গের কথা এবং কন্যা চম্পাবতীর অন্তর্ধানের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, ইঁহার প্রথমে সন্তান হয় নাই। একবার ৮৪ জন সন্ন্যাসী ব্রহ্মপুরে আসেন এবং রাজার অতিথিসৎকারে সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন। তাহাতে রাজার দশ পুত্র এবং এক কন্যা হয়। এই কন্যাই চম্পাবতী। দশ পুত্রের মধ্যে নয় পুত্র নারায়ণের বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিন্ধ্যাগিরি হইতে মর্ম্মর-প্রস্তর আনিতে গিয়া দস্যুহস্তে প্রাণ হারায়। তখন রাজা অবশিষ্ট পুত্রকে পাঠাইয়া মর্ম্মর প্রস্তর আনিয়া বিগ্রহ প্রস্তুত করেন। এই বিগ্রহই নাকি লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে। সহিল বর্ম্মা রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং রাজধানী চাম্বাতে উঠাইয়া আনেন। তাঁহার গুরুর নাম চর্পটনাথ। চাম্বাতে চর্পটনাথের একটি ছোট মন্দির আছে। সহিলবর্ম্মা তুরকীদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ একটী বিবরণ শিলালিপিতে দেখিতে

পাওয়া যায়। বৃদ্ধবয়সে তিনি যুগাকরকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করিয়া গুরু চর্পটনাথের সহিত ব্রহ্মপুরে যান এবং সেখানে অপর সাধুদের সহিত সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। ১৫৮৯ খৃঃ বলভদ্র নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি খুব দান করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল বলিকর্ণ। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে এত দান করিতে নিষেধ করিত। তিনি তাহাদের কথা শুনিলেন না। রাজকোষে অর্থাভাব ঘটিল। অবশেষে কর্ম্মচারিদের অনুরোধে বলভদ্রের পুত্র জনার্দ্দন রাজা হইলেন। জনার্দ্দন পিতাকে রাবীর অপর তীরে জমি এবং গৃহ দিলেন। তথাপি বলভদ্র পূর্ব্বের ন্যায় দান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। জমি ফুরাইল। রোজ বাড়ীর এক হাত করিয়া দান করিতেন। ক্রমে বাড়ীও ফুরাইল। রাজা মাঠে অনশনে রহিলেন। তখন পুত্র আরও জমি এবং বাড়ী দিল।

চাম্বার রাজা একজন Ruling chief (করদ রাজা)। রাজ্যের আয় বৎসরে ৮।১০ লক্ষ টাকা। ইংরেজ সরকারের ডাক টিকিটের উপর Chamba State এরূপ ছাপ দিয়া চাম্বারাজ্যে ব্যবহৃত হয়। চাম্বারাজ্য সবই পাহাড়। এখানকার অরণ্যগুলি খুব মূল্যবান। বর্ত্তমান রাজা কাশ্মীরের মহারাজার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়াছেন। চাম্বার রাজার ভগিনীর সহিত কাশ্মীরের যুবরাজ স্যর হরিসিংহের বিবাহ হইয়াছিল। সে ভগিনী মারা গিয়াছেন। চাম্বাতে পূর্ব্বে কয়েকজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী ছিলেন। এখন * একজন মাত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক এখানে চাকুরী করেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বরদানন্দ সরকার। ইনি ইংরেজ সরকারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৫ বৎসর যাবৎ চাম্বারাজ্যে কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহার আদর যত্নে আমরা অত্যন্ত

* ১৯২৫ সালে আমরা চাম্বা গিয়াছিলাম।

আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। ইঁহার নিকট শুনিলাম যে চাম্বাতে বাঙ্গালী কদাচিৎ বেড়াইতে আসে।

চাম্বারাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ব্রহ্মপুর (আধুনিক বরমুর) চাম্বা হইতে ৪৬ মাইল দূরে। এখানে লক্ষণাদেবী, গণেশ, মণি মহেশ এবং নরসিংহের মন্দিরগুলি বিখ্যাত। ব্রহ্মপুর যাইবার পথে ছত্রারি একটি তীর্থস্থান। এখানে শক্তিদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। ব্রহ্মপুরের মন্দির-নির্ম্মাতা বিখ্যাত শিল্পী গগ্‌গা শক্তিমন্দিরটিও নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ শোনা যায়। ব্রহ্মপুর হইতে দুই দিনের পথ যাইলে মণিমহেশ হ্রদ। ইহা এতদঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। ইহা ১৩০০০ ফিট উচ্চ। কৈলাসশৃঙ্গের পাদদেশে এই হ্রদ। ভাদ্র আশ্বিন মাসে এখানে একটি বড় মেলা বসে। ব্রহ্মপুরের অপর দিকে ত্রিলোকীনাথ হিন্দু ও বৌদ্ধদের একটি তীর্থস্থান। তিব্বত হইতে এখানে তীর্থযাত্রী আসে। চাম্বা হইতে হাঁটিয়া কাশ্মীর যাইবার পথ আছে। বলা বাহুল্য, এই পথের দৃশ্য অতি মনোহর। চাম্বা হইতে ফিরিবার সময় খজিয়ারে একটি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হয়। ইনি কাশ্মীরের বিখ্যাত অমরনাথ তীর্থে চলিয়াছেন।

সন্ধ্যাবেলা চৌগাঁও মাঠের ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতে বেশ ভাল লাগে। বৈদ্যুতিক আলোকে প্রাসাদ, রাজপথ প্রভৃতি আলোকিত হয়। শ্যামল শস্পাবৃত মাঠের উপর নাগরিকগণ বেড়াইতে বাহির হন। নীচে অনেক বাড়ী। তাহার নীচে রাবী নদী। নদীর গর্জন শোনা যাইতেছিল। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ব্যাণ্ড বাজিতেছিল। নাতীশীতোষ্ণ সমীরণ শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দিতেছিল।

দুই দিন চাম্বাতে থাকিয়া আমরা পুনরায় খজিয়ার হইয়া ডালহাউসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

কাঙ্গাড়া ও জ্বালামুখী

রাত্রি নয়টার সময় লাহোর হইতে আমাদে ট্রেণ ছাড়িল। রাত্রি ২টা ৪৫ মিনিটের সময় পাঠানকোট পৌছিলাম। বড় অসময়। ভাল ঘুম হইল না। বাকী রাত্রিটুকু গোলমালে কাটিল। প্রথমে শুনিলাম, মোটরকার পাওয়া যাইবে না। শেষে শোনা গেল, একটা মোটরকার পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা আমাদের গন্তব্য স্থল ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত যাইবে না। এখানে বলিয়া রাখি যে, কাঙ্গাড়া জেলার প্রধান নগরের (headquarter station) নাম ধর্ম্মশালা। শুনিলাম, মোটরকারটি শাপুর পর্য্যন্ত, চল্লিশ মাইল পথ, আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারে। সেখান হইতে টমটম করিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই ধর্ম্মশালা পৌছান সম্ভব। শাপুর হইতে ধর্ম্মশালা ১৬ মাইল মাত্র। তথাস্তু। আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। এখান হইতে ১০।১২ মাইল পথ সমতল। ক্ষুদ্র পাঠানকোট নগর ছাড়াইয়া, উভয় পার্শ্বের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, পল্লীবাসীদের হৃদয়ে ভীতি ও সম্ভ্রম উৎপাদন করিয়া, আমাদের মোটর ছুটিয়া চলিল। একটী পঞ্জাবী ভদ্রলোক পথের ধারে খাটিয়া পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। মোটরের কল খারাপ হইয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। ভদ্রলোকটির সহিত পরিচয় হইল। তিনি ষ্টেশন-মাষ্টার, ছিলেন,—এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। নিকটে নুরপুরে তাঁহার বাড়ী। এই স্থানটী মনোরম বোধ হওয়াতে, তিনি একটি কূপ খনন করিয়া, ছোট একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, সস্ত্রীক এখানে বাস করিতেছেন। কূপের জল অতি সুস্বাদু। পথিকগণ

অবাধে কূপের জল ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া যাইতেছে। ভদ্রলোকটি তুলসীদাসের রামায়ণের একটা বিপুলকায় সংস্করণ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেছেন। ভদ্রলোকটি অমায়িক। পথের প্রায় সকল যাত্রীই তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যাইতেছে। তিনিও আন্তরিক ভাবে তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছেন। অবশেষে আমাদের মোটর ঠিক হইল এবং ভীষণ গর্জন করিতে করিতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। চক্কি নামক বিপাসার (Beas) একটা উপনদী এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্রোত পার হইলাম। অদূরে পাহাড়ের উপর নুরপুরের গৃহগুলি দেখিতে পাইলাম। এইবার মোটর বহু আয়াস সহকারে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের উপর নুরপুরের নিকট উপস্থিত হইলাম। পথের ধারে প্রায় দুই হাজার ফিট নীচে পার্ব্বত্য স্রোত। পল্লীরমণীগণ পাহাড়ের গাত্রে দুর্গম পথ দিয়া জল আহরণ করিতেছে। নুরপুর একটা প্রাচীন স্থান। পূর্ব্বে এখানে ভাল শাল প্রস্তুত হইত। যাহারা শাল প্রস্তুত করিত, তাহারা ঘটনাক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া নানা স্থানে চলিয়া গিয়াছে। একটা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষের পাশ দিয়া আমরা চলিলাম।

পথ কখনও পাহাড়ের গা দিয়া চলিতেছিল, কখনও পর্ব্বত-বেষ্টিত উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিতেছিল। কখনও উপরে উঠিতেছিল, কখনও নীচে নামিতেছিল। কত যে ছোট-বড় পার্ব্বত্য স্রোত পার হইলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্রোতগুলির উপর সুগঠিত সেতু। সেতুর উপর ইংরাজি অক্ষরে প্রত্যেক স্রোতের নাম লেখা আছে। ডেহরি, নইরা, ত্রিলোকিনাথ, বরেল, ভালি, শিওন, খৌলি, চম্বা, গুজ, বনোই—এই সব নাম। প্রত্যেক স্রোত পার হইবার সময় পথ অনেকখানি নামিয়া ওপারে গিয়া আবার উপরে উঠিতেছিল। চারি দিকে বনানীশোভিত

পর্বতরাজি। নীচে গভীর খাদের মধ্য দিয়া স্রোতের জল ঝিরঝির করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কোথাও দুইটি স্রোত মিশিয়া একটা বড় স্রোত হইয়া চলিয়াছে। যেদিকে চাই—সুন্দর দৃশ্য। আর কোনও শব্দ নাই, কেবল নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে স্রোতের মর্মরধ্বনি। সকলই স্থির,—কেবল ক্ষুদ্র বীচিমালা-পরিশোভিত তটিনীর মৃদু-মন্দ গতি, এবং কদাচিৎ স্নিগ্ধ পবনস্পর্শে তরুরাজিরাবলির মন্দান্দোলন। নগরের কোলাহল ছাড়িয়া এখানে আসিলে মন সুগভীর শান্তিতে নিমগ্ন হয়। দুঃখী ও দরিদ্রকে পীড়ন করিয়া বড়লোক হইবার অশোভন ব্যগ্রতা এখানে নাই। ক্ষুদ্রকে পেষণ করিয়া প্রভুত্ব নিজ উগ্রমূর্ত্তি এখানে প্রকাশ করে না। এখানে আছে কেবল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, শান্তি ও স্বাধীনতা।

বেলা একটার পর আমরা শাপুর পৌছিলাম। ধর্ম্মশালা যাইবার টমটম পাওয়া গেল না। অগত্যা এখানেই রাত্রিযাপনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। ডাকবাঙ্গলাতে আশ্রয় পাওয়া গেল। বৃক্ষতলে খিচুড়ি রান্না হইল। কোনরূপ তরকারী পাওয়া গেল না, উত্তম ক্ষুধা হইয়াছিল। শুধু খিচুড়িই পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করা গেল।

আমাদের দলের অবশিষ্ট লোক পাঠানকোট হইতে টমটমে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের চারিটি টমটম ছিল। টমটমগুলি পরদিন শাপুর পৌছিল। আহারাদি করিয়া বেলা প্রায় একটার সময় আমরা শাপুর হইতে রওনা হইলাম। কিছুদুর পর্য্যন্ত চড়াই উৎরাই চলিল। কয়েকটি স্রোত পার হইলাম। এই ভাবে ৫।৬ মাইল গিয়া খুব বড় রকমের একটা চড়াই পাইলাম। শুনিলাম, এই চড়াই উঠিলেই ধর্ম্ম-শালা। এই পথটি খুব সুন্দর। পাহাড়ের গা দিয়া পথ। নীচে একটী ছোট নদী দেখা যাইতেছিল। পাথরে বাধা পাইয়া নদীর জলরাশি ফেনপুঞ্জে পরিণত হইতেছিল। গভীর গর্জন করিতে করিতে

নদীর জল ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীর অপর পারে ধানের ক্ষেত। সবুজ ধানের ক্ষেতগুলি থাকে থাকে সাজান রহিয়াছে। বাতাসে ধান গাছগুলি দুলিতেছে। ধানের ক্ষেতের পর আবার পাহাড়। পাহাড়গুলি নানারূপ গাছপালায় ঢাকা। বহুদূর পর্য্যন্ত এইরূপ সুন্দর পথ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। তাহার পর পথের ধারে আর নদী দেখা গেল না। আমরা প্রায়ই গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিলাম। কারণ, ক্রমাগত চড়াই,—জিনিসপত্র সহিত গাড়ীগুলি টানিতেই ঘোড়ার খুব কষ্ট হইতেছিল। ঘোড়াগুলি একটু করিয়া উঠিতেছিল, আর দাঁড়াইয়া ধুঁকিতেছিল। এইভাবে ক্রমাগত সাত মাইল উঠিয়া ধর্ম্মশালা। তখন বৈকাল হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি পড়িয়া পথে ভয়ানক কাদা হইয়াছে। কাদায় জুতা আটকাইয়া যাইতেছে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—পথে আমরা দুই-তিন পশলা বৃষ্টি পাইয়াছিলাম। কিন্তু বৃষ্টি বেশী নহে। আমরা কেহ ভিজি নাই।

কাঙ্গড়া জেলা পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই জেলার সীমা কোন কোন স্থলে তিব্বত এবং চীনদেশকে স্পর্শ করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কাঙ্গড়া জেলার অন্তর্গত লাহুল (Lahul) এবং স্পিটি (Spiti)) নামক তহশিল দুইটির ভারতবর্ষ অপেক্ষা তিব্বতের সহিত বেশী সাদৃশ্য—এরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন। কাঙ্গড়া জেলার অধিকাংশ স্থল পর্ব্বতসমাচ্ছন্ন। ইহা শিমলার উত্তরে এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। শিমলা এবং কাঙ্গড়ার মধ্যে মণ্ডি, সুকেত, বিলাসপুর, বশাহর প্রভৃতি করদ রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যগুলি Simla Hill Statesএর অন্তর্গত। কাঙ্গড়ার পশ্চিমে চম্বা রাজ্য। কাঙ্গাড়া এবং চম্বার মধ্যে ধওলাধর নামক হিমালয়ের একটি শাখা। ধওলাধরের উচ্চ শৃঙ্গগুলি চিরকাল তুষারাবৃত থাকে। কাঙ্গড়া হইতে চম্বা যাইতে হইলে ধওলা-

ধরের উপরে গিরিবর্ত্ম (Pass) অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই গিরিবর্ত্মগুলি ১২ হাজার হইতে ১৬ হাজার ফিট উচ্চ। চেনাব, রাবি, ও বিয়াস্ (চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিপাশা) এই তিনটি উপনদীর উৎপত্তি-স্থল কাঙ্গড়া জেলা। অসংখ্য ছোট বড় পার্ব্বত্য স্রোতে পরস্পর মিলিত হইয়া এই সকল নদীতে পড়িয়াছে। নদী, পাহাড় এবং উপত্যকায় কাঙ্গড়া জেলা অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হইয়াছে। একজন বিদেশী লেখক (Mr. Barnes) এই শোভায় মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন :—No scenery in my opinion presents such sublime and delightful contrasts. Below lies the plain,—a picture of loveliness and repose ; the surface is covered with richest cultivation irrigated by streams which descend from perennial snows and interspersed with homesteads buried in the midst of groves and fruit trees. Turning from this scene of peaceful beauty, the stern and majestic hills confront us ; their sides are furrowed with precipitous water courses ; forests of oak cloathe their flanks, and higher up give place to gloomy and funeral pines ; above all are wastes of snow or pyramidal masses of granite too perpendicular for snow to rest on.

অনুবাদ— আমার মতে কোন দৃশ্যের মধ্যে এরূপ মহান এবং প্রীতি-দায়ক বিপরীত ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ দেখা যায় না। নীচে সমতল ভূমি—তাহা শান্তি এবং সৌন্দর্য্যের আধার ; পর্য্যাপ্ত কৃষিজাত উদ্ভিদে সমাচ্ছন্ন ; চিরতুষারনিষ্যন্দী স্রোতগুলি এই সকল ভূমি সিক্ত করিতেছে ;

স্থানে স্থানে কৃষকদের গৃহ, তাহার চারিদিকে কুঞ্জ এবং ফলবৃক্ষরাজি। এই শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দৃশ্য হইতে ফিরিয়া অপর দিকে তাকাইলে কঠিন এবং মহিমময় পর্ব্বতগুলি সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বত-গাত্র দিয়া স্রোতের ধারা নামিয়া আসিয়াছে; তাহাদের নিম্নভাগে সিন্দূর বৃক্ষের বন, ঊর্দ্ধে বিষাদময় দেবদারু বৃক্ষ; সকলের উপরে বিস্তীর্ণ তুষাররাশি অথবা সুবৃহৎ পাষাণ-খণ্ড, সেগুলি এরূপ সরলভাবে উঠিয়া গিয়াছে যে, পাশে তুষার জমিয়া থাকিতে পারে না।

ধর্ম্মশালা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শোনা যায় যে, এখানে একটী প্রাচীন ধর্ম্মশালা ছিল, তাহা হইতে নগরের নাম হইয়াছে ধর্ম্মশালা। ইহার উচ্চতা ৪,৫৮০ ফিট। অফিস, বাজার প্রভৃতি যে অংশে অবস্থিত, তাহার নাম "লোয়ার" ধর্ম্মশালা। "আপার" ধর্ম্মশালাতে কতকগুলি বাড়ী এবং একটি সেনানিবাস আছে। উভয়ের উচ্চতার ব্যবধান সহস্র ফিটের কম হইবে না। আমরা যেখানে ছিলাম তাহা লোয়ার ধর্ম্মশালার উচ্চতম প্রান্তে অবস্থিত। স্থানটি খুব মনোরম। বাড়ীর চারিদিকে কিছু পরিমাণে সমতল ভূমি,—ভূমিতে বাগান, বাগানে গোলাপ, রজনীগন্ধা এবং নানাজাতীয় রক্ত পীত শ্বেত প্রভৃতি বর্ণের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। নীচে বহুদূরে কাঙ্গড়ার বিস্তৃত উপত্যকা দেখা যাইতেছে। কোথাও শ্যামল শস্যক্ষেত্র, কোথাও গাঢ় বর্ণের বৃক্ষপুঞ্জ। পাহাড়ের গায়ে ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষপুঞ্জ পাহাড়টিকে রমণীয় করিয়াছে। সারি সারি পর্ব্বতশৃঙ্গ উঠিয়া নামিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া আকাশের গায়ে শোভা পাইতেছে। বৃক্ষপুঞ্জের মধ্যে স্থানে স্থানে বাড়ী দেখা যাইতেছে। পাহাড়ের গায়ে বহুসংখ্যক ঝরণা,—দিনরাত্রি জলের শব্দ শোনা যাইতেছে। দুই তিনটি পার্ব্বত্য পথ আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়া পাহাড়ের গা দিয়া উঠিয়া গিয়াছে। সে পথগুলি

ভারি সুন্দর। পথের ধারে ঘর বাড়ী নাই। লোকজন অতি বিরল। দুইধারে গাছ। পাথরের উপর সুন্দর ফার্ণ (fern) জন্মিয়াছে,—গাছের গায়ে শ্যাওলা। এখানে যতক্ষণ ইচ্ছা বসিয়া থাক, বিরক্তি বোধ হইবে না। মনে হয়, শান্তিদেবী লোকালয় হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে লুকাইয়া আছেন। আর কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া দূরাগত জলের মর্ম্মরধ্বনি, এবং বিহগকুলের হর্ষ-কাকলি।

ধর্ম্মশালা বৃষ্টিপ্রধান স্থান। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই মেঘ করিয়া আছে। কখনও কখনও বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার কখনও পরিষ্কার হইয়া রোদ্র উঠিতেছে—সূর্য্যকিরণে নীল আকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, তরুলতা হাসিতেছে। শুভ্রবর্ণের মেঘখণ্ডগুলি কখনও নীল আকাশের গায়ে শোভা পাইতেছে, কখনও পর্ব্বতগাত্রে লগ্ন হইয়া বিশ্রাম করিতেছে, কখনও পাহাড়ের গা বাহিয়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনও দেখা যাইতেছে, নীচে সমতল ভূমির উপর বৃষ্টি হইতেছে,—উপরে পরিষ্কার,—নীচে গাছপালা ক্ষেত অস্পষ্ট আবরণে সমাবৃত হইতেছে। মনে পড়ে কুমার-সম্ভবের বর্ণনা :—

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং,
ছায়ামধঃসানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে,
শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥

লোয়ার ধরম্‌শালা হইতে ম্যাকলিয়ড্‌গঞ্জ পর্য্যন্ত রাস্তাটি বেশ সুন্দর। পাহাড়ের ধার দিয়া পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। পথের ধারে কোন বাড়ী নাই বলিলেই চলে। পথের দুই পাশে উপরে ও নীচে—অনেক গাছ, গাছের কাণ্ড শ্যাওলায় সমাবৃত। নানাবিধ ফার্ণ (fern)

বৃক্ষের গাত্রে অলঙ্কারের স্থায় শোভা পাইতেছে। খদের অপর পারে পাহাড়ের বৃক্ষপুঞ্জের মধ্যে স্থানে স্থানে দুই একটী শুভ্র বাড়ী দেখা যাইতেছে। বহু নিম্নে পথ। স্থানে স্থানে দুই একটি ঝরণা দেখা যাইতেছে। নির্জ্জন পথ; শব্দের মধ্যে জলপ্রপাতধ্বনি,—বিরামহীন, বৈচিত্র্যহীন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ম্যাকলিয়ড্‌গঞ্জের চৌরাস্তায় পৌছান গেল। এখান হইতে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পথে ভাগ্‌শুনাথ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। পথটি আরও স্বাভাবিক, এজন্য আরও চিত্তাকর্ষক। ক্রমশঃ পর্ব্বতপৃষ্ঠ সমতল হইয়া আসিল। বড় বড় পাথরের মধ্য দিয়া কয়েকটি ক্ষীণ জলধারা নিভৃতে পরোপকার-সাধনরত ব্যক্তির ন্যায় নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। গাছে অনেক বানর দেখা গেল। পাহাড়িয়াগণ স্থানে স্থানে গরু চরাইতেছে। এখানকার পাহাড়িয়াদিগকে গদ্দি বলে। ইহারা আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়াই বোধ হইল। অবশেষে আমরা ভাগ্‌শুনাথের নিকটে উপস্থিত হইলাম। সারি সারি বাদাম গাছের নীচে দিয়া পাথরে বাঁধান পথের উপর দিয়া আমরা চলিলাম।

একটি বিস্তৃত প্রস্তরাবদ্ধ স্থানের নিম্ন দিয়া ঝরণার জল অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত হইয়া সহসা তিনটী ব্যাঘ্র-মুখাকৃতি বিবরের মুখ দিয়া সশব্দে প্রবলবেগে এক বিস্তীর্ণ জলাশয়ের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। নির্ম্মল পরিষ্কার জল গলিত রজত-ধারার ন্যায় শোভা পাইতেছে। জলাশয়ের যে স্থানে জল পড়িতেছে, সেখানে জলরাশি শুভ্রবর্ণ; পাশের জল ঈষৎ নীলাভ, আরও দূরের জল কাক-চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ। জলাশয় পরিপূর্ণ করিয়া স্রোতের জল উচ্ছলিত হইয়া আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া এক প্রস্তরনির্ম্মিত প্রণালীর মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

কিছুদূরে স্রোতের জল পুনরায় বাহিরে আসিয়া পর্ব্বত-গাত্র মুখরিত ও সুশোভিত করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইতেছে। ইহাই ভাগ্‌শু-নাথের পবিত্র ঝরণা—এ অঞ্চলের একটি তীর্থস্থান। ব্যাঘ্রমুখাকৃতি বিবর হইতে বাহির হইয়া জল যে জলাশয়ের মধ্যে পতিত হইতেছে, যাত্রিগণ তাহাতে নামিয়া স্নান করে। উঃ! কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! স্পর্শ করিলে হাত-পা অসাড় হইয়া যায়। নিকটেই বিপুল শব্দে জলধারা পতিত হইয়া সমস্ত জলরাশি আলোড়িত করিতে থাকে,—তাহাতে মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ভীতির সঞ্চার হয়। আমরা যেদিন ভাগ্‌শুনাথ দেখিতে গিয়াছিলাম, সেদিন আর একটু হইলেই একটা বিপদ হইয়া যাইত। ভূগর্ভনিহিত যে প্রণালীর মধ্য দিয়া ঝরণার জল প্রবাহিত হইতেছে, তাহার নিকটে বসিয়া কয়েকটি পাহাড়িয়া বালক খেলা করিতেছিল। দৈবক্রমে একটি শিশু ঐ গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায়। অবশিষ্ট বালক-বালিকাগণ কোলাহল করিতে করিতে প্রণালীর নিষ্ক্রমণ-পথ অভিমুখে ছুটিয়া যায়। আমাদের সঙ্গে শেঠ ঈশ্বরদাস আসিয়াছিলেন। তিনি কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া গেলেন। তিনি যে সময় প্রণালীর নিম্নপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, ঠিক সেই সময় শিশুটি জলবেগে প্রণালীটি অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া আসিল। শেঠ ঈশ্বরদাস যদি না ধরিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে শিশুটি হয় ত মারা যাইত, অন্ততঃ বিলক্ষণ জখম হইত। কারণ, ঠিক সেই স্থানে জলরাশি ঘোর শব্দ করিতে করিতে প্রবলবেগে নীচে বহু দূরে লাফাইয়া পড়িতেছে।

ঝরণার নিকট একটু উচ্চস্থানে ক্ষুদ্র একটি মহাদেবের মন্দির। মন্দিরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। মন্দির গাত্রে পাথরের উপর কয়েকটা মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। নিকটে একটা বাঁধান গাছের তলায় কয়েকখণ্ড শিলামূর্ত্তি পূজিত হয়।

পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মন্দিরটি কত প্রাচীন। তিনি

বলিলেন, ইহা বহু কালের পুরাতন। দ্বাপরের শেষে রাজা ধর্ম্মচন্দ্র এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পাহাড়ের ঊর্দ্ধদেশে রাজার কেল্লা ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ধর্ম্মকোট * নামে পরিচিত। আমার অনুমান হয়, এই ধর্ম্মচন্দ্র রাজার ধর্ম্মকোট হইতে ধর্ম্মশালা নামের উৎপত্তি।

ভাগ্‌সুনাথের বিপরীত দিকে এক বিরাট পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের উপর গাছপালা বেশী নাই। দুইটি ঝরণা পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়া পাহাড়ের নিম্নদেশে মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণের এক বিরাট পুরুষের গায়ে উজ্জ্বল শুভ্র হারের ন্যায় ঝরণাগুলি শোভা পাইতেছিল। এই পাহাড়ে অনেক শ্লেট পাথর পাওয়া যায়। একটি ইংরেজ কোম্পানি এখান হইতে শ্লেট কাটিয়া চালান দেয়। এই শ্লেট-ব্যবসা-সংক্রান্ত কয়েকটি কুঠি পাহাড়ের গায়ে দেখা যাইতেছিল।

ফিরিবার সময় ম্যাকলিয়ড্‌গঞ্জের কাছাকাছি খুব বৃষ্টি আরম্ভ হয়। নৌরাজি কোম্পানির একটা শূন্য গৃহে আমাদিগকে অনেকক্ষণ আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। বৃষ্টি ছাড়িবার পর বর্ষাবারিসিক্ত বৃক্ষাবলির শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা ধর্ম্মশালা ফিরিলাম।

ধর্ম্মশালা হইতে চার মাইল দূরে গঞ্জর নামক স্থানে মহাদেবের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। পথ নীচের দিকে। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর ধর্ম্মশালার বাড়ীগুলি পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইল। কাঙ্গড়া

* লাহোর ল' কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ধর্ম্মকোটের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া মণিমহেশ নামে একটী সুন্দর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

উপত্যকার দিকে যাইতেছিলাম—উপত্যকার ঘরবাড়ীগুলি আরও বড় দেখা গেল, মাঠগুলি আরও স্পষ্ট হইল। একটী পার্ব্বত্য স্রোত পার হইলাম। তাহার উপরের সেতুটি এক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভয়ে ভয়ে অতিক্রম করিলাম। রৌদ্র প্রখর হইল। আরও একটী স্রোত পার হইলাম। সেতুর উপর দাঁড়াইয়া স্রোতগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। স্রোতের জলরাশি অদূরের পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়া, বড় বড় পাথরে ধাক্কা খাইয়া, চূর্ণ হইয়া, লাফাইয়া, ছড়াইয়া, গভীর গর্জ্জন করিয়া, খিল খিল করিয়া হাসিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। যেন বড় তাড়াতাড়ি,—এক মুহূর্ত্তও দেরী করা চলে না। যেন কাহার আকুল আহ্বান কাণে পশিয়াছে, সে আহ্বান শুনিয়া আর স্থির থাকা যায় না। উপরে শুভ্র মেঘখচিত নীল আকাশ, চারিদিকে পাহাড়, এই বৃক্ষচ্ছায়া, এই বিহঙ্গের কাকলি,—এ সকল কিছুই যেন দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছে না। এত আঘাত, এত অপমান,—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। পার্ব্বত্য স্রোতের জলধারা, তোমার ঐ তন্ময় ব্যাকুলতা, আমাকে শিখাইতে পার কি? যাঁহাকে না পাইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাঁহার চিন্তা জীবনের সার করিয়া, কি করিয়া সংসারের শত আঘাত, সহস্র তুচ্ছ আকর্ষণ অবহেলা করিতে হয়, তাহা আমাকে শিখাইবে কি? আমি শুনিয়াছি, ঐরূপ তন্ময় ব্যাকুলতা না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না।

কিছুক্ষণ পরে আমরা মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের ক্রোড়ে ক্ষুদ্র মন্দিরটি অবস্থিত। চারিদিক ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন। মন্দিরের পশ্চাৎ দিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই শান্তিপূর্ণ স্থানটি দেখিয়া দ্বিপ্রহরে ফিরিয়া আসিলাম।

ধর্ম্মশালা হইতে আমরা কাঙ্গড়া রওনা হইলাম। কাঙ্গড়া রাজ্যের

প্রাচীন রাজধানী কাঙ্গড়া নগর। ক্রমাগত ঢালু পথ দিয়া তুই সহস্র ফিট নামিয়া আমরা কাঙ্গড়া উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। উপত্যকাটি অতি মনোরম। খুব উর্ব্বর,—সবুজ সতেজ ধানের ক্ষেতে উপত্যকাটি সম্পূর্ণভাবে সমাচ্ছন্ন। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। এখান হইতে পঞ্জাবের নানা স্থানে চাউল রপ্তানি হয়। সেই ঈষৎ ঢালু শস্যপূর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই পার্ব্বত্য স্রোতগুলি ভূমিকে উর্ব্বর ও মনোরম করিয়াছে। এক স্থানে আমরা ঘোড়াদের বিশ্রাম দিবার জন্য কিছুক্ষণ বসিয়া ছিলাম। ধানের ক্ষেত হইতে বাহির হইয়া একটা স্রোত বড় বড় গাছের তলা দিয়া কুলু কুলু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। অদূরে কয়েকখণ্ড প্রকাণ্ড কাল রংয়ের পাথর পড়িয়া আছে। পাহাড়ের উপর স্রোতের যে ভয়ানক বেগ এবং গভীর গর্জ্জন থাকে, এখানে উপত্যকায় সে সব নাই। যেন তাহারা উত্তেজনার আবেগে বহুক্ষণ গর্জ্জন ও আস্ফালন করিয়া এখন শান্ত হইয়া মৃদুস্বরে কল-গান তুলিয়া চলিয়াছে। আমরা কয়েকটি গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিলাম। গ্রামের মধ্যে পথের পাশ দিয়া স্রোতের জল বহিয়া চলিয়াছে। কোথাও কোন পরিত্যক্ত তীর্থ, প্রস্তরাবদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে এবং তীরে মন্দির, বহুকাল কেহ সংস্কার করে নাই। জলাশয় এখন শুষ্ক। মন্দির মধ্যে দেবতার বিগ্রহ ভগ্নপ্রায়,—ঘাট, প্রাচীর, মন্দির সকলই বিবর্ণ ও মলিন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এক দিন এই সরোবরের জল স্বচ্ছ ছিল, তাহাতে কত বালক-বালিকার প্রফুল্ল মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হইত; ঐ মন্দিরে কত পূত-হৃদয়া রমণীর সমাগম হইত।

আমরা কাঙ্গড়া নগরের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। গ্রামবাসিগণ প্রয়োজন বশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়াছে,—কেহ পদব্রজে,

চলিয়াছে, কেহ বা ছোট ছোট পাহাড়ি ঘোড়ায় চড়িয়াছে। কাহারও উৎসবের উজ্জ্বল বেশ, কাহারও মলিন বেশ। আমরা যে শ্যামল উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিয়াছি, তাহার চারিদিকে অনতি-উচ্চ পর্ব্বতমালা। পশ্চাতে হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখরগুলি শোভা পাইতেছিল। আমরা নীচে হইতে দেখিতে পাইলাম, পাহাড়ের উপর ভয়ানক দুর্য্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। ঘন মেঘরাশিতে পাহাড়গুলি অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইয়া সে অন্ধকাররাশি উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে। কখনও বা বিচিত্র রামধনু পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। এই সকল সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা অপরাহ্ণে কাঙ্গড়া পৌঁছিলাম।

কাঙ্গড়া অতি প্রাচীন স্থান। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল নগরকোট। নগরকোটে কটোচবংশীয় রাজপুত রাজারা রাজত্ব করিতেন। কুরু-ক্ষেত্রের মহাসমরের সময় পর্য্যন্ত এই কটোচবংশের বংশাবলি রক্ষিত আছে। পূর্ব্বে ইঁহারা হিমালয়ের পাদদেশে জলন্ধরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের বিস্তৃত রাজত্বের নাম ছিল ত্রিগর্ত্ত। মহাভারতে ত্রিগর্ত্তের উল্লেখ আছে।* প্রবাদ এই যে এই বংশের প্রথম রাজা ভূমচাঁদের উৎপত্তি হইয়াছিল দেবীর কপালের ঘর্ম্ম হইতে। পঞ্জাবের সমস্ত পার্ব্বত্য রাজাদের বংশ এই কটোচ বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ শোনা যায়। অলেকজান্দারের ভারত-আক্রমণের বিবরণে এই পার্ব্বত্য

* ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাই বিরাট রাজার গরু চুরি করিয়াছিলেন এবং সেজন্য ভীমের নিকট লাঞ্ছিত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ত্রিগর্ত্তরাজ কৌরবদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফেরিস্তা লিখিয়াছেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কনোজের রাজা রামদেব কুমাউন হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য রাজ্যসকল জয় করিয়াছিলেন, কেবল নগরকোটের নিকট দুর্গার মন্দির পবিত্র বলিয়া বিরত হইয়াছিলেন। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ কাঙ্গড়া বা নগরকোট মন্দির লুণ্ঠন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া মন্দির লুণ্ঠন করেন। মন্দির হইতে ৭ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা (দিনার), ৭০০ মণ সোণা ও রূপার থালা, ২০০ মণ স্বর্ণ খণ্ড (ingot), ২০০ মণ রৌপ্য, ২০ মণ মণিমাণিক্যের অলঙ্কার—এই সকল লইয়া যান। ইহা ফেরিস্তার উক্তি। মামুদ কাঙ্গড়া দুর্গে সৈন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১০৪৪ খৃঃ অব্দে হিন্দুরাজগণ মিলিত হইয়া দুর্গ উদ্ধার করেন। মন্দিরের মূল বিগ্রহটি মামুদ লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার প্রতিরূপ (facsimile) অন্য একটী বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৬১ খৃঃ অব্দে ফিরোজ তুঘলক কাঙ্গড়া জয় করিয়া মন্দিরটি পুনরায় লুণ্ঠন করেন। শোনা যায় যে, তিনি বিগ্রহটি মক্কায় পাঠাইয়া দেন, এবং মক্কা-যাত্রিগণ ইহার উপর পদক্ষেপ করিবে বলিয়া বিগ্রহটি পথের উপর ফেলিয়া রাখা হয়। আকবর তাঁহার সভাসদ বীরবলকে কাঙ্গড়ার রাজা করিবেন বলিয়াছিলেন ; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে সংসারচাঁদ শিখদের সাহায্য লইয়া মুসলমানদের হস্ত হইতে কাঙ্গড়া দুর্গ অধিকার করেন। সংসারচাঁদ ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহা কাঙ্গড়ার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের সময়। অপর সকল পার্ব্বত্য রাজগণ সংসারচাঁদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি অনেক রাজাকে আক্রমণ করেন বলিয়া তাঁহার অনেক শত্রু হয়। এক-জন শত্রু গুর্খাদিগকে ডাকিয়া আনে। গুর্খারা অনেক দিন ধরিয়া দুর্গ অবরোধ করে। রাজ্য ছারখার হইতে থাকে। অবশেষে

নিরুপায় দেখিয়া সংসারচাদ শিখ রাজা রণজিৎসিংহের সাহায্য ভিক্ষা করেন। গুর্খাঁরা পরাজিত হয়। জ্বালামুখীর মন্দিরে সংসার চাঁদ এবং রণজিৎসিংহের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়। দুর্গ রণজিৎ সিংহের হাতে যায়। সেই অবধি কাঙ্গড়ার অবনতি। শুধু কাঙ্গড়া নহে—একে একে অপর পার্ব্বত্য রাজ্যগুলিও রণজিৎসিংহের করায়ত্ত হয়। নূরপুরের রাজা বীরসিংহ লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য বহু দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কখনও চম্বায় গিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কখনও ফকির সাজিয়া নূরপুর যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সাত বৎসর অমৃতসরের গোবিন্দগড়ে অবরুদ্ধ ছিলেন। রাণী তাঁহার ভ্রাতা চম্বার রাজার নিকটে থাকিতেন। বীরসিং বৃদ্ধবয়সে নূরপুর দুর্গের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। সংসারচাঁদের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধচাঁদ। রণজিৎসিং অনিরুদ্ধকে লাহোরে ডাকিয়া বলেন, অনিরুদ্ধ যেন তাহার ভগিনীর সহিত রণজিৎ-মন্ত্রী ধ্যানসিংহের পুত্রের বিবাহ দেন। অনিরুদ্ধ এই প্রস্তাব অপমানজনক মনে করেন; অথচ রণজিতের সহিত যুদ্ধ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। অনিরুদ্ধ তখন রাজ্য ত্যাগ করিয়া সপরিবারে ইংরাজ রাজত্বে পলায়ন করেন। ক্রুদ্ধ রণজিৎ সমগ্র কাঙ্গড়া অধিকার করেন অনিরুদ্ধ হরিদ্বারে যান, গড়োয়াল-রাজ সুদর্শন সিংহের সহিত ভগিনীদ্বয়ের বিবাহ দেন, পরবৎসর পক্ষাঘাতে মারা যান। সহানুভূতি-প্রণোদিত হইয়া ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন—

'Thus fell, and forever, these petty hill dynasties,—one at least of which endured for 2000 years. While our ancestors were unreclaimed savages, and the Empire of Rome was yet in its infancy there was a Katoch monarchy with an organized government at Kangra.

অনুবাদ :—এই সকল ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজবংশগুলির এই ভাবে চিরকালের জন্য পতন হইল। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি বংশ ২০০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। আমাদের (ইংরেজদের) পূর্ব্বপুরুষগণ যখন অসভ্য অবস্থায় অরণ্যে বাস করিতেন, রোম রাজ্য যখন শৈশবও অতিক্রম করে নাই, সেই প্রাচীনকালে কটোচবংশীয় রাজগণ কাঙ্গড়াতে সুশৃঙ্খল রাজ্য শাসন করিতেন।•

কাঙ্গড়ার প্রাচীন মন্দিরের নাম বজ্রেশ্বরী দেবীর মন্দির। আকবর টোডরমলের সহিত আসিয়া মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহও দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। রণজিতের আদেশে কাঙ্গড়ার মন্দির এবং জ্বালামুখীর মন্দিরের শিখরদেশ সুবর্ণরঞ্জিত করা হয়। প্রবাদ এই যে জলন্ধর নামক রাক্ষসের দেহ বহুযোজন জুড়িয়া পড়িয়া ছিল, মাথা এইখানে পড়িয়াছিল,—কাণগড় (মাথার গড়) হইতে নাম হইয়াছে কাঙ্গড়া। কাঙ্গড়া এখনও একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এতদঞ্চলে ইহা পীঠস্থান বলিয়া পরিচিত। লোকে বলে, দেবীর দেহ আছে কাঙ্গড়ায় এবং মুখ আছে জ্বালামুখীতে। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে কাঙ্গাড়াতে ভীষণ ভূমিকম্প হয়; তাহাতে সহস্র সহস্র লোক মারা যায়। অধিকাংশ বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে কাঙ্গড়ার প্রাচীন মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া যায়। প্রায় দুইলক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া বহুযত্নে নূতন মন্দির সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে। চাঁদার তালিকার মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু রাজন্যবর্গের নাম দেখিলাম। নূতন মন্দিরটিও দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছে। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। মধ্যে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যে মর্ম্মরনির্ম্মিত পরিক্রম করিবার পথ। মধ্যস্থলে বহু সুগঠিত শিখর-সমলঙ্কৃত মন্দির। মন্দিরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র চূড়া সুবর্ণ রঞ্জিত হইয়া মন্দিরটীকে অপরূপ

সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের মেঝে মর্ম্মর-নির্ম্মিত। সারি সারি মর্ম্মরের স্তম্ভের উপর ছাদ রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে এবং মন্দিরবেষ্টনকারী প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে কতকগুলি মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে,—কোনটি দেব-দেবীর মূর্ত্তি, কোনটি দ্বারপালের মূর্ত্তি, কোনটি ব্যাঘ্র বা অশ্বের মূর্ত্তি। কাঙ্গড়ার মন্দিরে একটি শিলাখণ্ড দেবীর বিগ্রহরূপে পূজিত হয়। শিলাখণ্ডের উপর দেবীর নেত্র অঙ্কিত আছে। রেশম ও জরির বস্ত্র দিয়া এবং নানাবিধ অলঙ্কার দিয়া বিগ্রহটী সজ্জিত থাকে। পার্শ্বে কয়েকটি পিত্তল ও প্রস্তরের মূর্ত্তি আছে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় নহবতের সুমধুর রাগিণী বহুদূর হইতে সমাগত যাত্রীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া দেয়। সন্ধ্যার পর আরতি দেখিতে অনেকে আসে। আরতির পর ছোলাসিদ্ধ প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মন্দিরের নিকট পাণ্ডাদের বাড়ী। দোকান এবং বাজারও বেশী দূর নহে। বর্ত্তমান কাঙ্গড়া নগরটি মন্দিরের পাশেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে নগর ছিল কেল্লার পাশে। মন্দিরের নিকটের পল্লীটি ছিল একটি সহরতলি। উহা 'ভবন' নামে পরিচিত ছিল। মন্দিরের নিকটে একটী দ্বিতল বাসাতে আমরা আশ্রয় লইয়াছিলাম। এখানে বানরদের খুব উৎপাত দেখিয়াছিলাম।

কাঙ্গড়ার প্রাচীন কেল্লাটি মন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। হাঁটা পথে পাহাড় ডিঙ্গাইয়া গেলে পথ কম; গাড়ীর পথে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। আমরা টমটমে করিয়া কেল্লা দেখিতে চলিলাম। পাহাড় বেষ্টন করিয়া পথ চলিয়াছিল। কিছুদূর যাইবার পর কি সুন্দর দৃশ্য নয়ন সমক্ষে প্রসারিত হইল! পাহাড়ের তলায়—বহু নীচে একটি নদী বহিয়া চলিয়াছে। নদীর নাম বাণবঙ্গা—প্রচলিত ভাষায় বনেরি।

পাহাড়ের নিম্নভাগ ঘন বনে সমাচ্ছন্ন। তাহার মধ্য দিয়া স্রোতের জল মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছিল। নদীর অপর পারে পাহাড়। এইরূপ পথ বহুদূর চলিল। অবশেষে কিছু দূর নামিয়া আমরা দুর্গের তোরণের নিকট উপস্থিত হইলাম। দুর্গটি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। পরিখার অপরপাশে বৃহৎ কপাট। দুইটি দ্বার অতিক্রম করিয়া আমরা উপরে উঠিবার সিঁড়ি পাইলাম। সিঁড়ি দিয়া অনেকখানি উঠিতে হইল। প্রাচীরের গায়ে মধ্যে মধ্যে পাথরের উপর হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখিতে পাইলাম। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া যখন মুক্ত আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে আমাকে প্রায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া সুগভীর খাদের মধ্য দিয়া নদীর জলধারা প্রবাহিত। সেই প্রকাণ্ড গভীর খাদের পরপারে— সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষিণে—পাহাড়। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শ্রান্ত রশ্মিগুলি পর্ব্বত-শিখরশ্রেণী রঞ্জিত করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। নীচে সুদূর-প্রসারিত কাঙ্গড়ার ঈষৎ ঢালু শ্যামল উপত্যকা; আর সেই উপত্যকার শিরোভাগে বিশালকায় হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গগুলি একেবারে আকাশ ভেদ করিয়া বহু উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। শৃঙ্গের পশ্চাতে শৃঙ্গ,—আরও বিশাল, আরও উচ্চ। কোথাও শৃঙ্গের উপর তুষারময় কিরীট; কোথাও কৃষ্ণবর্ণ শৃঙ্গের গাত্রে শুভ্রোজ্জ্বল পার্ব্বত্যস্রোত মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সে খেলার, সে বৈচিত্র্যতার আর অন্ত নাই। পর্ব্বতমালা ঊর্দ্ধ গগনে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ তুলিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, অবশেষে বহুদূরে অস্পষ্ট হইয়া আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। হিন্দু অতীত গৌরবের বিরাট ধ্বংসের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমি এক

অলৌকিক দৃশ্যের মধ্যে সূর্য্যাস্ত দেখিতে লাগিলাম। ঐ দেখ, সূর্য্যমণ্ডলের সমস্ত গৌরবরাশি মিলাইয়া যাইতেছে, যেমন এই হিন্দু রাজত্বের সমস্ত গৌরব অদৃশ্য হইয়াছে। কাল আবার নূতন গৌরবে পূর্ব্ব-গগনে সূর্য্যোদয় হইবে। হিন্দুর যে গৌরব অস্ত গিয়াছে, তাহার পুনরুত্থান হইবে কথন ?

দুর্গের উপর নানা জাতীয় বৃক্ষলতা জন্মিয়া স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। আমি শীঘ্রগতি অগ্রসর হইলাম, কারণ সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিতেছিল,—বেশীক্ষণ আর এই সকল জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার মধ্যে থাকা নিরাপদ হইবে না। কিছুদূর গিয়া আবার সোপানাবলি আরোহণ করিতে লাগিলাম। সুন্দর দেবালয়, সুগঠিত স্তম্ভ, কক্ষ, তোরণ প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। দুই চারিটি অপ্সরার মূর্ত্তি এখনও অভগ্ন রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সুললিত বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর আর যাওয়া গেল না। পথ আরও জঙ্গলাকীর্ণ হইল, অন্ধকার গাঢ়তর হইল। যে ব্যক্তি রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে আমার পথ দেখাইয়া সঙ্গে আসিতেছিল,—বলিল উপরে শীশমহল, রাণীমহল প্রভৃতি ছিল, ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইয়াছে।

দুর্গের প্রাসাদে সুখশয্যায় যখন রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইত, প্রতিদিন কি সুন্দর দৃশ্য তাঁহার নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইত! ঐ হিমালয়, এই সুন্দর উপত্যকা, নিকটে এই ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী, নীচে ঐ ক্ষীণ জলধারা। আবার সন্ধ্যায় কি সুন্দর সূর্য্যাস্তই আকাশ ও পৃথিবী ভরিয়া সাজিয়া উঠিত। দেবালয়ে শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হইত, বন্দিগণ স্তব পড়িত, যোদ্ধৃবর্গ সুসজ্জিত হইয়া বীরদর্পে পরিভ্রমণ করিত। বিদেশ হইতে নববধূ যখন প্রথম রাজপুরীতে প্রবেশ করিত, কত বিচিত্র সজ্জায় রাজপ্রাসাদ সমলঙ্কৃত হইত, কত মাল্যতোরণ রচিত হইত, রাজপুর-

নারীগণ উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া নববধূর প্রতীক্ষা করিতেন। নববধূর বিস্মিতনেত্রের সম্মুখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যোর এবং রাজ-ঐশ্বর্য্যের কি বিচিত্র সমাবেশ হইত। উৎসবের দিন দেবালয়-প্রাঙ্গণে পুরনারীগণ সমবেত হইতেন, ভক্তিব্যাকুল চিত্তে বিগ্রহের প্রতি নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন। প্রবাসী প্রিয়জনের জন্য কত মঙ্গলকামনা উত্থিত হইত, আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কত কাতর প্রার্থনা নিবেদিত হইত, উপেক্ষিত জীবনের কত দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইত। প্রাসাদের ছাদ, কক্ষ, বাতায়নের সহিত কত রাজকন্যা ও রাজবধূর সুখ দুঃখ ও হাসিকান্নার স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে। যাঁহার বিনিদ্র নেত্রে কোন হাসি ও অশ্রু গোপন থাকে না, যাঁহার বিশাল হৃদয়ে কোন অনুভূতি হারাইয়া যায় না, তিনিই কেবল সে সকল কাহিনী জানেন।

কাঙ্গড়াতে দুর্গ এবং দেবীর মন্দির ব্যতীত কয়েকটি প্রাচীন তীর্থ আছে। এক স্থানে তিনটি কুণ্ড আছে—সেগুলি সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। কুণ্ডগুলি ক্ষুদ্র, কিন্তু স্থানটি প্রাচীন। আর এক স্থানে দুইটী প্রাচীন শিবালয় আছে,—নাম বীরভদ্র ও নর্ম্মদেশ্বর। মন্দিরগুলির কিছু নিম্নভাগে একটি প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে—তাহাকে ফল্গু বলে। ফল্গুর পার্শ্বে এক স্থানে যাত্রীরা পিণ্ড দান করে, উহার নাম অর্দ্ধগয়া। অদূরে গুপ্তগঙ্গা ও বাণগঙ্গা বিরাজমান। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি মন্দির দেখিলাম।

জ্বালামুখী

কাঙ্গড়া হইতে জ্বালামুখী ২৪ মাইল। সাধারণতঃ মোটর-লরী চলে। কিন্তু বর্ষার সময় পথ বড় খারাপ হয়। তখন লরী চলে না। আমরা বর্ষাতেই গিয়াছিলাম, অগত্যা টমটমেই যাওয়া স্থির করিলাম। টমটম সংগ্রহ করিতেও কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। সকলেই বলে পথ বড়

খারাপ। অবশেষে অনেক কষ্টে বেশী ভাড়া দিয়া দুইটি টমটম ঠিক করিলাম। আমরা সকালে কাঙ্গড়া হইতে রওনা হইলাম। কিছুদূর পর্য্যন্ত বাণগঙ্গার ধার দিয়া চলিলাম। দক্ষিণে পাহাড়, বামে নদী, নদীর পর পাহাড়। নদীর সহিত আমাদের পথও ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। স্রোতের শব্দ শোনা যাইতেছে। মাইল দুই গিয়া দুর্গের নিকটে একটি সুগঠিত সেতু দিয়া আমরা বাণগঙ্গার পরপারে উপস্থিত হইলাম। নদী পার হইয়াও অনেক দূর পাহাড়ের ধার দিয়া চলিলাম। কাঙ্গড়া হইতে রওনা হইয়াই আমরা বৃষ্টি পাইয়াছিলাম, ক্রমে বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল। টমটমের চারিদিক খোলা, বৃষ্টির ঝাট আসে। বৃষ্টি আটকাইবার জন্য টমটমের চারিপাশে সতরঞ্জ কম্বল প্রভৃতি বাঁধিলাম। কিন্তু তাহাতেও বৃষ্টি রোধ হইল না। এই সময় আমরা পাহাড়ের নীচে একটা সুড়ঙ্গে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম। সুড়ঙ্গের মুখেই একটা বড় বিজ্ঞাপন,—লেখা আছে, "সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রায়ই পাথর পড়ে, যাত্রীরা সাবধান।" তথাপি আমাদিগকে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই বিপদসঙ্কুল পথেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। কারণ বৃষ্টি খুব পড়িতেছিল। এখানে আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ সমাধা করিলাম। অবশেষে বৃষ্টির প্রকোপ কিছু কম মনে হওয়াতে পুনরায় বাহির হইলাম। পথের পাশেই পাহাড় এবং নদী। কিছুদুর গিয়া আমরা উপত্যকার উপর দৌলৎপুর নামক গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামটি নেহাৎ ছোট নয়। পথের ধারে একটি সুসজ্জিত গৃহ দেখিলাম। গৃহের দেয়ালে অনেক পৌরাণিক চিত্র রহিয়াছে। শুনিলাম ইহা একটা উকীলের বাড়ী। পথের ধারেই দোকান। পথে এক-হাঁটু কাদা। সেই কাদা ভাঙ্গিয়া কষ্টে টমটম চলিল। দৌলৎপুর পার হইয়া আবার বৃষ্টি পাইলাম। উপত্যকা পার হইয়া আবার পার্ব্বত্য পথ আরম্ভ হইল। এক দিকে

পাহাড় অপর দিকে নদী। আর একটু যাইলেই রাণীতাল পৌঁছিব। রাণীতাল কাঙ্গড়া ও জ্বালামুখীর অর্দ্ধপথে। যখন আমরা রাণীতাল পৌঁছিলাম তখন প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছে। আমাদের কাপড়-জামা ভিজিয়া গিয়াছে। বিছানাগুলি ভিজিয়া ঢোল হইয়াছে, বাক্সর মধ্যেও জল ঢুকিয়াছে। কিন্তু এত অসুবিধার মধ্যেও নিবিড় মেঘের প্রান্তে রজতরেখার ন্যায়, একটু আরাম দেখিতে পাইলাম। আমাদের পাচক ও ভৃত্য পাণ্ডার গোমস্তার সহিত হাঁটাপথে আসিতেছিল। হাঁটাপথে পাহাড় পার হইয়া আসিতে হয়, কিন্তু গাড়ীর পথ অপেক্ষা অনেক ছোট। তাহারা আমাদের অনেক আগে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আমাদের আসিতে বিলম্ব হইবে বুঝিয়া তাহারা দোকান হইতে মাটির হাঁড়ি এবং চাল-ডাল সংগ্রহ করিয়া রান্না চড়াইয়াছিল। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন ভাত প্রায় প্রস্তুত। আমরা অবিলম্বে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া খাইতে বসিলাম। দোকান হইতে দুধ এবং কিছু আচার সংগ্রহ করা হইল। পরম পরিতৃপ্তির সহিত আমরা ভোজন সমাধা করিলাম। তখনও বৃষ্টি ছাড়ে নাই। শুনিলাম কাছেই একটি ভাল পান্থনিবাস আছে। সেখানে জিনিসপত্র নামাইলাম। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি একটু কমিবার লক্ষণ দেখিয়া ভরসা করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ভিজা বিছানাগুলি লইয়া গিয়া জ্বালামুখীতে কোন কাজ হইবে না, কেবল গাড়ীর বোঝা বাড়ান হইবে, এই ভাবিয়া বিছানাগুলি একটী দোকানে রাখিয়া গেলাম। আমরা রওনা হইবার একটু পরে বৃষ্টিও প্রায় ছাড়িয়া গেল। পথও বিশেষ খারাপ ছিল না। দুই পাশে শস্য-ক্ষেত্র। দূরে আকাশের গায়ে পর্ব্বতমালা। বৃষ্টির জল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতে কল কল শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত বড় স্রোতে গিয়া মিশিয়াছে। মাঠে কোথাও খুব ছত্রক ফুটিয়া সাদা হইয়াছে,

কোথাও জামে গাছ ভরিয়া গিয়াছে। বর্ষার স্নিগ্ধ অপরাহ্নে সেই পরম রমণীয় পথের মধ্য দিয়া যাইতে আমাদের খুব ভাল লাগিতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্ধকার পথ। একটা প্রকাণ্ড গাছ ঝড়ে ভাঙ্গিয়া রাস্তার উপরে পড়িয়াছিল। সেখানে কিছুক্ষণ দেরী হইল। অবশেষে রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমাদের টমটম গন্তব্য স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল,—গাড়োয়ানরা বলিল, জ্বালাজি পৌঁছিয়াছি। গাড়ী হইতে নামিয়া প্রায় এক মাইল পথ পাহাড়ে উঠিয়া সুপ্ত গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমরা পাণ্ডাজির গৃহে পৌঁছিলাম। পাণ্ডাজি যথেষ্ট কম্বল গালিচা প্রভৃতি দিলেন। বিছানার অভাবে আমাদের কিছুই কষ্ট হইল না।

জ্বালামুখী পাহাড়ের নিম্নভাগে প্রায় পাদদেশে অবস্থিত। দুইটি পাহাড় যেখানে মিশিয়াছে, সেই সন্ধিস্থলে একটি ঝরণা নামিয়া আসিয়াছে; তাহার পাশেই মন্দির। জ্বালামুখীর অবস্থিতি কতকটা ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্ত্তী সীমাচলের ন্যায়। সীমাচলে আরও অনেকটা উঠিতে হয়। জ্বালামুখী গ্রামখানি আরও বড়। জ্বালামুখী নগরের মধ্য দিয়া একাধিক ঝরণা প্রবাহিত। ঝরণার উপর বড় বড় খিলান গাঁথিয়া তাহার উপর পথ। গত রাত্রে অন্ধকারে জলের শব্দ শুনিয়াছিলাম,—আজ বুঝিলাম, এই সকল ঝরণার শব্দ। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উপর একটী ত্রিতল হর্ম্ম্য। প্রবেশ করিয়া একটী সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ—সাদা এবং কাল মার্ব্বেল পাথরে সুন্দর ভাবে বাঁধান। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দিরের বৃহৎ ধ্বজা। মন্দিরটি দুই ভাগে বিভক্ত; একটি মূল মন্দির—অপরটিকে নাটমন্দির বলা যায়। মন্দিরগুলি আকারে খুব বড় নয়। শিরোভাগ গম্বুজ আকৃতির। তাহার উপর সোণালি জল মাখান। যখন সূর্য্য-কিরণে ঝলমল করে, তখন দূর হইতে সুন্দর দেখায়। এখানে

দেবীর কোন বিগ্রহ নাই। ৯।১০ স্থানে দেয়াল হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে,—তাহাকেই দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া পূজা করা হয়। যে অগ্নিশিখা এখানে প্রধানভাবে পূজিত হন, তাঁহাকে মহাকালী বলা হয়। এই শিখাটি সম্মুখের দেওয়াল হইতে নির্গত হইয়াছে,—ইহা গৃহতল হইতে প্রায় আড়াই হাত উচ্চে অবস্থিত। এই শিখাটি কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় নয়। গৃহতলের মধ্যস্থলে একটী কুণ্ড আছে,—ইহা ২।৩ হাত গভীর এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৩।৪ হাত। এই কুণ্ডের পাশে দেওয়াল হইতে ৫।৬ স্থানে অগ্নিশিখা বাহির হয়—ইহাদিগকে মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী বলা হয়। শিখাগুলির কোনটি বড়, কোনটি ছোট। ইহা ছাড়া, মন্দিরের দেওয়ালে অন্য দুইটি শিখা দেখিলাম। একটি ছোট, একটা খুব বড়—ইহাই সব চেয়ে বড় শিখা—প্রায় দেড় হাত দীর্ঘ—ইহাকে হিঙ্গলাজ জ্যোতি বলে। কুণ্ডের মধ্যে হোম করা হয়—ঘৃত বাদাম পেস্তা নারিকেল প্রভৃতি প্রজ্বলিত অনলে নিক্ষেপ করা হয়। যাত্রীরা দেবীর বিগ্রহরূপ অগ্নিশিখাগুলি স্পর্শ করে, শিখা নির্গম স্থানে, দেওয়ালের ফাঁকে, পেঁড়া টিপিয়া দিয়া বলে মায়ের মুখে পেঁড়া দিলাম। জ্যোতির উত্তাপ সাধারণ আগুনের মত গরম নহে—হাত পুড়িয়া যায় না। যাত্রীদের পূজা হইয়া যাইবার পর মন্দিরের সেবকেরা জল দিয়া মন্দির ধুইল, তখন শিখাগুলি নিবিয়া গেল। পুনরায় একটী ধূমায়মান ধূপশলাকা সংযোগে শিখাগুলি জ্বলিয়া উঠিল। সংকল্পের মন্ত্র পড়াইবার সময় বলে—জলন্ধরপীঠে—শ্রীজ্বালামুখী-তীর্থে।

মন্দিরের সম্মুখে দুইটী বৃহৎ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি। এগুলি সোণালি রং করা। আরও কয়েকটী ব্যাঘ্রমূর্ত্তি এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির এখানে রহিয়াছে। মন্দিরে সকালে ও সন্ধ্যায় নহবত বাজে। প্রাঙ্গণের এক পাশে ঝরণার জল এক বৃহৎ কুণ্ডের মধ্যে পড়িতেছে এবং কুণ্ড ছাপাইয়া প্রাঙ্গণের

উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কুণ্ডটি রেলিং দিয়া ঘেরা। কেহ এখানে অবগাহন করিতে পারে না, বাল্‌তি করিয়া জল তুলিয়া স্নান করে। এই জল পানার্থও ব্যবহার করা হয়। মন্দিরের গায়ে অনেকগুলি বিবিধ বর্ণের পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত আছে। কালক্রমে চিত্রগুলির বর্ণের উজ্জ্বলতা কমিয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও দেখিতে খুব সুন্দর।

মন্দিরের একটু উপরে একটি শিবলিঙ্গ আছে, তাহার উপর অবিরত ঝরণার স্বল্প জল পড়িতেছে। নিকটেই গোরক্ষনাথের মন্দির। এই মন্দির মধ্যে একটি কুণ্ড আছে। কুণ্ডটি জলে প্রায় পরিপূর্ণ। জলের নীচে হইতে অনবরত বায়বীয় পদার্থ (gas) উঠিতেছে, সেজন্য ইহা ফুটন্ত জলের মত দেখাইতেছে। তবে জল গরম নহে। কুণ্ডের পাশে একটী স্বাভাবিক অগ্নিশিখা আছে। এই মন্দিরের নিকট একটী সাধু থাকেন। তিনি বলিলেন, গোরক্ষনাথ এই কুণ্ডে শিখারূপিণী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেবীকে বলিয়াছিলেন, তিনি অন্যত্র যাইতেছেন, যতদিন না ফিরিয়া আসেন, তত দিন দেবী যেন কোথাও না যান। গোরক্ষনাথ আর ফিরেন নাই। সেই হইতে দেবীকে বরাবর থাকিতে হইয়াছে। গোরক্ষনাথের মন্দিরের নিকট আর একটী মন্দিরে লছমীনারায়ণের বিগ্রহ আছে দেখিলাম।

জ্বালামুখী পীঠস্থানের ভৈরবের নাম উন্মত্ত। আমরা উন্মত্ত ভৈরবের স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরের নিকট হইতে পাহাড়ে উঠিবার বাঁধান সিঁড়ি আছে, তাহার পর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। একটী ঝরণা হইতে জল আনিবার জন্য ইষ্টকবদ্ধ একটি প্রণালী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পাশ দিয়া আমরা চলিলাম। কিছু দূর গিয়া একটী প্রাচীন আম-গাছের তলায় উন্মত্ত ভৈরবের কাল পাথরের মূর্ত্তি দেখিতে

পাইলাম। নিকটে একটি শিবালয়। একটী সাধু এখানে থাকেন। তিনি বলিলেন, শিবলিঙ্গ ক্রমশঃ মাটীর নীচে নামিয়া যাইতেছে। শিবালয়ের মধ্যে গঙ্গার এবং সূর্য্যনারায়ণের সুন্দর মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত। এগুলি ছাড়া অন্য বিগ্রহও আছে। মন্দিরের বাহিরে একটি ষাঁড়ের মূর্ত্তি, গণেশের মূর্ত্তি, পঞ্চমুখ হনুমানের মূর্ত্তি প্রভৃতি আছে। আশ্রয়ের অভাবে মূর্ত্তিগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পাহাড়ের উপরে স্রোত হইতে জ্বালামুখীর মন্দির পর্য্যন্ত আধ মাইল পথ প্রণালী বাঁধান আছে

উন্মত্ত ভৈরব দেখিয়া কিছুদূর ফিরিয়া আসিয়া আমরা ভিন্ন পথে পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। খাড়াপথে জঙ্গলের মধ্য দিয়া কিছু দূর উঠিয়া আমরা একটী আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ইহাকে বাবা নাগা অর্জ্জুনের স্থান বলে। জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটী কুটীরের পার্শ্বে একটী প্রশস্ত বেদীর উপর একটী ধ্যানমগ্ন সাধুর কৃষ্ণবর্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বেদীর উপর বসিয়া পূজারির নিকট যে গল্প শুনিলাম, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—জ্বালামুখী তীর্থে সর্ব্ব প্রথমে আসেন বাবা গোরক্ষনাথ, বাবা নাগা অর্জ্জুন এবং জ্বালামুখী মাতা। গোরক্ষনাথ এখানে ভাতের জল চড়াইয়া জ্বালামুখী মাতাকে জলের নীচে জ্বাল দিতে বলেন এবং নাগা অর্জ্জুনকে মায়ের পরিচর্য্যার জন্য রাখিয়া যান। যাইবার সময় তিনি বলিয়া যান, "আমি ভিক্ষা করিয়া ঝুলি ভরিয়া চাউল আনিতে যাইতেছি. যতক্ষণ আমি না ফিরি ততক্ষণ তোমরা এ ভাবে থাকিও।" এই বলিয়া গোরক্ষনাথ চলিয়া গেলেন। তিনি অনেক বিলম্বেও ফিরিলেন না দেখিয়া জ্বালামুখী মাতা অর্জ্জুনদাসকে বলিলেন, "তুমি পাহাড়ে উঠিয়া দেখ, গোরক্ষনাথের এত দেরী হইতেছে কেন।" বাবা নাগা অর্জ্জুন জ্বালামুখীর মন্দির হইতে উঠিয়া এই আশ্রমের নিকট

আসেন। এখান হইতে চারিদিকে চাহিয়া কোথাও গোরক্ষনাথকে দেখিতে পাইলেন না। তখন চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে বসিলেন। ধ্যানের প্রভাবে দেখিতে পাইলেন—পূর্ব্বদিকে বহু দূরে বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের নিকট গোরক্ষনাথ ঝুলি লইয়া ভিক্ষা করিতেছেন। অর্জ্জুনদাস বলিলেন "প্রভো, বড় বিলম্ব হইতেছে, তাই মা আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন, ফিরিয়া আসুন।" গোরক্ষনাথ বলিলেন, "বাবা, আমার ঝুলি ত এখনও ভর্ত্তি হয় নাই। ঝুলি ভর্ত্তি হইলেই আমি ফিরিয়া যাইব। সেজন্য আরও ভিক্ষা করিতে হইবে। তুমি ততক্ষণ ঐ স্থানে বসিয়া ধ্যান কর। তুমি যেখানে বসিয়াছ ঐ স্থানটি ধ্যানের উপযোগী।" প্রভুর কথা শুনিয়া বাবা অর্জ্জুন আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কি সুন্দর দৃশ্য! চারিদিকে কাননকুন্তলা বসুন্ধরা। কোথাও গ্রাম, কোথাও শ্যামল মাঠ, কোথাও বক্রগামিনী স্রোতস্বিনী। ঐ দূরে পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া বিপাশা নদী * বহিয়া আসিয়াছে। ঐ দূর দিগন্তর পর্ব্বতশিখরে কৃষ্ণ বিন্দুর ন্যায় চন্তপুর্ণীর মন্দির। বাবা অর্জ্জুনদাস প্রভুর আদেশে এখানে তপস্যা করিতে বসিয়া গেলেন। সে দিন হইতে কতশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ঐ দেখুন বাবা নাগা অর্জ্জুনের দেহ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। মাতা জ্বালামুখী জ্বাল এখনও নিভিতে দেন নাই। কে জানে কবে বাবা গোরক্ষনাথ ফিরিয়া আসিবেন?

গল্প শুনিতে শুনিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। বহু নিম্নে জ্বালামুখীর সুবর্ণরঞ্জিত মন্দির এবং গৃহগুলি অস্তোন্মুখী সূর্য্যকিরণে সাজিয়া উঠিয়াছিল। আমরা সন্তর্পণে দুর্গম পার্ব্বত্য পথে অবরোহণ করিতে

* বিয়াস নদী বা Beas নদী। সিন্ধুনদের উপনদী। পঞ্জাবের একটি প্রধান নদী।

লাগিলাম। বাবা অর্জ্জুনদাস সম্বন্ধে গল্পের কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। গল্পটির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, প্রসিদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথ জ্বালামুখী তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি এখানে মন্দির স্থাপন করিয়া অর্জ্জুনদাসকে পরিচর্য্যার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। অর্জ্জুনদাস এখানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর দেবী কবচে জ্বালামুখীর উল্লেখ আছে।

জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্ব্বসন্ধিষু।
শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেৎ ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা॥

"জ্বালামুখী নখের জ্বালাস্থান রক্ষা করুন; দেহের সকল সন্ধিস্থান অভেদ্যা রক্ষা করুন; ব্রহ্মাণী শুক্র রক্ষা করুন; এবং ছত্রেশ্বরী ছায়া রক্ষা করুন।"

একান্ন পীঠস্থলের তালিকায় জ্বালামুখীর নাম আছে। প্রবাদ—এখানে সতীর জিহ্বা পতিত হইয়াছিল। এখানে দেবীর নাম অম্বিকা; ভৈরবের নাম উন্মত্ত বা বটুকেশ্বর। এ অঞ্চলে কাঙ্গড়াকেও পীঠস্থান বলে, কিন্তু পীঠস্থানের তালিকায় কাঙ্গড়ার নাম পাইলাম না; জলন্ধরের নাম আছে, উহাই কাঙ্গড়ার পীঠস্থান কি না বলিতে পারি না।

জ্বালামুখী যাইবার দুইটি পথ আছে। কলিকাতা হইতে লাহোর যাইবার পথে প্রথমে জলন্ধর, পরে অমৃতসর। জলন্ধর হইতে একটী শাখা রেলপথ হোসিয়ারপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হোসিয়ারপুর হইতে টমটমে জ্বালামুখী যাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ দুর্গম। বিশেষতঃ বিপাশা নদীর উপর পুল না থাকাতে বর্ষায় যখন বিপাশা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন এই পথে যাওয়া অসম্ভব। অপর পথের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি—অমৃতসর হইতে রেলে পাঠানকোট, সেখান হইতে মোটরে

বা টমটমে কাঙ্গড়া, এবং কাঙ্গড়া হইতে জ্বালামুখী। এই পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। সম্ভব হইলে হোসিয়ারপুরের পথে জ্বালামুখী গিয়া কাঙ্গড়ার পথে ফিরিয়া আসাই যুক্তিযুক্ত। তাহাতে চিন্তপূর্ণী, জ্বালামুখী এবং কাঙ্গড়া তিনটি তীর্থই দেখা যায়।

লাহোর

সন্ধ্যার পরেই বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। পৌষ মাস। লাহোরে প্রবল শীত সম্বন্ধে নানা ভীতিজনক গল্প শুনিয়াছিলাম। কালকাতায় যেখানে যাহা কিছু গরম বস্ত্র পাওয়া যায় কয়দিন ধরিয়া তাহাই সংগ্রহ করা হইতেছিল। দুইটি গার্ম্মের লেপ লইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর 'হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকান হইতে প্রকৃত স্বদেশী পট্টু কিনিয়া পোষাক করাইলাম। এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম।

যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। জানালার কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইলাম, ঘন কুয়াসা ধরার বক্ষের উপর শুভ্র আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। প্রায় পূর্ণ চন্দ্রের আলোকে কুয়াসা উদ্ভাসিত। আর কিছুই দেখা যায় না। ক্বচিৎ সমীপস্থ দুই একটী আলোক বিন্দু শোভা পাইতেছিল। আমরা শুইয়া পড়িলাম। প্রথমটা তেমন শীত করে নাই। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর গাড়ী যখন মধুপুরের নিকট পর্ব্বতমালা বেষ্টিত পথে ছুটিতে লাগিল, তখন শীতের প্রকোপ বেশ অনুভব করিলাম।

প্রভাত হইল। নবোদিত সূর্য্যের মৃদু কিরণগুলি সরিষার ক্ষেত্রের উপর বিশ্রাম করিতেছিল। বৃক্ষের দীর্ঘ ছায়াপাতে ক্ষেত্রগুলি আলো ও ছায়ার চিত্রিত বেশে সাজিয়া উঠিয়াছিল। মাঠের মধ্যে দুই একটি মলিন বস্ত্র পরিহিত কৃষক এবং কদাচিৎ কোন কৃষকরমণী দেখা যাইতেছিল। মাঝে মাঝে গ্রামগুলির ঠিক পাশ দিয়া ট্রেণ ছুটিয়া চলিল,—খোলা দিয়া ছাওয়া ঘনবিন্যস্ত কুটীর-প্রাঙ্গণে ছেলেরা খেলা

করিতেছে, পুরুষেরা খাটিয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিতেছে। গ্রামের ধারেই বৃক্ষপুঞ্জ। চারিদিকে শস্যক্ষেত্র—স্থানে স্থানে অড়হরের দীর্ঘ গাছগুলি শোভা পাইতেছে।

ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই পাটনা পার হইয়াছিলাম। পুলের উপর হইতে শোণের বিস্তীর্ণ নদ সৈকত ও ক্ষীণ জলধারা দেখিতে পাইলাম। প্রত্যূষে আরা ও বক্সার পার হইলাম। গাড়ী যথাসময়ে মোগলসরাই ষ্টেশনে দাঁড়াইল। এখানে আউধ্ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ের ডাক গাড়ীতে উঠিলাম। এই গাড়ী বরাবর লাহোর পর্য্যন্ত যাইবে।

গাড়ী ছাড়িল। একটু পরে আমরা গঙ্গার পুলের উপর আসিলাম। এখান হইতে কাশীর মনোহর দৃশ্য দেখিলাম। উত্তরবাহিনী গঙ্গা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে প্রবাহিত হইয়াছেন, শীতাগমে জলধারা ক্ষীণকায়। তীরে অবিচ্ছিন্ন সোপান শ্রেণী, কত দেবালয়ের চূড়া, কত গৃহ, কত প্রাসাদ প্রভাত-সূর্য্য কিরণে শোভা পাইতেছিল। ঘাটে অসংখ্য নর নারী স্নান করিতেছে। ট্রেণের সকল যাত্রী নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া ছিল। সে দৃশ্য দেখিলে হৃদয় আপনা হইতে ভক্তি-পরিপ্লুত হয়।

কাশী ও বেনারস কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে অনেক যাত্রী নামিয়া গেল। গাড়ী আবার চলিল। ডাকগাড়ী সব ষ্টেশনে থামে না। ১॥০ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা ছুটিয়া বড় বড় ষ্টেশনে অল্পক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। সূর্য্যের তেজ বাড়িতে লাগিল। প্রচুর পরিমাণে ধূলি উড়িতেছিল। দুই পাশে প্রান্তর, কোথাও চাষ হইয়াছে। ক্বচিৎ এক আধটি অর্দ্ধবিশুষ্ক জলাশয় দেখা যাইতেছে। রাখাল বালকেরা আম্রকাননে গরু ছাড়িয়া দিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের ট্রেণের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহাদের মাথায় মলিন পাগড়ি, পরিধানে অপর্য্যাপ্ত মলিন বস্ত্র, হাতে দীর্ঘ লাঠি। পথে কখনও পথিক দেখা যাইতেছিল,—দীর্ঘকায়, হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি,

জামা পাগড়ী সকলই ধূলিমলিন ; পায়ে নাগরা জুতা, কাঁধের উপর রক্ষিত দীর্ঘ যষ্টির প্রান্তে পুঁটুলি। হয়ত কোন স্ত্রীলোক সঙ্গে যাইতেছে। কোথায় ইহাদের বাড়ী ? কি কার্য্যে যাইতেছে ? আমাদের অজ্ঞাতসারে কত সুখ দুঃখ হাসি কান্নার মধ্য দিয়া ইহাদের আড়ম্বরহীন জীবন প্রবাহিত হইয়াছে।

প্রতাপগড়, রায় বেরেলি পার হইলাম। বেলা তিনটার সময় গাড়ী লক্ষ্ণৌয়ের নিকট আসিল। ঘাগরা ও ওড়না পরিহিত দুই চারিটা স্ত্রীলোক মাঠের উপরে দেখা গেল। লক্ষ্ণৌ বড় ষ্টেশন, গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। ষ্টেশনে ফল, মাটির খেলনা, বই প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইতেছিল। লক্ষ্ণৌয়ের পর শাণ্ডিলা। ষ্টেশন হইতে দেখা যাইতেছিল, অনেকগুলি দেবালয়ের চূড়ার উপর অপরাহ্নের সূর্য্য কিরণ পড়িয়াছে। শাণ্ডিলা ষ্টেশনের নিকটে নৈমিষারণ্য তীর্থ।

অপরাহ্নের শীতল সমীরণে আমাদের ক্লান্ত শরীর জুড়াইল। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন। আলোক মিলাইয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ছাইয়া ফেলিল। আলো জ্বালিয়া আমরা গাড়ীর জানালা তুলিয়া দিলাম।

রাত্রে শীতে কষ্ট হইতেছিল। সকালে উঠিয়া দেখিলাম, দয়া করিয়া কে গাড়ীর একটী জানালা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই এত শীত। ভোরবেলা আম্বালা ষ্টেশন পার হইলাম। এইবার পাঞ্জাব প্রদেশ।

ক্রমে আলোক আরও পরিষ্কার হইল। সূর্য্যের দুই চারিটী রশ্মি পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িল। ভূমি খুব উর্ব্বরা। বেশ শস্য হইয়াছে। গাছপালাও বেশী—অনেকটা বাঙ্গালা দেশের মত। কেবল মাটির রং বেশী সাদা।

লুধিয়ানা পার হইলাম। তাহার পরেই শতদ্রু নদ (বর্ত্তমান শাতলেজ্)। জলন্ধর পার হইয়া বিপাশা নদী (বর্ত্তমান বিয়াস্)। দুইটি নদীই বেশ বড়।

মাঠের উপর দুই চারিজন কৃষক দেখা যাইতেছিল। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, পায়ে জুতা, গায়ে কম্বল। পাঞ্জাবের গ্রামগুলি দেখিতে নূতন রকমের। কুটীরগুলি খড় বা খোলা দিয়া ছাওয়া নহে, পাকাঘরের মত সমতল ছাদ। দেওয়াল, ছাদ, সবই মাটির। ঘরগুলি মাটির ঢিবির মত দেখায়। গ্রীষ্মকালে ছাদের উপর শুইতে হয় বলিয়া এই ভাবে তৈয়ার হয়। গ্রামের চারিদিকে একটা প্রাচীর থাকে। প্রাচীরের ফটকের উপর অল্পাবস্তর কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতীত ইতিহাসে পাঞ্জাবের উপর দিয়া এত রাষ্ট্রবিপ্লব চলিয়া যাইত যে, এই প্রাচীর, গ্রামবাসিদিগের আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য্য ছিল।

বেলা ১১টার সময় গাড়ী অমৃতসরে পৌঁছিল এবং তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমাদের সুদীর্ঘ ভ্রমণের অবসান করিয়া লাহোর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। জানালার মধ্যে দিয়া দেখিলাম, মান্দ্রাজী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কুম্ভ কোণম্ বেঙ্কটেশ্বর আয়ার তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় বালক শ্রীমান পট্টাভিরমণকে সঙ্গে করিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত।

লাহোরের প্রধান দেখিবার স্থান জাহাঙ্গীরের সমাধি। সহর হইতে তিন মাইল দূরে রাবী (প্রাচীন ইরাবতী) নদীর পরপারেই নূরজাহান এই সমাধিভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মর্ম্মরখচিত লাল পাথরের প্রকাণ্ড সমাধিভবনে সেই গর্ব্বিত সুখান্বেষী সম্রাটের দেহ শায়িত রহিয়াছে। হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরমণ্ডিত। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে বিস্তৃত ছাদর পাওয়া যায়। তাহার চারি কোণে চারিটি

গম্বুজের উপরে উঠিলে চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। রাবী নদীর বক্রগতি, লাহোরের দুর্গ, প্রকাণ্ড বাদশাহী মসজিদ এবং অগণিত সৌধমালা-সমাকুল লাহোর নগর এখান হইতে বেশ দেখা যায়। সমাধি ভবনের সম্মুখে পরিষ্কার বিস্তৃত ভূমিখণ্ড, তাহার মধ্যে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। এই ভূমিখণ্ডের পশ্চিমে সমাধি-সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড সরাই আছে। এক্ষণে তাহার ব্যবহার হয় না।

জাহাঙ্গীরের সমাধির পশ্চিমে আর একটা বৃহৎ সমাধির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ইহা নূরজাহানের ভ্রাতা উজীর আসফজার সমাধি। এই সমাধির নিকটে রেলওয়ে লাইনের অপর পার্শ্বে নূরজাহানের সমাধি। তাহাতে পাশাপাশি নূরজাহান এবং তাঁহার প্রথম পক্ষের কন্যা লাডলি বেগম শয়ন করিয়া আছেন। সমাধি ভবন অতিশয় ক্ষুদ্র। নূরজাহান নাকি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমাধির উপর আলো বা ফুল রাখা না হয়। কালক্রমে সমাধি ভবন ভাঙ্গিয়া যায় এবং গোশালা রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। সম্প্রতি সরকার বাহাদুরের উদ্যোগে এবং বর্দ্ধমানের মহারাজের সাহায্যে (তিনি ৫০০০৲ চাঁদা দিয়াছিলেন) এই সমাধি ভবনের সংস্কার হইয়াছে। মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠটি মর্ম্মরমণ্ডিত করা হইয়াছে।

লাহোর হইতে ৩।৪ মাইল দূরে শালেমার বাগান। শাহজাহান এই বাগান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম একটা বাগান আর কি দেখিব? কিন্তু দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইল। বাগানের মধ্য দিয়া পথ, পথের ধারে ফোয়ারার সারি। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, প্রায় ২০ ফুট নিম্নে একটি সুন্দর জলাশয় শোভা পাইতেছে। জলাশয়ের মধ্যে নানাস্থানে ফোয়ারা; জলাশয়ের উপর একটি সেতু, সেতুর মধ্য ভাগে বসিবার স্থান; জলাশয়ের পাশে

স্নানাগার, উদ্যান, সকলই মর্ম্মর নির্ম্মিত। এই জলাশয়ের পাশ দিয়া অগ্রসর হইলে আবার পনেরো বিশ ফুট নীচে আর একটি বৃক্ষ লতা শোভিত পরম রমণীয় উদ্যান দেখা যায়। সমস্ত জিনিষটা এমন এক অপ্রত্যাশিত আনন্দের সৃষ্টি করে যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না।

লাহোরের উত্তর প্রান্তে দুর্গ। বাহির হইতে দুর্গের প্রকাণ্ড স্তম্ভ, ফটক, উচ্চ প্রাচীর বিস্ময়জনক দেখায়। কিন্তু দুর্গ মধ্যে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। এই দুর্গের পশ্চিমে বিখ্যাত বাদশাহী মসজিদ। আওরঙ্গজেব এই মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা লোহিত প্রস্তরে গঠিত; লাল পাথরের উপর মার্ব্বেল পাথরে খচিত লতা ফুল প্রভৃতি বেশ সুন্দর দেখায়। মসজিদের আকার অতীব বৃহৎ; উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিশাল প্রাঙ্গণ, চারিদিকে চারিটি উচ্চ গম্বুজ। দুর্গ ও মসজিদের মধ্য ভাগে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান; উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী মর্ম্মর নির্ম্মিত অনুপম-শিল্পকার্য্য-সমলঙ্কৃত ক্ষুদ্র দরবার গৃহ। রণজিৎ সিংহ নাকি এখানে দরবার করিতেন। এই দরবার গৃহের নিকটে রণজিৎ সিংহের সমাধি। সমাধিভবন অনেকগুলি হিন্দু দেবদেবীর চিত্রের দ্বারা সুশোভিত।

লাহোর সেক্রেটেরিয়েট আফিসের পাশে আনারকলির সমাধি গৃহ বর্ত্তমান। আনারকলি শব্দের অর্থ দাড়িম ফুলের কুঁড়ি। যাহার এই কবিত্বপূর্ণ নাম, সে আকবরের একজন ক্রীতদাসী ছিল। নৃত্যকালে রাজকুমার সেলিমকে হাসিতে দেখিয়া সে হাসিয়াছিল, এই অপরাধে আকবর তাহার জীবন্ত সমাধি দেন। আকবর নাকি খুব মহৎ লোক ছিলেন! জাহাঙ্গীর সেই সমাধির উপর এক উচ্চ গম্বুজযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং কবরের উপর পারস্যভাষায় যে কবিতা লিখিয়া দেন তাহার অনুবাদ এইরূপ,—

"আমার প্রিয়ার মুখ যদি আর একবার দেখিতে পাইতাম, হে ভগবান, তাহা হইলে পৃথিবীর শেষদিন পর্য্যন্ত তোমাকে ধন্যবাদ দিতাম।"

কবরের মর্ম্মর নির্ম্মিত আচ্ছাদনের উপর অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যের নিদর্শন বর্ত্তমান। ইংরাজ অধিকারের পর এই সমাধিভবন কিছুদিন গির্জ্জাঘর রূপে, এবং এক্ষণে Secretariatএর Record Room রূপে, ব্যবহৃত হইতেছে। কবরটী খুঁড়িয়া গৃহমধ্যে এক পাশে রাখা হইয়াছে। সহরের এই পাড়ার নাম আনারকলি।

লাহোরের সর্ব্বাপেক্ষা নূতন জিনিষ দেখিলাম—লাহোর সহর। সহরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, এখন স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য কয়েকটী প্রকাণ্ড ফটক—দিল্লী দরজা, কাশ্মীর দরজা, ভাটী দরজা এই সকল তাহাদের নাম। সহরের মধ্যে বাড়ীর গায়ে বাড়ী, তাহার গায়ে বাড়ী। প্রায় সবগুলি দুই তিন তলা উচ্চ, আলোক বা বাতাসের অবকাশমাত্র নাই। বাড়ীগুলি অতি প্রাচীন। অনেক বাড়ী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রাজপথ অতি সঙ্কীর্ণ। পথের দুই ধারে দোকান, দোকানের সম্মুখে ক্রেতার ভীড়, পথে লোকের ভীড়, তাহার মধ্য দিয়া টাঙ্গা নামক দ্বিচক্র অশ্বযানগুলি ছুটিতেছে। এ যেন ঠিক সেই মোগলদের আমলের সহর—কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্রাচীন সহরের বাহিরে আধুনিক লাহোর। এই অঞ্চলে Mall বা ঠাণ্ডি সড়ক একটি প্রশস্ত পরিষ্কার রাজপথ। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, বৃক্ষশ্রেণীর পর বড় বড় দোকান। এই রাস্তার একপার্শ্বে এক বিস্তৃত উদ্যান আছে, তাহা পার্ক বা লরেন্স গার্ডেন্স নামে পরিচিত। উদ্যানের মধ্যস্থানে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় থাকাতে স্থানটি আরও মনোরম হইয়াছে।

পাঞ্জাবে পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী বাঁধে ও ঢিলে ইজার পরে। কৃষকেরা ছোট ধুতির ন্যায় এক খণ্ড বস্ত্র কোমরে জড়াইয়া রাখে। হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ঘাগরা পরে, মুসলমান স্ত্রীলোকেরা পায়জামা পরে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই জুতা পরে। জুতা না হইলে এদেশে উপায় নাই; কুলি মজুর মুচি মেথর সকলকেই জুতা পরিতে হয়। কারণ শীতকালে নিদারুণ শীত, গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরম।

প্রবাদ এই যে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব লাহোর নগর প্রতিষ্ঠা করেন (লবের নাম হইতেই নাকি লাহোর নাম হয়) এবং লাহোরের নিকটবর্ত্তী কাসুরনগর, কুশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণে উল্লেখ আছে যে কুশকে কোশলরাজ্যে এবং লবকে উত্তরদেশে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু লবং তথা।
অভিষিচ্য মহাত্মানাবুভৌ রামঃ কুশীলবৌ॥

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড।

রাম কুশকে কোশল দেশে এবং লবকে উত্তরদেশে অভিষেক করিয়াছিলেন।

কুশের নগর বিন্ধ্যপর্ব্বত সমীপে, নাম কুশাবতী; লবের নগরের নাম শ্রাবস্তী।

কুশস্য নগরী রম্যা বিন্ধ্য পর্ব্বতরোধসি।
কুশাবতীতি নাম্না সা কৃতা রামেন ধীমতা॥
শ্রাবস্তীতি পুরী রম্যা শ্রাবিতা চ লবস্য চ। রামায়ণ, উঃ

রামচন্দ্র বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকট কুশের জন্য রমণীয় কুশাবতী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং লবের জন্য বিখ্যাত এবং মনোহর শ্রাবস্তী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক যুগে জয় পালকে আমরা লাহোরের রাজা দেখিতে পাই। বিজাতীয় আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া ব্যথিত হৃদয়ে জয়পাল একদিন লাহোর নগরের প্রান্তে চিতায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মুসলমান যুগে লাহোর সাধারণতঃ প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। জাহাঙ্গীর কিছুদিনের জন্য দিল্লী হইতে ভারতের রাজধানী লাহোরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কারণ জাহাঙ্গীর কাশ্মীর অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং কাশ্মীর লাহোরের নিকট। রণজিৎ সিংহের রাজধানী ছিল লাহোরে, সেই সময় বোধ হয় লাহোর সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

নানকানা সাহেব

শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা নানক যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রাচীন নাম তালবণ্ডী এবং বর্ত্তমান নাম নানকানা সাহেব। নানক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য 'নানকানা' আর 'সাহেব' একটি সম্মানজনক পদবী * মাত্র। নানকানা সাহেব লাহোর হইতে ২৪ ক্রোশ পশ্চিমে। আজকাল রেল হইয়াছে, সকালে লাহোর হইতে রওনা হইলে নানকানা সাহেব দেখিয়া বৈকালে অনায়াসে ফিরিয়া আসা যায়।

পঞ্জাবের দীর্ঘকালস্থায়ী নিদারুণ গ্রীষ্মকালের অবসান হইয়া আসিতেছিল। তখনও দিনমানে খুব রৌদ্র হইত, কিন্তু প্রভাত ও সন্ধ্যা বেশ রমণীয় হইয়াছিল। এইরূপ এক দিবসে আমরা নানকানা সাহেব দেখিতে যাইব স্থির করিলাম। খুব সকালে ট্রেণ। পূর্ব্বদিন হইতে টাঙ্গাওয়ালাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম। রাত্রি থাকিতেই সে গাড়ী আনিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। রন্ধনের প্রয়োজনীয়

* পাঞ্জাবে সম্মানজনক ব্যক্তি বা বস্তু মাত্রেরই নামের শেষে 'সাহেব' এই শব্দ সংযোজিত করিবার প্রথা আছে। শিখদের মধ্যে এই শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রথা সমধিক প্রচলিত। তাঁহারা মন্দিরকে বলেন 'দরবার সাহেব', ধর্ম্মপুস্তকের নাম দিয়াছেন 'গ্রন্থ সাহেব'। বাঙ্গলা ভাষায় 'সাহেব' মানে 'ইংরেজ'। কিন্তু কোনও ইংরেজ সম্মানার্হ না হইলে, তাঁহাকে সাহেব বলা যায় না, এবং যে কোন মাননীয় বাঙ্গালীকে সাহেব বলিয়া উল্লেখ করিলে সাহেব শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ করা হয়। আমরা সচরাচর যেস্থলে 'সাহেব' শব্দ প্রয়োগ করি, সেখানে 'সাহেব' না বলিয়া 'ইংরেজ' বলা উচিত। নচেৎ দাসসুলভ মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ 'ইংরেজ' মাত্রই সাহেব, বা 'মাননীয়' নহেন; এবং সাহেব মাত্রই ইংরেজ নহেন।

দ্রব্যাদি পূর্ব্বদিন হইতেই সংগৃহীত ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া টাঙ্গাতে উঠিলাম। জনবিরল সুদীর্ঘ পথগুলি অতিক্রম করিয়া টাঙ্গা ক্ষিপ্রগতিতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। আমরা পশ্চিম মুখে চলিয়াছিলাম। বামে নগরীর ঘনসন্নিবিষ্ট উচ্চ সৌধমালা; মধ্যে মধ্যে মন্দির ও মসজিদ। দক্ষিণে বিশাল প্রান্তর। নগর অতিক্রম করিয়া নগর-প্রান্তস্থ উপবনের পাশ দিয়া চলিলাম। রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত বিশালকায় বাদশাহী মসজিদ দূর হইতে দেখা যাইতেছিল। যে পথে রাবী পূর্ব্বে প্রবাহিত হইত তাহা অতিক্রম করিলাম। ইহা 'ছোট রাবী' নামে পরিচিত এবং ইহাতে সচরাচর স্বল্পমাত্র স্রোতোহীন জল থাকে। পূর্ব্বে এই পথে রাবী লাহোরের ঠিক পাশ দিয়া প্রবাহিত হইত, এক্ষণে নদী প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল পরে আমরা রাবী নদীর পুলের উপর উপস্থিত হইলাম। রাবী সিন্ধুনদের প্রসিদ্ধ পাঁচটি শাখার অন্যতম। ইহার প্রাচীন নাম ইরাবতী। নদীগর্ভ অতিশয় বিস্তৃত, কিন্তু তাহার মধ্যে জলধারা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। এক্ষণে নদীগর্ভের অধিকাংশ বালুকা-সমাচ্ছন্ন। ক্ষেত্রে জল দিবার জন্য ভারতের অন্য প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে বেশী খাল কাটা হইয়াছে। সিন্ধুর প্রায় প্রত্যেক শাখা হইতে দুইটি করিয়া বড় খাল কাটা হইয়াছে। এ কারণে শাখাগুলির জল অনেক কমিয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও বর্ষার সময় নদীর জল নদীগর্ভ পরিপূর্ণ করিয়া উভয়কূল ছাপাইয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়। বেশী বন্যা হইলে সহরের ধার পর্য্যন্ত জল আসে। নদী পার হইয়াই আমরা নূরজাহানের সমাধি দেখিতে পাইলাম। সমাধিভবনটি ক্ষুদ্রকায়, কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, সম্প্রতি চাঁদা তুলিয়া সংস্কার করা হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ভারতের প্রসিদ্ধতম

মুসলমান সম্রাজ্ঞী তাঁহারপ্রথম-বিবাহজাত কন্যা লাডলি বেগমের পার্শ্বে শয়ন করিয়া অনন্তকালের জন্য নিদ্রিত রহিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে নূরজাহান আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য যেন কোন বৃহৎ সমাধি-ভবন নির্ম্মিত না হয়; একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি সমাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন। সমস্ত পার্থিব উচ্চ আশা পরিপূর্ণ হইবার পর, জীবনের অপরাহ্নকালে বোধ হয় তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সমগ্র ঐশ্বর্য্য আড়ম্বর ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী এবং মিথ্যা। নূরজাহানের সমাধির অদূরেই জাহাঙ্গীরের সুবৃহৎ সমাধি-ভবন। নূরজাহান বহুব্যয়ে এই সমাধি-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ভারতের রাজধানী দিল্লী হইতে লাহোরে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন, অধিকাংশ সময় এখানেই থাকিতেন। জাহাঙ্গীরের সমাধির নিকটেই নূরজাহানের ভ্রাতা, বাদশাহের মন্ত্রী আসফ-উদ্দৌলার সমাধি। দেখিতে দেখিতে আমরা এই সকল ঐতিহাসিক হর্ম্ম্যরাজি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলাম। দুই পাশে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ,—গম, সরিষা এবং কাপাসের ক্ষেত। ক্ষেতে হলদে এবং লাল ফুল ফুটিয়াছে। কোথাও বা কাপাস ফল ফাটিয়া সমস্ত ক্ষেত সাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে পাঞ্জাবী বালিকারা কাপাস সংগ্রহ করিতেছে। শাহদারা জংশন ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। এখান হইতে একটি লাইন রাওলপিণ্ডি হইয়া পেশোয়ার চলিয়া গিয়াছে, অপর লাইনে আমরা নানকানা সাহেব চলিলাম। পথে নদীর মত বিস্তৃত একটি সুন্দর খাল দেখিলাম। কয়েকটি ছোট ষ্টেশন পার হইলাম। কিল্লা সত্তর শা, দিদোকি মালিয়ান, বহারিয়ানওয়ালা—এই সব নাম। অবশেষে যথাসময়ে নানকানা সাহেব ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

ষ্টেশনে একটি টমটম ছিল। আমরা টমটমে চড়িয়া "জনম্-আস্থান্" অর্থাৎ গুরু নানকের জন্মভূমি দেখিতে গেলাম। মাইলখানেক দূরে

একটি পুকুরের নিকট গিয়া আমাদের গাড়ী দাঁড়াইল। পুকুরকে এখানে তলাও বলে। পুকুরের চারিদিক বাঁধান, তীরে কয়েকটি বড় গাছ। পুকুরের পাশে প্রকাণ্ড সরাই বা অতিথিশালা। এখানে আমরা একটি ঘর লইয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিলাম। মধ্যস্থলে একটি সুবিস্তৃত অঙ্গন, তাহার চারিপাশে সারি সারি ঘর; কিয়দংশ অতিথিশালা, কিয়দংশ স্কুল, বোর্ডিং এইরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা বড় কূপ। আমরা স্নানাহার শেষ করিয়া গুরুদ্বার দেখিতে চলিলাম। একটি প্রকাণ্ড তোরণের মধ্য দিয়া গুরুদ্বারে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণেব দুইদিকে সারি সারি দোতালা ঘর। সম্ভ্রান্ত অতিথি আসিলে এখানে বাস করেন। তোরণ অতিক্রম করিয়া আমরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দির, চারিদিকে কক্ষশ্রেণী। একটি মর্ম্মর-গঠিত পথের উপর দিয়া আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। কক্ষমধ্যে বিচিত্র রেশমি বস্ত্রে আবৃত গ্রন্থসাহেব পূজিত হয়। সম্মুখে বসিবার ঘর। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, পুজারির নিকট আমরা তাহার বৃত্তান্ত শুনিলাম।

পঞ্জাবের নানা স্থানে শিখদের যে সকল মন্দির বা গুরুদ্বার আছে সে সকল মন্দিরে এক এক জন মোহান্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মন্দিরগুলির ভূসম্পত্তি এবং প্রণামী হইতে যথেষ্ট আয় ছিল। কোন কোন মোহান্ত মন্দিরের অর্থের অসদ্ব্যবহার করিতেন। মন্দিরগুলির কর্ত্তৃত্ব যাহাতে মোহান্তদের হাত হইতে উঠাইয়া শিখদের প্রতিনিধিদের হস্তে ন্যস্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে শিখদের মধ্যে এক প্রবল আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনকারীরা 'আকালি' নামে পরিচিত। এক এক দল আকালি এক একটি গুরুদ্বারে গিয়া বসিত, মোহান্তরা তাহাদিগকে মারপিট

করিত, অনেক স্থলে পুলিশ তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। আকালিরা সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াও কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙমুখ হইত না। এই উদ্দেশ্যে আকালিদের একটি 'জাঠা' অর্থাৎ দল, নানকানা সাহেবের গুরুদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই জাঠাতে ২০০ লোক ছিল। সকলেই শুনিয়াছিল যে এই জাঠার লোকদিগকে হত্যা করিবার জন্য মোহান্ত অস্ত্র এবং পাঠান গুণ্ডা সংগ্রহ করিতেছিল। কিন্তু কেহই আত্মরক্ষার কোনও বন্দোবস্ত করিল না। মৃত্যু আসন্ন জানিয়াও আকালিরা মন্দির পরিত্যাগ করিল না। ক্রমে রাত্রি হইল। জাঠার কয়েকজন মন্দিরমধ্যে বসিয়া ছিল, অধিকাংশ লোক বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়া ছিল। মোহান্তের লোকেরা প্রাঙ্গণের চারিদিকে যে সকল ঘর ছিল তাহার ছাদের উপর হইতে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি আকালি গুলিতে হত বা আহত হইলে অবশিষ্ট আকালিরা মন্দিরমধ্যে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল। দরজার উপর গুলি চলিতে লাগিল। দরজায় অনেক গুলির চিহ্ন দেখিলাম। কিছুক্ষণ পরে মোহান্তর লোকেরা মন্দিরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং আকালিদিগকে টানিয়া বাহির করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিল। আমরা মেজের উপর বহু অস্ত্র-চিহ্ন দেখিলাম। প্রাঙ্গণের উপর যে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, এখনও তাহার চিহ্ন দেখা যায়। দুর্বৃত্তরা মৃতদেহের উপর কেরোসিন তৈল ঢালিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। এইভাবে দুই শত লোক ধর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় তাহাদের প্রাণ উৎসর্গ করিল। মোহান্ত এক্ষণে কারাগারে। মন্দির আকালিদের হাতে আসিয়াছে।

গুরু নানকের বাল্য জীবনের বিবিধ ঘটনা স্মরণার্থ এখানে কয়েকটি গুরুদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনীগ্রন্থে লিখিত আছে যে,

তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা তাঁহার হাতে একটি চিনির পাত্র এবং তাহার উপর ৫টি টাকা রাখিয়া গোপাল 'পাঁধা' বা পণ্ডিতের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। এখানে যথারীতি পূজার পর নানকের হাতে খড়ি হইল এবং নানক লেখাপড়া আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, এখানে পড়িবার সময় নানক অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। নানক যে স্থানে পাঠ-অভ্যাস করিতেন, তাহার স্মরণার্থ একটি গুরুদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম 'পট্টি সাহেব'। পুকুরের পাশ দিয়া পথ। সেই পথে আমরা পট্টি সাহেব দেখিতে চলিলাম। গুরুদ্বারের মধ্যে গ্রন্থসাহেব পূজিত হয়। অপর কোনও মূর্ত্তি নাই। গুরুদ্বার দিবারাত্রি খোলা থাকে। পূজারি যাত্রীদিগকে বাতাসা ও ইক্ষুখণ্ড প্রসাদ দেয়।

নানকানা সাহেবে অপর একটি গুরুদ্বারের নাম 'বাললীলা'। নানক যে যোগী বৈরাগীর সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শৈশবেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার খেলা সাধারণ বালকের খেলার মত ছিল না। তপস্বীদের ন্যায় যোগাসনে বসা তাঁহার খেলা ছিল; সন্ন্যাসীদের ন্যায় বেশভূষা করা তাঁহার আর একরূপ খেলা ছিল। পথে সন্ন্যাসীকে যাইতে দেখিলে তিনি তাহাকে গৃহে ডাকিয়া আনিতেন এবং ভক্তিভরে সেবা করিতেন। নানকের বাল্যকালের এই সকল ঘটনা স্মরণার্থ বাললীলা নামক গুরুদ্বারটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

আর একটি গুরুদ্বারের নাম 'কিয়ারা সাহেব' অর্থাৎ গোচারণভূমি। কথিত আছে, নানকের বাল্যকালে বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখিয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, এবং বিষয়কর্ম্মে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পিতার ইচ্ছায় নানক পিতার

গরু মহিষ লইয়া প্রান্তরে চরাইতে যাইতেন। 'চরাইতে যাইতেন' অর্থাৎ মাঠে পশুদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া পরমেশ্বরের ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন। কথিত আছে যে, একদিন তিনি এই ভাবে সারা দিন বসিয়া আছেন, গরু ও মহিষ নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রের শস্য নির্ম্মূল করিয়া খাইয়াছে, সেদিকে লক্ষ্য নাই। সন্ধ্যার সময় কৃষক আসিয়া চীৎকার করিয়া গালাগালি দেওয়াতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কৃষক তাঁহাকে বাড়ী যাইতে দিল না—জমিদারের নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। জমিদার রায় বুলার নানকের পিতাকে ডাকিয়া কৃষকের ক্ষতি পূরণ করিতে আদেশ করিলেন। পিতা পুত্রকে ভৎর্সনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কৃষক নানকের পিতাকে সংবাদ দিল—তাহার ক্ষেত্র পূর্ব্ব অপেক্ষা বেশী শস্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, পূর্ব্ব দিনের ক্ষতির চিহ্নমাত্র নাই। আর এক দিন নানক গরু চরাইতে গিয়া রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃক্ষের পত্রাবলির মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। একটি কালসর্প ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্র নিবারণ করিতে লাগিল। জমিদার রায় বুলার মৃগয়া করিতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন। সেই দিন হইতে জমিদার নানকের বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন। 'কিয়ারা সাহেব' নামক গুরুদ্বারে বসিয়া শিখ নরনারীগণ ভক্তিপ্লাবিত চিত্তে এই সকল ঘটনা স্মরণ করে।

বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানক তালবণ্ডী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বয়সের সহিত তাঁহার ঈশ্বরভক্তি বাড়িতে লাগিল, এবং তিনি সংসারে অধিকতর উদাসীন হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। কপূর্রথালা রাজ্যের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী সুলতানপুর গ্রামের জয়রাম নামক এক সঙ্গতিপন্ন

ব্যক্তির সহিত নানকের জ্যেষ্ঠা ভগিনী নানকীর বিবাহ হইয়াছিল। তাল-বণ্ডী গ্রামের জমিদার নানককে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। ভগিনী এবং ভগিনীপতি নানককে সাদরে আশ্রয় দিলেন। নানক বিবাহ করিয়া কিছুদিন সংসার ধর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাহার পর ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তিনি সন্ন্যাসীবেশে আর একবার তালবণ্ডী গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে গৃহে থাকিতে অনেক অনুরোধ করিলেন। গ্রামের জমিদার রায় বুলার অনেক বিষয়সম্পত্তি দিবেন বলিলেন। কিন্তু পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল—গৃহে তাঁহার মন টিকিল না। তালবণ্ডী গ্রামে কয়েক দিন থাকিয়া বালা এবং মর্দানা নামক শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া নানক চিরদিনের জন্য জন্মস্থান ত্যাগ করিলেন।

নানকানা সাহেবে আরও কয়েকটি গুরুদ্বার আছে। একটির নাম তাম্বু সাহেব, একটির নাম মালজি সাহেব (বা খাজনাখানা; এখানে বোধ হয় জমিদারের বাড়ী ছিল), একটির নাম গুরু হরগোবিন্দ। রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত প্রখর হইয়াছিল। এজন্য সকল গুরুদ্বার দেখা সম্ভব হইল না।

গুরুদ্বারগুলি আকালিদের হাতে আসিবার পর যাত্রীদের বেশ সুবিধা হইয়াছে। আকালিরা সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন সরাই-রক্ষক আমাদের জন্য ঘর খালি করিয়া, ফিনাইল দিয়া ধুইয়া দিল, রন্ধনের জন্য কাঠ দিল। আসিবার সময় আমরা বখশিশ দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে লইল না। বলিল, "তন্খা (বেতন) লই, বখশিশ লইব না।"

অপরাহ্ণে আমরা ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম। দূর হইতে দুইটি কল দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম, এখানে তুলার বীজ ছাড়াইয়া, তুলার

গাঁটরি বাঁধিয়া চালান দেওয়া হয়। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে নানকের জন্মদিন উপলক্ষে নানকানা সাহেবে খুব বড় মেলা বসে।

সন্ধ্যার সময় আমরা লাহোর পৌঁছিলাম।



আজমীর ও পুষ্কর

দিল্লী হইতে রাত্রি আটটার সময় ট্রেণে উঠিলাম, পরদিন সকালে আজমীর পৌঁছিব। ফাল্গুন মাস হইলেও সেদিন বড় দুর্য্যোগ ছিল। রাইসিনা হইতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লী রেল ষ্টেশনে কি করিয়া পৌঁছিব, তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেণে উঠিবার সময় বেশী বৃষ্টি হয় নাই। ট্রেণে উঠিবার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গাড়ীর ছাদ ফুটা ছিল—গাড়ীর মধ্যেও একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। যেদিকে বৃষ্টি পড়ে না, সেই দিকে বিছানা সরাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। শেষরাত্রে জয়পুর ষ্টেশনে ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ীর ধারে পাণ্ডা আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, এখানে নামিয়া গোবিন্দজী দর্শন করিয়া যাইবেন। জয়পুর অতি সুন্দর নগর, একজন বাঙ্গালী এই নগরের নক্সা করিয়াছিলেন। এখানে ভাল ভাল মন্দির আছে। এজন্য জয়পুর দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একটি ছেলের শরীর অসুস্থ ছিল; এজন্য এবার জয়পুর দেখা হইল না। ফুলওয়ারা জংশনে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। এখান হইতে একটা শাখা রেল শম্বর হ্রদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। শম্বর হ্রদ লবণের জন্য বিখ্যাত। এখান হইতে প্রভূত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ ভারতের সকল স্থানে চালান দেওয়া হয়। গাড়ী যখন কিষণগড় ষ্টেসনে পৌঁছিল, তখন বেশ সকাল হইয়াছে। গাড়ীতে বসিয়া সহরের সুগঠিত সাদা বাড়ীগুলি দেখিতে পাইতেছিলাম। নগরের বাহিরে ছোট ছোট পাহাড়ের ধারে কয়েকটি বাঙ্গলো বাড়ী দেখিলাম।

আমরা রাজপুতানার মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। দুই পাশে অনুর্ব্বর প্রান্তর ছোট ছোট গাছ বা গুল্মে আবৃত। প্রান্তরের মধ্যে কখনও কখনও হরিণের দল দেখা যাইতেছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়, পাহাড়ের উপর গাছপালা প্রায় নাই। এই সকল পাহাড় আরাবল্লী গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। বেলা প্রায় আটটার সময় আমরা আজমীরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। আজমীর প্রায় চারিধারে পাহাড় দিয়া ঘেরা। পাহাড়ের অন্তরাল দিয়া ট্রেণ চলিল। প্রভাতের আলোকে বহু সুগঠিত গৃহপূর্ণ নগরটি অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। নগরের পাশেই পাহাড়ের উপর দুর্গ দেখা যাইতেছিল। অবশেষে ট্রেণ ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল। ষ্টেসনটি বেশ বড়। ষ্টেসনে কয়েকটি মারাঠী ভদ্রলোক ও মহিলা দেখিলাম। আজমীর হইতে আমেদাবাদ হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত রেল লাইন গিয়াছে। "বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া" রেলের কয়েকটী বড় আফিস এখানে আছে। এজন্য এখানে নানা দেশের লোক বাস করে।

আজমীরে আমরা King Edward Memorial Hallএ বাসা লইয়াছিলাম। এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। রান্নার বন্দোবস্ত নিজেদের করিয়া লইতে হয়। বাড়ীটি ষ্টেসনের নিকটেই। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য রাজপুতানার রাজন্যবৃন্দ এবং সাধারণ অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গৃহটি দ্বিতল। পাশেই অনেকখানি খোলা জমি ও বাগান আছে। বারান্দা-গুলি বেশ চৌড়া। অসুবিধার মধ্যে ঘরগুলি বড় ছোট এবং ভয়ানক ছারপোকার উপদ্রব।

আজমীরে প্রধান দেখিবার জিনিস—আড়াই-দিনকা-ঝোপ্রা। নগরের এক প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে এই গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহটি উচ্চ ভূমির উপর নির্ম্মিত। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা এই উচ্চ

ভূমি সুরক্ষিত ; এই প্রাচীরের গায়ে কয়েকটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের মধ্যে মধ্যে সুন্দর কারুকার্য্য। ভূষণাবলি-সমলঙ্কৃত রমণীর সুললিত বাহুর ন্যায় স্তম্ভগুলি অতিশয় সুদৃশ্য। অনেকগুলি প্রশস্ত সোপান আরোহণ করিয়া আমরা এই উচ্চ প্রাঙ্গণে আরোহণ করিলাম। প্রাঙ্গণটি চারিদিকে উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা। এক প্রান্তে একটি গৃহ। গৃহটির চারিদিক খোলা। সারি সারি থামের উপর ছাদটি অবস্থিত। ইহা হিন্দুরাজাদের নির্ম্মিত। ইহার গায়ে পাথরের বড় খিলানযুক্ত কয়েকটি ফটক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই খিলানগুলি মুসলমানরা নির্ম্মাণ করিয়া গৃহটিকে একটি মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। আড়াই-দিন-কা-ঝোম্প্রা এই নাম মুসলমানদের সময়ে ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, আড়াই দিনে মুসলমানদের আমলের খিলানগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, মোল্লারা এখানে আসিয়া আড়াই দিন ধরিয়া সভা করিতেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। এই গৃহটি বিদ্যালয়ের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহের স্তম্ভগুলির উপর অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য বিদ্যমান আছে। উপরের দিকে চাহিলে ছাদেও খুব সুন্দর কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই গৃহ সম্বন্ধে General Cunningham বলেন,—

"There is no building in India which either for historical interest or archaeological importance is more worthy of preservation. • • For gorgeous prodigality of ornament, beautiful richness of tracery, delicate sharpness of finish, laborious accuracy of workmanship, endless variety of detail, all of which are due to the Hindu masons, this building may justly vie with

the noblest buildings which the world has ever produced. Dr. Fuhrer বলেন, "The whole of the exterior is covered with a net-work so finely and delicately wrought that it can only be compared to fine lace."

এখানে ঐতিহাসিকের পক্ষে সাতিশয় মূল্যবান শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এখানে একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে ১১৫৩ খৃঃ অব্দে চৌহান বংশীয় রাজা বিশালদেব বিগ্রহরাজ এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ছয়টি দেবনাগরী-অক্ষর-সমাচ্ছাদিত শিলাখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। সে গুলি আজমীরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এগুলির অক্ষর দেখিয়া জানা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এগুলি লেখা হইয়াছিল। দুইটি প্রস্তরখণ্ডে কবি সোমদেব বিরচিত 'ললিত বিগ্রহরাজ' নাটকের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। নাটকের আখ্যানভাগ এইরূপ—রাজা বিগ্রহরাজ ইন্দ্রপুরের রাজা বসন্তপালের কন্যা দেশলাদেবীর সহিত প্রেমে পড়িয়াছেন। দেশলাদেবীও স্বপ্নে বিগ্রহরাজকে দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন এবং রাজার মনোভাব জানিতে শশিপ্রভাকে পাঠাইয়াছেন। রাজা কল্যাণবতীর হাতে দেশলাদেবীকে প্রেমপত্র পাঠাইলেন, তাহাতে লিখিলেন যে তুরস্কদের সহিত যুদ্ধের অভিযানের সময় তিনি দেশলাদেবীর সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইবেন।

তুরস্করা রাজার শিবিরে চর পাঠায়। রাজাও তুরস্কদের শিবিরে চর পাঠান। রাজা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন। তুরস্কদূত রাজ-শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে।

নাটকের অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই। Indian Antiquary, Volume XX, ২০১ পৃষ্ঠাতে Dr. Keilhorn এই নাটকটি ছাপাইয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন যে, এ ক্ষেত্রে শেষ পর্যান্ত বোধ হয়

যুদ্ধ হয় নাই এবং রাজা প্রণয়পাত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দিল্লীতে শিবালিক স্তম্ভের শিলালিপিতে লেখা আছে যে, বিশালদেব বিগ্রহরাজ বার বার মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

৩য় ও ৪র্থ প্রস্তরখণ্ডে বিগ্রহরাজ বিরচিত হরকেলি নাটকের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। ৫ম খণ্ডে একটি কবিতার কিয়দংশ আছে। ৬ষ্ঠ খণ্ডের কয়েকটি ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লেখা আছে যে, রাজা অজয়দেব আজমীর নগর নির্ম্মাণ করেন। তিনি অবন্তীর নিকট মালবরাজ নরবর্ম্মাকে পরাস্ত করেন এবং পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পুষ্করের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ঝোঁপড়ার নিকট মৃত্তিকা খনন করিলে আরও অনেক শিলালিপি পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায়।

আজমীরের আর একটি বিখ্যাত স্থান—দরগা খাজা সাহেব। ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইহা অন্যতম সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। এখানে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধি আছে। ইনি ১১৪৩ খৃঃ অব্দে আফগানিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া ফকির হন। মক্কা মদিনা বাগদাদ প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ইনি অবশেষে শাহাবুদ্দিন ঘোরির সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে আগমণ করেন এবং ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমে আজমীরে বাস স্থাপন করেন। ৯৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি মারা যান। মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। অধিকাংশ সময় উপাসনা এবং ধ্যানে কাটাইতেন। আহার অতি সামান্য ছিল। ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন। চিতোর অধিকার করিয়া আকবর পদব্রজে আগ্রা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। সেই

সময় হইতে দরগা খুব বিখ্যাত হয়। আকবর, শাজাহান, হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রভৃতি লোকেরা বিভিন্ন সময়ে দরগায় সুদৃশ্য গৃহ, দ্বার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একটী প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া এখানে প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরে কিছু দূর গিয়া শাজাহান যে ফটক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। ইহাকে নক্করখানা বলে; কারণ দ্বারের উপর দুইটি প্রকাণ্ড ঢাক আছে। কেহ কেহ বলেন, এই ঢাকগুলি আকবর চিতোর হইতে আনিয়াছিলেন। ইহার পর দক্ষিণে আকবরি মসজিদ। বুলান্দ দরওয়াজা নামক আর একটি অতিশয় উচ্চ দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দেখা যায়। এখানে দুইটি প্রকাণ্ড তামার হাঁড়ি আছে, একটীতে ৭০ মণ আর একটীতে ২৮ মণ চাউল রন্ধন হয়। বৎসরে একবার করিয়া এখানে পোলাও রান্না হয়। তাহার পর সর্ব্বসাধারণে কাড়াকাড়ি করিয়া ইহা ভোজন করে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে নিজাম নির্ম্মিত মহাফিলখানা বা সঙ্গীতালয় আছে। খাজা সাহেবের সমাধি ভবন শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত। শাজাহান ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়; খ্রীষ্টানরা প্রবেশ করিতে পারে না। বেগমী দালান দিয়া সমাধি-ভবনে প্রবেশ করিতে হয়। এই দালান শাজাহানের কন্যা জাহানারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সমাধি-ভবনের অভ্যন্তর বিবিধ বর্ণের প্রস্তর দ্বারা অলঙ্কৃত। সমাধির উপর সোনার কাজ করা কাপড় দিয়া ঢাকা। চারিদিকে রূপার রেলিং। নিকটে আরও একটা সমাধি আছে। তন্মধ্যে খাজা সাহেবের দুই স্ত্রী, এক কন্যা এবং শাজাহানের কন্যা চিমনি বেগমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমাধি-ভবন এবং পাহাড়ের মধ্যে একটী গভীর জলাশয় আছে। সমাধি-ভবনের পশ্চিমে শাজাহান নির্ম্মিত শ্বেত

মর্ম্মরের জামা মসজিদ। ইহাই এখানকার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গৃহ। আজমীরে একটী প্রবাদ আছে যে, দরগা সাহেবের প্রাঙ্গণের নীচে একটী শিবালয় আছে, এবং খাজী সাহেবের আদেশ মত দরগার মুসলমান পরিচারকগণ নিয়মিত ভাবে শিবালয়ে পূজা দিয়া থাকেন।

আজমীর নগরের মধ্যে বাজারের পার্শ্বেই আকবরের দৌলৎখানা বা Magazine। ইহার মধ্যস্থলে প্রাসাদ, চারিদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া সারি সারি ঘর। চারি কোণে চারিটি বৃহৎ গম্বুজযুক্ত ঘর, পশ্চিমে প্রকাণ্ড দরজা। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আকবরকে প্রায় আজমীরে আসিতে হইত। এখানে তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ছিল না বলিয়া তিনি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমের দরজার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গা আছে। এখানে হাতিদের যুদ্ধ এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ হইত। বাদশা এবং বেগমেরা উপরের জানালা হইতে তাহা দেখিতেন। মধ্যের প্রাসাদ এক্ষণে রাজপুতনা যাদুঘর (Museum) রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা দেখিলে একটা নূতন বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার মধ্যে একটী বড় হল, চারি কোণে চারিটি কক্ষ এবং দুইটি সিঁড়ি আছে। বারাণ্ডায় বড় বড় স্তম্ভ আছে। প্রাঙ্গণের চারিপাশে যে সকল ঘর আছে তাহার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি আছে। প্রকাণ্ড দ্বারপথের উপরে যে ঘর আছে, এখানে Sir Thomas Roe প্রথমে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া ইহা বিখ্যাত। Sir Thomas Roe সেই সাক্ষাতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। নূরজাহান এবং অপর এক বেগম দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া এই অদ্ভুত বিদেশী ব্যক্তিকে দেখিতেছিলেন। Sir Thomas Roe তাঁহাদের বহু রত্নালঙ্কার-শোভিত রূপরাশি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মারাঠারাও কিছুকাল আজমীর অধিকার করিয়াছিল। সে সময় তাহারা

নিকটবর্ত্তী আনা সাগরের তীরে শাজাহান নির্ম্মিত একটি সাদা পাথরের বারদরি * উঠাইয়া আনিয়া এখানে ছাদের উপর স্থাপন করিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণজীর মন্দিরে পরিণত করিয়াছিল। যাদুঘরে অনেক হিন্দু ও জৈন দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। একটি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বিশেষ যত্ন সহকারে কোন্‌টি কাহার মূর্ত্তি, কোন্‌টির বিশেষত্ব কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন।

আজমীরে জৈনদের একটি সুন্দর আধুনিক মন্দির আছে। ইহা লাল পাথরে নির্ম্মিত বলিয়া Red Temple নামে পরিচিত। শেঠ মুলচাঁদ সোনি নামক আজমীরের একজন ধনী ব্যক্তি ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জৈন ধর্ম্মের প্রধান ঘটনাগুলির প্রতিমূর্ত্তি ইহার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তি-গুলির চারিদিক কাচ দিয়া ঘেরা। দর্শকগণ চারিদিকে ঘুরিয়া ইহা দেখেন। জৈনদের প্রথম অবতার আদিনাথ বা ঋষভদেব অযোধ্যার রাজা নাভা এবং রাণী মোরাদেবীর পুত্র। তাঁহার জন্ম হইবার পর ইন্দ্র তাঁহাকে সুমেরু পর্ব্বতে লইয়া গিয়া ক্ষীর সমুদ্রের জলে স্নান করাইয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া যান। আদিনাথ অল্পদিন রাজত্ব করিয়া প্রয়াগে অক্ষয় বটের নীচে বসিয়া ধ্যান করেন। এখানে এক সহস্রবৎসর ধ্যান করিয়া তিনি কৈবল্য-জ্ঞান লাভ করেন। এই সকল ঘটনার প্রতিমূর্ত্তি মন্দির মধ্যে রক্ষিত আছে। পর্ব্বত, সমুদ্র, নদ, নদী, সাগর, বৃক্ষ প্রভৃতির বিবিধ বর্ণের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। দেবগণ আকাশে বিবিধ বাহনবিমানে চড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছেন, তাহাও বেশ সুন্দর দেখায়। সিঁড়ি দিয়া দোতালা এবং তেতালাতে উঠিয়া গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া এই সকল মূর্ত্তি দেখিতে হয়।

আজমীরের নিকটবর্ত্তী আনা সাগর হ্রদ দেখিতে অতি রমণীয়। ১১৫০ খৃঃ অব্দে অর্ণ রাজা বা আনাজি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

---

* "বারদরি" একটি ছোট গৃহ।

দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি বৃহৎ বাঁধ দিয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা যখন জলপূর্ণ থাকে, তখন তাহার চারিদিকের পরিধি ৮ মাইল। ইহার চারিদিকে পাহাড়,—তন্মধ্যে পশ্চাতের নাগপাহাড় সর্ব্বোচ্চ। Dr. Fuhrer বলেন, "It is perhaps the greatest of the various natural beauties that contribute to make Ajmere one of the most remarkable of the old native cities of India." আনাজি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ১,১০২ ফিট দীর্ঘ। ইহা পাথরে বাঁধান, এবং খুব উচ্চ। জাহাঙ্গীর ইহার তীরে উদ্যান এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শাজাহান বাঁধের উপরিভাগ মর্ম্মর পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন এবং তাহার উপরে পাঁচটি অতিশয় মনোহর মর্ম্মর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ বা "বারদরি" নির্ম্মাণ করেন।

আনাসাগরের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরে আকাশের গায়ে সারি সারি পাহাড়। নীচে হ্রদের বিশাল নীল জল। হ্রদের চারিদিকে গৃহ, উদ্যান, ঘাট। বিবিধ জলচর পক্ষী হ্রদের জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইতেছে। স্নিগ্ধ সমীরণ হ্রদের জলে তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং শরীর স্পর্শ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া দিতেছে।

আজমীরের প্রাচীন দুর্গের নাম তারাগড় বা গড় বিটালি। নগরের ধারেই উচ্চ পাহাড়ের উপর ইহা নির্ম্মিত। পাহাড়ের শিখরদেশ ২৯০০ ফিট উচ্চ। আজমীর নগর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। অতএব নগর হইতে প্রায় ৯০০ ফিট উঠিলে পাহাড়ের উপর আরোহণ করা যায়। পাহাড়টি খুব খাড়া। এজন্য এই দুর্গটিকে ইংরাজেরা Gibraltarএর দুর্গের সহিত তুলনা করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অজয়দেব ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গ অধিকারের জন্য অনেক যুদ্ধ

হইয়াছিল। ইহা অনেকবার অবরুদ্ধ হইয়াছিল। দুর্গমধ্যে দুই একটি জলাশয়ের চিহ্ন দেখা যায়। ১২০০ লোক ইহাতে বাস করিতে পারিত। কিছুদিন ইহা য়ুরোপীয় সৈন্যদের স্বাস্থ্যনিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা পরিত্যক্ত স্থান মাত্র। ইহার মধ্যে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। আজমীরের প্রথম রাজা আজ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। ইনি শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হন।

দুর্গের পশ্চিমে কিছুদূর নামিলে চশমা নামে একটি উপত্যকা পাওয়া যায়। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর একটী প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ এবং কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এইখানে ঔরঙ্গজেব ও দারা শিকোর যুদ্ধ হয়—এই যুদ্ধে হারিয়া দারা-শিকোর সম্রাট হইবার আশা চিরতরে নির্ম্মূল হয়। রাজা অজয়পাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আজমীর নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অজয়-পাল বৃদ্ধবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া তারাগড়ের পশ্চাতে একটী উপত্যকায় বাস করিতেন। অজয়পালের পৌত্র গোবিন্দরাজ মুসলমান-দের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সুলতান বেগ বরিসকে বন্দী করিয়াছিলেন। এই বংশে বাক্‌পৎরাজ, সিংহরাজ, বিগ্রহরাজ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ১০২৪ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ গজনি আজমীর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি যুদ্ধে আহত হইয়া আনহলওয়ারা চলিয়া যান। অজয়দেব একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার পুত্র আনাজি আনাসাগর হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশালদেব বিগ্রহরাজ হিমালয় পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম চৌহান সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। তাঁহার পৌত্র বিখ্যাত পৃথ্বীরাজ। রাজপুতগণ পৃথ্বীরাজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুতবীর বলিয়া মনে করেন। তিনি মোটে

১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কীর্ত্তি রাজপুত কবিদের গীতের অতিশয় প্রিয় বিষয়। পৃথ্বীরাজ গুর্জ্জর জয় করিয়াছিলেন, এবং মহোবার রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে মহোবার বিখ্যাত সেনাপতি আলা এবং উদিল অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৃথ্বীরাজের হস্তে নিহত হন। কনোজের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা পৃথ্বীরাজের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া স্বয়ম্বর সভায় পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলায় মালাদান করেন। এই সময় পৃথ্বীরাজ বহু বিখ্যাত রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া সংযুক্তাকে নিজ রাজধানী লইয়া যান। পৃথ্বীরাজ তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী আজমীর হইতে দিল্লীতে উঠাইয়া লইয়া যান। শাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরির সহিত প্রথম যুদ্ধে, শাহাবুদ্দিন হারিয়া পৃথ্বীরাজের নিকট বন্দী হন। উদার-হৃদয় পৃথ্বীরাজ শাহাবুদ্দিনকে ছাড়িয়া দেন। ইহার পর শাহাবুদ্দিন পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করেন, এবং ছলনা কৌশলে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পৃথ্বীরাজকে বন্দী করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—যে পৃথ্বীরাজ পূর্ব্বে তাঁহাকে বন্দী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, শাহাবুদ্দিন সেই পৃথ্বীরাজকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। এই দিন হইতে ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা হরিরাজ মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হারিয়া যান। এই সময় হইতে আজমীরের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।

আজমীর হইতে পুষ্কর মোটে সাত মাইল পথ। ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমরা আজমীর হইতে পুষ্কর রওনা হইলাম। সহরের পাশেই একটি ছোট পাহাড় পার হইলাম। তাহার পর পথটি বেশ সুন্দর। দুই পাশে যবের ক্ষেত, মধ্য দিয়া পথ, পথের দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ।

উত্তরে আনাসাগরের বিশাল জলরাশি সূর্য্যালোকে ঝলমল করিতেছিল। তাহার তীরে বাটী, উদ্যান, ঘাট প্রভৃতি শোভা পাইতেছিল। চারিদিকে আকাশের গায়ে পাহাড়। কিছুদূর গিয়া আমরা আর একটী পাহাড় পার হইলাম। ইহার নাম নাগ পাহাড়। তাহার পর বনভূমির মধ্য দিয়া কিছুদূর গিয়া অদূরে সাবিত্রী পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর মন্দির দেখিতে পাইলাম। একটু পরে আমরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুই পাশে দোকান, মন্দির, বাড়ী; মধ্য দিয়া পথ। আমাদের পাণ্ডা লছমীনারায়ণ আমাদিগকে একটী ধর্ম্মশালায় লইয়া চলিল। এই ধর্ম্ম-শালাটি একটী সিন্ধুদেশীয় রমণী তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা এখানে সিন্ধী ধর্ম্মশালা নামে পরিচিত।

পুষ্করের প্রধান স্থান এখানকার হ্রদ। হ্রদটি খুব বড়; কতকটা বৃত্তাকার। হ্রদের চারিদিকে বহুসংখ্যক ঘাট আছে। তন্মধ্যে বরাহ-ঘাট, গো-ঘাট এবং ব্রহ্মঘাট প্রধান। জয়পুর, যোধপুর, কোটা, ভরতপুর, কিষণগড় প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও এখানে ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঘাটগুলি জয়পুর-ঘাট, যোধপুর-ঘাট প্রভৃতি নামে পরিচিত। ঘাটের ধারে ধারে অসংখ্য মন্দির। হ্রদের মধ্যস্থলে একটী ছোট ঘর, তাহার পাশে অনেক কুমীরকে বিশ্রাম করিতে দেখা যায়। হ্রদের জলেও কুমীর ভাসিয়া বেড়াইতেছে দেখা যায়। এজন্য পুষ্করে খুব সতর্ক হইয়া স্নান করিতে হয়। তবে কুমীরে যাত্রীর অনিষ্ট করিয়াছে, ইহা শোনা যায় নাই। হ্রদে অনেক মাছ আছে। বলা বাহুল্য, এখানে কেহ মাছ ধরিতে পারে না। হ্রদের চারিপাশে তীর্থের সীমানার মধ্যে কোন প্রাণিবধ হইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম আছে। ঘাটের ধারে দাঁড়াইয়া খৈ, ছোলা প্রভৃতি জলে ছুঁড়িয়া দিলে বহুসংখ্যক মাছ আসিয়া খাইয়া যায়। এখানে অনেক ময়ূরও আছে। তাহারা

যাত্রীদের কাছে আসিয়া খাবার লইয়া যায়। হরিদ্বার এবং মথুরাতে যেরূপ গঙ্গা ও যমুনার আরতি হয়, পুষ্করে সেইরূপ পুষ্করের আরতি হয়। সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ঘাটের উপর আরতি হয়।

পুষ্করের প্রধান মন্দিরের নাম ব্রহ্মার মন্দির। ভারতের নানা স্থানে বিষ্ণু ও মহাদেবের অসংখ্য মন্দির আছে; কিন্তু ব্রহ্মার মন্দির না কি আর কোথাও নাই। মন্দিরটি পুষ্করের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। বিস্তৃত সোপান-শ্রেণী দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে উঠিতে হয়। মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি পাথর দিয়া বাঁধান। প্রাঙ্গণ-মধ্যে হস্তীর উপর উপবিষ্ট ইন্দ্র ও ও কুবেরের মূর্ত্তি আছে। তাহার মধ্য দিয়া মন্দিরে যাইবার পথ। মূল মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের মধ্যে চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদ চিত্রিত। মূল মন্দিরের প্রধান মূর্ত্তি চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ব্রহ্মার চারি মাথায় চারিটি মুকুট। উপরে চূড়া, রূপার উপর সোণালি রং করা। ব্রহ্মার বাম পাশে শ্বেত পাথরের ক্ষুদ্রকায় গায়ত্রীর মূর্ত্তি। সম্মুখে দুইটি করিয়া চারিটি মূর্ত্তি। ইহারা সাবিত্রীর পুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার। প্রাঙ্গণের এক পাশে অপর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে পঞ্চমুখ মহাদেবের মূর্ত্তি গৌরীশঙ্করের মূর্ত্তি, বীণা হস্তে নারদের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত। মন্দিরে গেরুয়া-পরা অনেক সন্ন্যাসী দেখিলাম। শুনিলাম, ইহারা শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়। কয়েকটি সন্ন্যাসিনীও দেখিলাম।

বাঙ্গালী যাত্রীর, বিশেষতঃ মেয়েদের কাছে পুষ্করের প্রধান আদর এখানকার সাবিত্রীর মন্দিরের জন্য। বাঙ্গালী মেয়েদের বিশ্বাস—সাবিত্রীর কপালে সিন্দূর দিলে সাত জন্ম বিধবা হয় না। এখানকার সাবিত্রী কিন্তু সত্যবানের স্ত্রী নহেন; ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী। সাবিত্রীর মন্দিরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যাত্রীদের জন্য ডুলি

পাওয়া যায়। নগর হইতে প্রায় মাইলখানেক বালুকাময় পথ দিয়া পাহাড়ের নিকট পৌছান যায়। পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি আছে। পাহাড়টি খাড়া। পাহাড়ের উপর কয়েকটি পত্রবিরল গাছ আছে। পাহাড়ের উপর হইতে পুষ্করের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের নীচেই প্রায় গোলাকার পুষ্কর হ্রদ। হ্রদের চারিদিকে ঘরবাড়ী, মন্দির, গাছপালা। পুষ্করের অপর পার্শ্বে পাহাড়ের উপর পাপমোচিনীর মন্দির। চারিদিকে প্রস্তরময় বৃক্ষহীন পাহাড়। কোথাও এক একটী স্বতন্ত্র পাহাড়, কোথাও বা পাহাড়ের শ্রেণী। এই সকল পাহাড় আরাবল্লী গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। দূরে পাহাড়ের কোলে লুনি নদীর ক্ষীণ প্রবাহ রজতধারার ন্যায় দেখা যাইতেছে। এই নদী রাজপুতনার বিশাল মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কচ্ছোপসাগরে (Runn of Cutch) সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে কোথাও ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র; তাহার চারিদিকে গাছপালা এবং দুই চারিখানি সাদা বাড়ী। সাবিত্রী পাহাড়ের শীর্ষদেশ অপ্রশস্ত। এইখানে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া দেওয়াল। আমরা একটা বড় দরজা দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণে একটী ছোট গৃহে শচী দেবীর মূর্ত্তি এবং কয়েকটী মূর্ত্তি দেখিলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। সাবিত্রী দেবীর মূর্ত্তিটি শ্বেত-মর্ম্মর-গঠিত। গায়ে লাল রঙ্গের রেশমী ওড়না, পরিধানে হরিদ্বর্ণের রেশমী ঘাগরা। বহুবিধ সুবর্ণের অলঙ্কার গায়ে শোভা পাইতেছে। মায়ের প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি হইল। মায়ের বামপার্শ্বে শ্বেত-মর্ম্মর-গঠিত বিচিত্র বসন পরিহিত ব্রহ্মা-কন্যা সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি। ১॥/০ ভেট দিলে যাত্রীরা নিজ হাতে মায়ের কপালে সিন্দুর দিতে পায়, এবং মায়ের হাতে লোহা ঠেকাইয়া দেয়। মায়ের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, হাতগুলি

বস্ত্রাবৃত। মায়ের পূজা করিয়া, মন্দিরের চারিদিক পরিক্রম করিয়া আমরা পর্ব্বত অবরোহণ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

প্রবাদ এই যে, স্বর্গে বসিয়া ব্রহ্মা ভাবিতেছিলেন, পৃথিবীর উপর কোথায় তিনি যজ্ঞ করিবেন। এমন সময় তাঁহার হাত হইতে একটি পদ্ম (পুষ্কর) পৃথিবীতে পড়িয়া গেল। যেখানে পদ্ম পড়িল, সেইখানে তিনি যজ্ঞ করিবেন স্থির করিলেন। তিনি পত্নী সাবিত্রীদেবীকে এবং অন্যান্য দেবদেবীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। দেবতারা আসিলেন। কিন্তু শচী প্রভৃতি দেবীদের "সাজ করিতে দোল ফুরাইল।" সাবিত্রীদেবী স্বয়ং প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্য দেবীদের ফেলিয়া একা যাইতে চাহিলেন না। এদিকে শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অগত্যা গায়ত্রীদেবীকে পত্নীরূপে লইয়া ব্রহ্মা যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। সাবিত্রী দেবী আসিয়া খুব রাগ করিলেন, শাপ দিলেন,—পুষ্কর ভিন্ন আর কোথাও ব্রহ্মার মূর্ত্তি পূজা হইবে না, এই বলিয়া পাহাড়ে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন।

পুষ্করে আরও অনেক মন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে বরাহজির মন্দির, বদ্রিনাথের মন্দির, অটনটেশ্বর মহাদেবের মন্দির, রঙ্গজি ও বেঙ্কটেশের মন্দির প্রসিদ্ধ। অনেক স্থলেই প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্রহ্মার বর্ত্তমান মন্দির ১৮০৯ খৃ: অব্দে সিন্ধিয়ার মন্ত্রী গোকলচাঁদ পরেখ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বরাহজির প্রাচীন মন্দির আজমীরের রাজা অর্ণরাজ (যিনি আনাসাগর খনন করিয়াছিলেন) ১১২৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মেওয়ারের রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সগরসিংহ ইহার পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ ইহা পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গোঘাটের নিকট কেশোরায়ের একটি বড় মন্দির ছিল, আওরঙ্গজেব উহা ভাঙ্গিয়া

সেখানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অটমটেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরটি মাটির নীচে। তাহার উপরিভাগে আজমীরের মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা গুমনজিরাও আধুনিক মন্দিরটি নির্ম্মণ করিয়াছেন। বেঙ্কটেশের মন্দির বৃন্দাবনের শেঠজির মন্দিরের ন্যায় দাক্ষিণাত্য-প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয় স্থলেই অর্থশালী শিষ্য দক্ষিণদেশীয় নিজ নিজ গুরুর আদেশে মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পুষ্কর অতি প্রাচীন স্থান। সত্যযুগ হইতে ইহা তীর্থরূপে খ্যাত আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণে পুস্কর-মাহাত্ম্যের কথা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। সেখানে পুস্করকে "সমস্ত তীর্থানামাদ্যং" অর্থাৎ সকল তীর্থের আদি বলা হইয়াছে। পদ্ম-পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, এখানে অসংখ্য তীর্থ এবং মুনি ও রাজর্ষির আশ্রম আছে। তন্মধ্যে পঞ্চস্রোতা সরস্বতী, যজ্ঞপর্ব্বত, নাগতীর্থ, চক্রতীর্থ, জমদগ্নির কুণ্ড, গয়াকূপ, কপিলা পুষ্করিণী, সুপ্রভাকূপ, রূপতীর্থ, রুদ্রকুণ্ড, অগস্ত্যাশ্রম, মৃকণ্ডমুনির তীর্থ, পুলস্ত্যতীর্থ, বিষ্ণুপদ, দধীচির আশ্রম, পাপ-নাশন তীর্থ, মংকণের আশ্রম, মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম, প্রেততীর্থ, সপ্তর্ষির আশ্রম, দশাশ্বমেধ তীর্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নাগপর্ব্বতের ক্রোড়ে ঝরণার ধারে সাধারণতঃ এই আশ্রমগুলি অবস্থিত। সেখানকার দৃশ্য অতি রমণীয়। কত ঋষি ও মুনি এই পুণ্য ভূমিতে তপস্যা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

পুষ্করে দুর্লভং স্নানং পুষ্করে দুর্লভং তপঃ।
পুষ্করে দুর্লভং দানং পুষ্করে দুর্লভা স্থিতিঃ॥

পুষ্করের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়া পুরাণকার বলিয়াছেন,—

অন্যস্থানে কৃতং পাপং তীর্থস্থানে প্রণশ্যতি।
তীর্থস্থানে কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি॥

অন্যস্থানে যে পাপ করা যায়, তীর্থস্থানে তাহা বিনষ্ট হয়। কিন্তু তীর্থস্থানে যে পাপ করা যায়, তাহা হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

কামুকাঃ ঘাতুকাঃ নিত্যং পরবঞ্চন তৎপরাঃ।
নহি তে শুদ্ধিমায়ান্তি কোটিতীর্থৈরপি ধ্রুবম্॥

যাহারা কামুক, হত্যাকারী এবং পরকে বঞ্চনা করে, তাহারা কোটি তীর্থ করিলেও শুদ্ধ হয় না।

পুষ্করে আমরা চারি পাঁচ দিন ছিলাম। প্রভাতে ব্রহ্মাজির মন্দির হইতে নহবতের সঙ্গীত শোনা যাইত। অপরাহ্নে ঘাটের ধারে গিয়া বসিতাম। সূর্য্যের কিরণ মৃদু হইয়া আসিত, স্নিগ্ধ পবন হ্রদের জলে ক্ষুদ্র বীচিমালা সৃজন করিয়া প্রবাহিত হইত, ছেলেদের হাত হইতে খাদ্যলাভের আশায় ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ঘাটের নিকট আসিত, ময়ূর-ময়ূরী ঘাটের সোপানের উপর ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিত, অদূরের ঘাট আরতির আলোকমালায় সাজিয়া উঠিত, হ্রদের জলে সে আলোক প্রতিফলিত হইত, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে নৈশ বায়ু পরিপূর্ণ হইত। অনেকক্ষণ পরে আমরা বাসায় ফিরিতাম।

চিতোর

রাত্রি ১০টার সময় আজমীর হইতে ট্রেণ ছাড়িল। সকালে ৬টার সময় চিতোরগড়,ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনে নামিয়া দুইটী টাঙ্গা ভাড়া করিলাম এবং চিতোরগড় পাহাড় অভিমুখে চলিলাম। ষ্টেশনের নিকট ডাক-বাঙ্গলো, কয়েকটি দোকানঘর এবং একটি পুলিশের থানা আছে। থানা হইতে গড় দেখিবার জন্য অনুমতি পত্র (pass) পাইলাম। দুইটি টাঙ্গার জন্য ।০ আনা করিয়া ॥০ আনা মাত্র লাগিল। তাহার পর প্রান্তরের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিল। পলাশবৃক্ষের পত্রহীন শাখাগুলি লাল ফুলে ভরিয়া গিয়াছিল। অদূরে পূর্ব্বগগনে চিতোর পাহাড় দেখা যাইতেছিল। পাহাড়ের উপরিভাগ সমতল। তাহার উপর মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে মন্দির বা প্রাসাদ-শীর্ষ দেখা যাইতে ছিল। আমাদের পথ কিছুদূর পর্য্যন্ত উত্তর দিকে গিয়া তাহার পর পূর্ব্বদিকে চলিল। একটি ক্ষুদ্র নদী পার হইলাম। নদীর নাম গামেরা। কোথাও বালুকাময় নদী-সৈকতে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও নদীর কাল জলে তীরস্থ বৃক্ষরাজির এবং নীল আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। রাজপুত রমণীগণ কলসীকক্ষে নদীতে জল আনিতে যাইতেছিল। পাহাড়ের ঠিক নীচেই একটি বড় গ্রাম। গ্রামের নাম তলহাটি। গ্রামটি চারিদিকে দেওয়াল দিয়া ঘেরা। দ্বারপথে একজন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের পাশ দেখিয়া সে যাইতে দিল। দুই পাশে দোকান, মধ্যে পথ। একটি সীতারামের মন্দির ও ডাকঘর দেখিলাম। অবশেষে আমরা পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে একটি বৃহৎ দরজা পাহাড়ে

উঠিবার পথ রক্ষা করিতেছিল। দরজার প্রকাণ্ড কপাট বহুসংখ্যক লৌহ-শলাকা দ্বারা রক্ষিত। হাতী যাহাতে দরজা ভাঙ্গিবার জন্য ধাক্কা দিতে না পারে সেজন্য এইরূপ ব্যবস্থাছিল। দরজার বাহিরে পাহাড় অত্যন্ত খাড়া। পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড পাথর। পাহাড়ের নিম্নভাগ জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলে হরিণ, বাঘ, এমন কি পূর্ব্বে সিংহও থাকিত। পাহাড়ে উঠিবার পথটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের উপরিভাগে কাঙ্গড়া (battlement)। পথটি দুইবার ফিরিয়া ইংরাজী z অক্ষরের আকারে উপরে উঠিয়াছে ; এবং পাহাড়ের উপরিভাগ সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত করিয়া যে প্রাচীর আছে সেইখানে গিয়া শেষ হইয়াছে। প্রাচীর এবং কাঙ্গড়া সম্প্রতি মেরামত করা হইয়াছে। কাঙ্গড়াগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছে। রাজপুত কবিগণ এই কাঙ্গড়া-সমলঙ্কৃত প্রাচীরকে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুকুট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দূর হইতে ইহা মুকুটের মতই দেখায়। ফটক পার হইয়া আমরা পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলাম। পথের একপাশে প্রাচীর, অপর পাশে পাহাড় ; পাহাড়ের উপর ধাও গাছের জঙ্গল। প্রাচীরে সংলগ্ন একটি প্রস্তরবদ্ধ বিস্তৃত উচ্চ পথ রহিয়াছে। দুর্গ রক্ষা করিবার সময় সৈনিকগণ এই পথে চলাফেরা করিত এবং প্রাচীর-নিহিত অন্তরালের মধ্য দিয়া শত্রুদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিত বা অস্ত্র নিক্ষেপ করিত। পাহাড়ে উঠিবার সময় মাঝে মাঝে প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী দেখিতে পাইলাম। বেদীর উপর সুন্দর কারুকার্য্য। এগুলি ইতিহাসের অতীত ঘটনার স্মৃতি-চিহ্ন। আমরা একে একে সাতটি সুদৃঢ় দরজা পার হইলাম। তাহাদের নাম পটোলপোল, ভৈরবপোল, হনুমানপোল, গণেশপোল, জোড়লাপোল, লক্ষ্মণপোল ও রামপোল। পথটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। চিতোরগড়ে প্রবেশ করিবার ইহাই সর্ব্বপ্রধান পথ। ইহা

পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত। পাহাড়ে উঠিবার ইহা ছাড়া আর দুইটি পথ আছে। একটি পূর্ব্বদিকে, অপরটি উত্তর দিকে। রামপোলের নিকটেই দরিখানা; বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রাজপুত সর্দ্দারগণ এখানে মিলিত হইতেন। প্রবাদ এই যে, আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর ধ্বংশের পূর্ব্বে এখানে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আবিভূর্তা হইয়া রাণাকে বলিয়াছিলেন "ম্যা ভুঁখা হুঁ" (আমার ক্ষুধা পাইয়াছে)।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে চিতোর পাহাড়ের উপরিভাগ প্রায় সমতল। ইহা প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ এবং আধ মাইল প্রস্থ। পাহাড়ের উপর ভাল রাস্তা আছে। তাহাতে গাড়ী চলে। আমরা পাহাড়ে উঠিয়া একজন পথ-প্রদর্শক লইলাম। লোকটি জাতিতে হিন্দু দর্জি। পাহাড়ের অধিকাংশ ভগ্নস্তূপে সমাচ্ছন্ন। কয়েকখণ্ড জমিতে চাষ হয় দেখিলাম। পথে একটি ক্ষুদ্র দেবীর মন্দিব রহিয়াছে। দেবীর নাম তুলজা ভবানী। মন্দির পার হইয়া আমরা গোমুখী গঙ্গা নামক স্থানে চলিলাম। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, মীরাবাঈয়ের মন্দির, উদয়পুরের রাণার নূতন রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে গাড়ী হইতে নামিয়া দুই চারি মিনিট ভগ্ন গৃহ এবং দেবালয়ের পাশ দিয়া চলিয়া আমরা নীচে নামিবার প্রশস্ত সুগঠিত সোপানশ্রেণী পাইলাম। সোপানশ্রেণী সম্প্রতি সুন্দর ভাবে মেরামত করা হইয়াছে। উদয়পুরের আধুনিক রাণাদের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিবার এই চেষ্টা প্রশংসার্হ। সিঁড়ি দিয়া কিছুদূর নামিয়া আমরা একটি কুণ্ড বা ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিতে পাইলাম। কুণ্ডটি খুব প্রাচীন। ইহার জল কিয়ৎ পরিমাণে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডটি পাহাড়ের এক প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে দুর্গ-প্রাচীর। কুণ্ডটির পূর্ব্বদিকে একটি শিবালয় আছে। শিবালয়ের মধ্যে একটি ছোট ঝরণা

আছে। ঝরণার জল অতি পরিষ্কার এবং পান করিবার উপযোগী। এই জল কুণ্ডের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। এখানে একটি সুড়ঙ্গের মুখ আছে। এই সুড়ঙ্গ না কি এখান হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই শিবালয়ের উপর একটী ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। তাহার মধ্যে আমরা জিনিষপত্র রাখিলাম এবং নিকটে একটি উন্মুক্ত স্থলে বৃক্ষতলে রাঁধিবার উদ্যোগ করিলাম। পাচক ও ভৃত্যকে এখানে রাখিয়া আমরা শীঘ্র দর্শনীয় স্থান সকল দেখিতে চলিলাম; কারণ, ক্রমশঃ রৌদ্রের তেজ প্রখর হইতেছিল। এখান হইতে গাড়ী করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। পশ্চিমে পুত্ত ও জয়মল্লের বাসভবন দেখিতে পাইলাম। নিকটে একটি সরোবর দেখাইয়া পথ-প্রদর্শক বলিল, ইহা সূর্য্যকুণ্ড,—আকবরের সহিত যুদ্ধের সময় এখান হইতে প্রত্যহ যোদ্ধবর্গ সহিত রথ নির্গত হইত। অবশেষে মুসলমানগণ গোরক্ত দ্বারা ইহা অপবিত্র করিয়া দিল। তাহার পর আর রথ বা যোদ্ধা উঠিল না। টডের রাজস্থানে কিন্তু উল্লেখ আছে যে, মেওয়ারের রাণাদের পূর্ব্বপুরুষদের বাসস্থান গুজরাটের নিকটবর্ত্তী বল্লভীপুরে একটি সূর্য্যকুণ্ড ছিল; এবং বল্লভীপুর যখন বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হয়, সেই সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সূর্য্যকুণ্ডের নিকটে আরও দুই একটি পুষ্করিণী দেখিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ পাহাড়ের উপর ৩২টি পুষ্করিণী এবং একটি ঝরণা আছে। এ কারণ পাহাড়ের উপর জলকষ্ট হইত না। সূর্য্যকুণ্ড পার হইয়া একটি মন্দিরের নিকট আমাদের গাড়ী দাঁড়াইল। মন্দির-প্রাঙ্গণটি পথ হইতে খুব উচ্চ; অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। শুনিলাম, ইহা কালীর মন্দির। বিগ্রহটি সাদা পাথরের। কেবল মুখটি দেখা যায়, অবশিষ্টাংশ লাল কাপড় দিয়া ঘেরা। মূল মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। চারি সারি স্তম্ভের উপর নাটমন্দিরের ছাদটী অবস্থিত। মন্দিরে পুরোহিত আছেন, এখনও পূজা হয়।

(১) কালীর মন্দির দেখিয়া আমরা পদ্মিনীর প্রাসাদ দেখিতে চলিলাম। কালীর মন্দির এবং পদ্মিনীর প্রাসাদের মধ্যে বীরবর চণ্ডের স্মৃতি-মন্দির ("Vaulted cenotaph of Chonda") আছে বলিয়া টড সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের ইহা দেখা হয় নাই। পদ্মিনীর প্রাসাদটি এখনও সম্পূর্ণ অভগ্ন এবং ব্যবহার-যোগ্য অবস্থায় রহিয়াছে। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে যখন আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, তখন চিতোরের সকল গৃহ এবং দেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন—কেবল পদ্মিনীর প্রাসাদ ভাঙ্গেন নাই (২)। পদ্মিনীর সময় প্রাসাদের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার পর কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। চিতোরে উদয়পুরের রাণার নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে রাণারা চিতোরে আসিলে পদ্মিনীর প্রাসাদেই বাস করিতেন। এজন্য প্রাসাদটি সম্পূর্ণ বাসযোগ্য অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। এখানে কিছু কিছু আসবাবও আছে। প্রাসাদটি একতলা এবং কয়েকটি স্বতন্ত্র মহলে বিভক্ত। প্রত্যেক মহল চারিধারে উচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। এক একটি মহলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের

(1) The shrine of Kalika Devi esteemed one of the most ancient of Chitor, existing since the time of the Mori, the dynasty prior to the Guhilot—(Tod's Rajasthan). Erskine সাহেবের মতে ইহা পূর্ব্বে সূর্য্যের মন্দির ছিল।

(2) Alla remained in Chitor some days admiring the grandeur of his conquest; and having committed every act of barbarity and wanton dilapidation which a bigotted zeal could suggest, overthrowing the temples and other monuments of art, he delivered the city in charge to Maldeo, the chief of Jhalor whom he had conquered and enrolled amongst his vassals. The place of Bheem and the fair Padmini alone appears to have escaped the wrath of Alla.—Tod's Rajasthan, p. 222.

পাশে কয়েকটি করিয়া ঘর। কোন মহলে বৈঠকখানা, কোনটিতে বসিবার ও শুইবার ঘর, বা পূজার ঘর। ঘরগুলি আকারে ছোট। একটি ঘরে একটি বৃহৎ আয়না একটি টেবিল এবং কয়েকটি চেয়ার দেখিলাম। মনে পড়িল সেই আয়নার কথা, যাহার মধ্যে আল্লাউদ্দিনকে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখান হইয়াছিল। প্রাসাদের পার্শ্বেই জলাশয়। জলাশয় গভীর, বহু নিম্নে সামান্য জল রহিয়াছে দেখা গেল। জল ধরিয়া রাখিবার যখন বন্দোবস্ত ছিল, তখন জলাশয়টি প্রচুর জলে পূর্ণ থাকিত বোধ হইল (৩)। অদূরে জলাশয়ের মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদ দেখিত পাইলাম (৪)। শুনিলাম, জলাশয় যখন জলপূর্ণ থাকিত, তখন উভয় প্রাসাদের মধ্যে নৌকা চলিত।

পদ্মিনীর প্রাসাদ চিতোরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পর আর বড় একটা ঘরবাড়ী বা তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় না। (৫) স্থানটি কতকটা সহরতলির (Suburb) এর মত। পদ্মিনীর প্রাসাদে দাঁড়াইয়া পদ্মিনীর কাহিনী মনে হইল। দীর্ঘ অবরোধের পরও চিতোর অধিকার করিতে না পারিয়া আল্লাউদ্দিন প্রথমে বলিলেন, পদ্মিনীকে

(৩) Todএর "রাজস্থানে" পদ্মিনীর প্রাসাদের যে চিত্র আছে তাহাতে দেখা যায়, সরোবর জলপূর্ণ র হয়াছে।

(৪) আমাদের পথ প্রদর্শক বলিল, জলাশয়ের মধ্যের প্রাসাদও পদ্মিনীর প্রাসাদ। Tod সাহেবের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, ইহা চিতোরের প্রাচীন পুয়ার বংশীয় রাজা চিত্রং মোরির প্রাসাদ।

(৫) Tod লিখিয়াছেন যে, পদ্মিনীর প্রাসাদের দক্ষিণে একটি পাথরের দেওয়াল ঘেরা স্থান আছে। এখানে কুম্ভ মালবরাজকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

চিতোর পাহাড়ের নিকটেই দক্ষিণে (১৫০ গজ দূরে) আর একটি পাহাড় আছে তাহার নাম চিতোরী। এই পাহাড়ের উপর হইতে আল্লা চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, আল্লা যখন ১২ বৎসর ধরিয়া চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন, তখন মাটি ফেলিয়া এই পাহাড় বা ঢিপি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পাইলেই তিনি চলিয়া যাইবেন; শেষে বলিলেন, পদ্মিনীকে একবার দেখিতে পাইলেও তিনি চলিয়া যাইতে প্রস্তুত।

আল্লাকে বলা হইল, আয়নার মধ্যে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখান হইবে। আল্লা তাহাতেই রাজি হইলেন। চিতোর প্রবেশ করিয়া পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখিয়া আল্লা ফিরিয়া যাইতেছিলেন, ভীমসিং ভদ্রতা করিয়া আল্লার সহিত পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে আগাইয়া দিতে গেলেন। কিন্তু তিনি যখন দুর্গের বাহিরে গেলেন, অমনি আল্লা ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন। আল্লা বলিয়া পাঠাইলেন পদ্মিনীকে পাইলে ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। পদ্মিনী তাঁহার পিতৃব্য গোরা এবং ভ্রাতা বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আল্লার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার সহিত ৭০০ শিবিকায় সখীরা যাইবে। এই ৭০০ শিবিকা যখন মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হইল, তখন প্রস্তাবমত ভীমসিং চিতোর অভিমুখে চলিলেন। কিন্তু আল্লা তাঁহাকেও ধরিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সেই ৭০০ শিবিকা হইতে ৭০০ যোদ্ধা বাহির হইল। শিবিকার ২৮০০ বাহকেরাও যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিল। বাদল ও গোরার নেতৃত্বে এই ৩৫০০ রাজপুত অলৌকিক বীরত্ব সহকারে অগণিত মুসলমান সেনার সহিত যুদ্ধ করিল। ভীমসিংহ এই অবসরে ক্ষিপ্র গতিতে অশ্বারোহণে চিতোর প্রবেশ করিলেন। রাশি রাশি মুসলমান নিহত করিয়া রাজপুতগণ প্রায় প্রত্যেকে প্রাণত্যাগ করিল। গোরা মারা গেল। রক্তাক্ত দেহে বাদল ফিরিয়া আসিল। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীর সকল মারা গেল। আল্লা বিফল-মনোরথ হইয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আল্লা চিতোরের সম্মুখে আবার দেখা দিলেন। চিতোরের শ্রেষ্ঠ বীরগণ পূর্ব্বের যুদ্ধে মারা গিয়াছিল। এবার

চিতোর রক্ষা করা দুর্ঘট হইল। পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তের কিয়দংশ আল্লা অধিকার করিয়াছিলেন। রাত্রে দুশ্চিন্তায় রাণা লক্ষ্মণসিংহের নিদ্রা হয় নাই। এমন সময় চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেখা দিলেন, বলিলেন, "ম্যঁা ভুখা হুঁ" (আমার ক্ষুধা পাইয়াছে)। রাণা বলিলেন "রাক্ষসি, আমার ৮০০০ জ্ঞাতি খাইয়াছ, এখনও ক্ষুধা মিটে নাই?" দেবী বলিলেন, "আমি রাজবলি চাই। মুকুটপরা ১২ জন প্রাণ না দিলে চিতোর আর তোমাদের হাতে থাকিবে না।" রাণার ১২ জন পুত্র সকলেই আগে প্রাণ দিতে উৎসুক হইল। একে একে ১১ জন গেল, প্রত্যেককে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল, রাজদণ্ড হাতে দেওয়া হইল, মাথায় ছত্র ধরা হইল, চামর দোলান হইল। তিন দিন সে রাজা রহিল। চতুর্থ দিনে দুর্গের বাহিরে গিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিল। যখন একে একে ১১ রাজপুত্র এই ভাবে প্রাণ দিল তখন অবশিষ্ট পুত্রকে রাজা জোর করিয়া যাইতে দিলেন না,—তাঁহাকে সুড়ঙ্গ পথে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর জহর ব্রত হইল,—সহস্র সহস্র রাজপুত রমণী একজনের পর একজন প্রজ্বলিত অনলে প্রাণ আহুতি দিলেন। সকলের শেষে পদ্মিনী। তাহার পর দুর্গের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। রাজপুতগণ শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল, রাণাও প্রাণ দিলেন। আল্লা চিতোর অধিকার করিলেন। এই প্রথম চিতোর ধ্বংস।

পদ্মিনীর প্রাসাদ দেখিয়া পুত্তর প্রাসাদ দেখিলাম। আকবর যখন চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন, ভীরু রাণা উদয় সিং তখন কোন ছলে চিতোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন চিতোর রক্ষা করিবার ভার প্রথমে লইলেন চন্দাবৎবংশীয় সহিদাস। সূর্য্যপোল নামক পূর্ব্ব দ্বারে যুদ্ধ করিতে করিতে ইনি প্রাণ দিলেন। তখন নেতা হইলেন

পুত্ত। পুত্তের বয়স তখন ১৬। পুত্তের পিতা পূর্ব্বেই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন। পুত্ত মাতার একমাত্র তনয়। বীরমাতা পুত্রকে গৈরিক বস্ত্র পরাইয়া চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে অনুমতি করিলেন; নিজেও অস্ত্রধারণ করিয়া প্রস্তুত হইলেন। শুধু তাহাই নহে; পুত্তের বালিকা বধূর হস্তে বর্ষা দিয়া তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া চলিলেন। রাজপুতগণ দেখিল পুত্ত, তাহার মাতা ও পত্নী সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ সমর্পণ করিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বিস্ময়জনক ঘটনা আর না পাইয়া Tod লিখিয়াছেন—

Like the Spartan mother of old she commanded him to put on the 'sappron robe' and to die for Cheetore; but surpassing the Grecian dame she illustrated her precept by example and lest any soft compunctions visiting for one dearer than herself might dim the lustre of Kailwa she armed the young bride with a lance, with her descended the rock, and the dependants of Cheetore saw her fall, fighting by the side of her Amazonian mother (Annals of Mewar, p. 266.)

পুত্তের মৃত্যুর পর নেতা হইল রাঠের বীর জয়মল্ল। দুর্গ-প্রাচীরের উপর সেনা-সমাবেশ করিবার সময় জয়মল্লের গায়ে একটা গোলা লাগিল। দূর হইতে শত্রুর গোলার আঘাতে মরিতে হইবে এই চিন্তা জয়মল্লের অসহ্য হইল। আবার জহর ব্রত করিয়া রাজপুত রমণীগণ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পর অবশিষ্ট ৮০০০ রাজপুত দুর্গদ্বার খুলিয়া সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ করিল (৬)। নয়টি রাণী, পাঁচটি রাজকন্যা, দুইটি

(৬) চিতোর দুর্গে উঠিবার পথে হনুমানপোলের নিকট একটি ক্ষুদ্র প্রস্তর-বেদী আছে। এখানে জয়মল্ল মারা গিয়াছিলেন। নিকটে আর একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। তাহার উপর বর্শাহস্তে একটি অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এইখানে পুত্ত নিহত হন। নিকটে রঘুদেবেরও একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে। রঘুদেব চণ্ডের ভ্রাতা ইনি ভ্রাতৃহস্তে নিহত হইয়াছিলেন; রাজপুতেরা ইঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করে।

শিশু এবং যাবতীয় সর্দারের পরিবারবর্গ হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, নয় অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিল। মন্দির এবং প্রাসাদ ধ্বংস বিষয়ে আকবর আলাউদ্দিন, অপেক্ষা কম বর্ব্বরতার পরিচয় দেন নাই। Tod বলিয়াছেন, The third sack of Cheetore was marked by the most illiterate atrocity, for every monument spared by Alla or Bayazeed was defaced, which has left an indelible stain on Akbar's name as a lover of the arts, as well as of humanity.

চিতোরের রাজচিহ্ন সকল বিলুপ্ত করিবার জন্য আকবর অশোভন ব্যগ্রতা দেখাইলেন। রাণাদের চিতোর প্রবেশ বা চিতোর ত্যাগ করিবার সময় বৃহৎ নাকাড়া (drums) ধ্বনিত হইত, চারিদিকে কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত সে শব্দ শোনা যাইত,—আকবর সেগুলি লইয়া গেলেন। এগুলির ব্যাস ৮।১০ ফিট হইবে। দেবীর মন্দির হইতে ঝাড়লণ্ঠন লইয়া গেলেন ; দরজা দুইটিও উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

পুত্তের প্রাসাদটি দুই তিনটি মহলে বিভক্ত। কোনটি বহির্ব্বাটী, কোনটি অন্তঃপুর। বাটীটি রাজপথ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। বাটীটী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা ত্রিতল ছিল বলিয়া বোধ হইল। একটি কক্ষে একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পুত্তজির বিগ্রহরূপে পূজিত হয়। রাজপুতগণ সিন্দুর মাখাইয়া মূর্ত্তিটি রক্তবর্ণে পরিণত করিয়াছে। পাশে আর একটি কক্ষে একটি স্ত্রী-মূর্ত্তিও পূজিত হয়। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, উহা কঙ্কালী মাতার মূর্ত্তি। আমার মনে হইল, উহা পুত্তজির মাতার মূর্ত্তি হইতে পারে। পুত্তজির প্রাসাদের নিকটে দুর্গ-প্রাচীরের পার্শ্বেই জয়মল্লের গৃহ। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, পুত্তজি জয়মল্লের ভগিনীপতি ছিলেন। Tod লিখিয়াছেন—

The names of Jeimul and Putta are, as house hold words,

inseparable in Mewar and will be honoured while the Rajpoot retains a shred of his irhertance or a spark of his ancient recollections.

জয়মল্লের বীরত্ব সম্বন্ধে Tod লিখিয়াছেন—

"Abul Fazl, Herbert, the Chaplain to Sir T. Roe, Bernier all honoured the name of Jeimul."

যে গুলিতে জয়মল্ল মারা যান, আকবর বলেন, তিনি নিজে সেগুলি ছুঁড়িয়াছিলেন। আকবর সে বন্দুকের নাম দিয়াছিলেন 'সিংগ্রাম'। আকবর পুত্ত এবং জয়মল্লের বীরত্বের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রাসাদের দ্বারদেশে হস্তীর উপর উভয়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। Bernier ১০০ বৎসর পরে আসিয়া এই মূর্ত্তি দুইটি দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

"These two great elephants, together with the two resolute men sitting on them do at the first entrance into this fortress make an impression of I know not what greatness and awful terror."

ইহা উদ্ধৃত করিয়া Tod বলিয়াছেন—

"Such was the impression made on a Parisian, a century after the event; but far more powerful the charm to the author of these annals, as he pondered on the spot where Jeimul received the fatal shot from the Singram, or placed flowers on the cenotaph that marks the fall of the son of Chonda (সহিদাস) and the mansion of Putta whence issued the Seesodia matron and her daughter. Every foot of ground is hallowed by ancient recollections.

যুদ্ধক্ষেত্রে যত রাজপুত প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, আকবর না কি তাহাদের যজ্ঞোপবীত একত্র করিয়া ওজন করিয়া দেখিয়াছিলেন ৭৪॥৶ মান হইয়াছিল। চার সেরে এক মান হয়। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া চিঠির উপর ৭৪॥০ লিখিয়া দিলে এখনও লোকে তাহা খুলিতে ভয় পায়,—চিঠি খুলিলে চিতোর-ধ্বংসের সময় যত রাজপুত মারা গিয়াছিল, ততগুলি রাজপুত হত্যার পাপ স্পর্শ করিবে।

আকবর চিতোর অধিকার করিয়া যে ধ্বংস করিয়াছিলেন, সে ধ্বংসের আর কখনও পূরণ হয় নাই।

পুত্ত এবং জয়মল্লের বাড়ী দেখিয়া আমরা আবার গাড়ী করিয়া চলিলাম। বহু দূর পর্য্যন্ত পুত্তর প্রাসাদ এবং তাহার ঝরোকাগুলি আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এখান হইতে আমরা দুর্গের পূর্ব্ব দ্বার দেখিতে গেলাম। রাণার নূতন প্রাসাদের পাশ দিয়া চলিলাম নূতন প্রাসাদটি বেশ বড়; সমস্তটি চূনকাম করা চিতোরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে অনেক শিকার পাওয়া যায়। রাণা শিকার খেলিবার জন্য প্রায়ই উদয়পুর হইতে আসেন এবং এই প্রাসাদে থাকেন। পূর্ব্বদ্বারের নিকট নীলকণ্ঠের মন্দির (৭) দেখিলাম। মন্দির মধ্যে সুবৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ ও বেদী রহিয়াছে। পূজারী আমাদিগকে মিশ্রির প্রসাদ দিলেন। এই মন্দির দেখিয়া আমারা পূর্ব্বদিকের দরজা দেখিতে গেলাম। আকবরের চিতোর আক্রমণের সময় এখানে সহিদাস দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। একটি প্রস্তরময় বেদী সেই ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। সূর্য্যপোলটিও খুব বড়। এখান হইতে একটি পথ পাহাড় হইতে নামিয়া গিয়াছে। পথের দুইধারে

(৭) এই মন্দিরটি Tod কুক্কুরেশ্বর মহাদেবের মন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হইল। রাণা কুম্ভ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দেওয়াল দিয়া ঘেরা। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন এখানে সংস্কার কার্য্য হইতেছিল।

সূর্য্যপোল দেখিয়া ফিরিবার সময় আমরা একটি জৈন মন্দির এবং স্তম্ভ দেখিলাম। মন্দির এবং স্তম্ভের চারিধারে বহুসংখ্যক পাথরের মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। স্তম্ভটি রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভের অনুরূপ, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট। এই স্তম্ভটির নাম খোয়াসিন স্তম্ভ। ইহা ৭৫ ফিট উচ্চ। Tod সাহেব এখানে ৮৯৬ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপি পাইয়াছিলেন। এই মন্দির এবং স্তম্ভ জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের নামে উৎসর্গ হইয়াছিল।

এখান হইতে আমরা প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলাম। ইহা লখ রাণার প্রাসাদ নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন রাণা রায়মল্ল ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রাসাদটি সুবিস্তৃত। ইহা দুই তিন তলা উচ্চ ছিল; এক্ষণে অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে কোন প্রাচীর বা প্রকোষ্ঠর অভগ্ন অংশ এখনও বিদ্যমান আছে। প্রাসাদের চারিদিকে প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের মধ্যে দেবজীর মন্দির। এই দেবজী ভোজ নামে একজন চৌহনবংশীয় রাজপুত যোদ্ধা ছিলেন। রাজপুতগণ ইঁহাকে অবতার বলিয়া মনে করেন। ইনি নাকি রাণা সঙ্গকে একটি কবচ দিয়াছিলেন। ঐ কবচের প্রভাবে রাণা সঙ্গ বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন; একজন আধুনিক রাণা প্রাচীন প্রাসাদটি পুনঃ সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সংস্কার কার্য্য কিয়দ্দূর মাত্র করিয়াই উহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে এই প্রাসাদ হইতে গোমুখী গঙ্গা পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাড়ীর মেয়েরা সেই পথে স্নান করিতে যাইতেন। এই সুড়ঙ্গের মুখ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আল্লাউদ্দিন যখন চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, তখন পদ্মিনী এবং অন্য সকল রাজপুত রমণী এইখানে

জহরব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদিগকে বলিয়াছিল। কিন্তু Tod বলিয়াছেন যে, গোমুখী গঙ্গার নিকট সুড়ঙ্গের মধ্যে আল্লাউদ্দিনের সময় জহরব্রত অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল, আকবরের সময় যে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা গোমুখী গঙ্গার নিকট অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শুনিলাম, এখন সুড়ঙ্গের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাসাদের বাহিরে একটি ছাদযুক্ত বেদী আছে। এখানে না কি রাণাদের মেয়েদের বিবাহ হইত। ইহা পার হইয়া আমরা এক প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। ইহার নাম নওলক্ষা ভাণ্ডার নওলক্ষা ভাণ্ডারে রাজকোষ থাকিত এইরূপ অনুমান হয়। কেহ কেহ বলেন, বনবীর যখন চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন এখানে বাস করিতেন।

তাহার এক পার্শ্বে একটি গৃহে অনেক তোপ আছে। তাহার নাম তোপখানা। ইহার নিকটেই ভামশা মন্ত্রীর বাড়ী। রাণা প্রতাপসিংহ যখন নিরাশ হইয়া মেওয়ার পরিত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন এই ভামশা তাঁহার পিতৃপুরুষ-সঞ্চিত বহু অর্থ প্রতাপের নিকট স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

নওলক্ষা ভাণ্ডারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি মন্দির আছে। তাহার নাম শিঙ্গারচৌরা। ইহা একটি জৈন মন্দির। ১৪৪৮ খৃঃ কুম্ভ রাণার কোষাধ্যক্ষের পুত্র ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বেলা অধিক হইয়াছিল। আমরা এখান হইতে গোমুখী গঙ্গার নিকট চলিলাম। সেখানে ঝরণার জলে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ হইল। আহার্য্যও প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা ভোজন সমাধা করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম

আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন এই গোমুখী গঙ্গার ধারে জহর-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। আমার মনে হইল, ইহা একটি পবিত্র তীর্থ। যে স্থানের সহিত কোন পবিত্র স্মৃতি "বিজড়িত আছে, যেখানে আসিলে মন পবিত্র হয়, তাহাই তীর্থ। আপনি একবার এখানে অসিয়া বসুন, সেই জহর-ব্রতের কথা স্মরণ করুন,—দেখুন, মন পবিত্র হয় কি না। একবার মানস নেত্রে-চাহিয়া দেখুন—ঐ সহস্র সহস্র রাজপুত রমণী শ্রেণী বাঁধিয়া একটির পর একটি আসিতেছে, ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে একটির পর একটি প্রবেশ করিতেছে! কি সুন্দর সুললিত রূপ, মুখে কি পবিত্র ভাব। ঐ দেখুন, সুন্দর, কোমল দেহখানি ভস্মরাশিতে পরিণত হইল! একটি নয়, দশটি নয়, একশত নয়, সহস্রের পর সহস্র। ঐ মাটির যদি রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেই ভস্ম এখনও পাওয়া যাইত ; মন্দিরের দেওয়ালে, দুর্গ প্রাচীরের গাত্রে সেই ধূমকণা এখনও লগ্ন হইয়া আছে। একবার এখানে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করুন—সুখ বড়, না, ধর্ম্ম বড়? ভোগ বড়, না, ত্যাগ বড়? জীবন বড়, না, মৃত্যু বড়? জীবনের সুখভোগ সকলই ফুরাইয়া যাইবে, কিন্তু মহত্ত্বের কথা, ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গের কথা চিরকাল উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

আমরা এখানে বসিয়া সম্মুখের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার মধ্যে দিয়া চিতোর হইতে উদয়পুরের রেলওয়ে লাইন প্রসারিত রহিয়াছে। ঐখানে আকবরের উর্দ্দু বা শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। পণ্ডোলি হইতে বুশি পর্য্যন্ত প্রায় দশ মাইল ইহা বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সৈন্যের বিরুদ্ধে কয়েক সহস্র মাত্র রাজপুত সৈন্য দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা যদি মুখের কথা একবার মাত্র বলে—"আকবর, আমরা তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিতেছি" তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকে না, আকবর সৈন্য লইয়া দিল্লী ফিরিয়া যান, রাজপুতেরা স্ত্রী-

পুত্র লইয়া জীবনের সকল সুখ ভোগ করিতে পারে কিন্তু রাজপুতরা স্থির করিয়াছিল, কিছুতেই ঐ কয়টি কথা বলা হইবে না। জীবনের সকল সুখ চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়, তাও স্বীকার; প্রাণ যায়, তা'ও স্বীকার; প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় স্ত্রী ও কন্যারা স্তন্যপায়ী শিশু ক্রোড়ে করিয়া, আগুনে পুড়িয়া মরে, তা'ও স্বীকার। আকবর কিছুতেই ইহাদিগকে এই কয়টি কথা বলাইতে পারিলেন না। রাগ করিয়া তিনি ঘরবাড়ী মন্দির ভাঙ্গিয়া দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। ইতিহাস লেখে, রাজপুতরা হারিয়া গেল; আকবর জিতিলেন। আমরা ত দেখি,— আকবর হারিলেন; রাজপুতরা জিতিল। আকবর চাহিয়াছিলেন, রাজপুতদিগকে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করাইবেন। তিনি তাহা পারেন নাই। রাজপুতরা বলিয়াছিল, কিছুতেই আকবরের প্রভুত্ব স্বীকার করিব না। একজন রাজপুত বাঁচিয়া থাকিতে, মোগলকে চিতোরে ঢুকিতে দিব না; রাজপুতরা তাহাদের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিয়াছিল। তাহারা মরিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা ত প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, তাহারা চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে। আকবরও ত একদিন মরিয়াছিলেন।

তাই বলি, চিতোর হিন্দুর মহাতীর্থ। হিন্দুর একবার এখানে আসিয়া দাঁড়াও, অতীতের কথা স্মরণ কর। তাহার পর জিজ্ঞাসা কর, সংসারের সুখ-দুঃখকে তোমার ধর্ম্মের পথে, তোমার কর্ত্তব্যের পথে বাধা দিতে দিবে কি? তুমি দুর্ব্বল হইতে পার, তুমি দরিদ্র হইতে পার; কিন্তু তুমি যদি ধর্ম্মকে, কর্ত্তব্যকে সকলের উপর তুলিয়া ধর, তাহা হইলে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পার।

চৈত্রের অপরাহ্নের ঈষৎ তপ্ত বাতাস সম্মুখের আম্রবৃক্ষের পত্র এবং পুষ্প কাঁপাইয়া, কুণ্ডের জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা তুলিয়া অনবরত উদাস-

ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। মনের মধ্যে কেবল সেই গানের পদগুলি জাগিতেছিল—

দেখরে জগৎ মেলিয়া নয়ন,
দেখরে চন্দ্রমা দেখরে গগন,
স্বর্গ হতে সবে দেখ দেবগণ,
জলদ অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন তোরাও দেখরে,
সতীত্ব রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরাণ অনল শিখে।

গোমুখ গঙ্গার পাশে একটি কক্ষে কয়েকটি মূর্ত্তি পূজিত হয়। তুইটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। মধ্যে উপবিষ্ট ধ্যানী মূর্ত্তি। অপর একটি মূর্ত্তি একটি সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কক্ষের এক পার্শ্বে দেওয়ালের গায়ে একটি রমণী-মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিতে কেবল মুখ ও বক্ষ আছে। বাম হস্তে দর্পণ, দক্ষিণ হস্তের এক অঙ্গুলি ওষ্ঠের উপর, এক অঙ্গুলি চিবুকের উপর। সুগঠিত নাসা, আয়ত চক্ষু, চারু বঙ্কিম ওষ্ঠ। প্রসন্ন মুখশ্রী। গলায় হার, হাতে বালা, মাথায় মুকুট। মূর্ত্তিটি সুবৃহৎ—চিবুক হইতে কপাল পর্য্যন্ত এক হাতের চেয়ে বড়। মাথার মুকুট শুদ্ধ প্রায় তুই হাত। দর্পণের পশ্চাদ্ভাগের আকার মৃণালযুক্ত পদ্মের ন্যায়। ওষ্ঠের কিয়দংশ একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এজন্য মনে হইল মূর্ত্তিটি প্রাচীন হইতে পারে। ইহা কি পদ্মিনীর মূর্ত্তি ?

রৌদ্রের তেজ মৃদু হইলে আমরা জয়স্তম্ভ দেখিতে গেলাম। মালব ও গুর্জ্জরের মিলিত সৈন্য পরাস্ত করিয়া রাণা কুম্ভ পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাণা কুম্ভ মালবরাজ



মামুদকে বন্দী করিয়া চিতোরে লইয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু কোনরূপ নিক্রয়-মূল্যে লওয়া দূরে থাকুক, মামুদকে উপঢৌকন দিয়া কুম্ভ ছাড়িয়া দিলেন। জয়স্তম্ভটি একটী প্রশস্ত প্রস্তর-বেদীর উপর নির্ম্মিত। ইহা ১২২ ফিট উচ্চ ; অতএব মনুমেণ্ট বা কুতবের চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু ইহার গঠন-নৈপুণ্য অতি সুন্দর (৮)। ইহা চতুষ্কোণাকারে গঠিত এবং নয়টি তলাতে বিভক্ত। তলাগুলি বেশী উচ্চ নহে। স্তম্ভটিতে আরোহণ করিবার সময় ভিতরে কোথাও আলোক বা বাতাসের অভাব হয় না। বালকও অনায়াসে ইহাতে আরোহণ করিতে পারে। ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের অতিশয় মসৃণ প্রস্তরে স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতি তলে চারি পার্শ্বে চারিটি বড় মূর্ত্তি এবং বহুসংখ্যক ছোট ছোট মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি অতিশয় সুগঠিত। এখানে একটি বিশেষত্ব দেখিলাম —প্রত্যেক মূর্ত্তির নীচে দেবনাগরী অক্ষরে মূর্ত্তির পরিচয় দেওয়া আছে (৯)। অধিকাংশ মূর্ত্তি দেবদেবীর,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি। বৈতালিক, সূত্রধার প্রভৃতির কয়েকটি মূর্ত্তিও দেখিলাম। সর্ব্বোচ্চ তলায় শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলীর ছবি এবং রাণাদের বংশাবলি লিখিত আছে। অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। Tod এখানে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন।

(৮) Tod বলিয়াছেন; The only thing in India to compare with this is the Kutab Minar at Delhi ; but though much higher it is of a very inferior character.

(৯) Vincent Smith তাঁহার History of Fine Arts In India and Ceylon গ্রন্থে ইহাকে বলিয়াছেন, an illustrated dictionary of Hindu mythology.

Tod বলিয়াছেন, It is one mass of sculpture ; of which a better idea cannot be conveyed than in the remark of those who dwell about it that it contains every object known to their mythology.

স্তম্ভটির উপরে উঠিলে চারিদিকের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখায়। এই জয়-স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করিতে না কি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এখান হইতে আসিয়া আমরা মীরা বাঈয়ের মন্দির দেখিতে গেলাম। প্রাচীর-বেষ্টিত উচ্চ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দির মধ্যে তিনটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি ও দুইটি পুরুষ-মূর্ত্তি। একটি বালিক আমাদিগকে মন্দির দেখাইতেছিল। সে বলিল, বিগ্রহ তিনটি কৃষ্ণ, মীরা বাঈ এবং লক্ষ্মণের। ইহা যথার্থ বলিয়া বোধ হইল না। সে সময় পূজারী উপস্থিত ছিল না বলিয়া সঠিক জানা গেল না। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরটিও বেশ বড়। এই মন্দিরের পাশে আর একটি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। তাহা রাণা কুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চিতোর হইতে তিন ক্রোশ দূরে নাগরী নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে উপাদান আনিয়া এই মন্দির দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মীরা বাঈয়ের ভক্তিপূর্ণ জীবন-কাহিনী এবং তাঁহার ভজন-সঙ্গীতের সহিত অনেকেই পরিচিত আছেন। মীরা বাঈ মাড়বার-রাজের কন্যা এবং রাণা কুম্ভের রাণী ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমে ব্যাকুল হইয়া তিনি সকল সুখ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া পদব্রজে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মীরা বাঈ মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বেদী হইতে নামিয়া মীরা বাঈকে আলিঙ্গন করেন। সেই ক্ষণেই মীরা বাঈয়ের প্রাণ বাহির হইয়া যায়, এইরূপ গল্প আছে। তাঁহার সঙ্গীত পুস্তকের নাম রাগগোবিন্দ। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের ও তিনি একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

এই মন্দির দুইটির নিকটে দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ জলাধার (Reservoir) আছে। এগুলি ১২৫ ফিট দীর্ঘ, ৫০ ফিট প্রস্থ, ৫০ ফিট গভীর। কথিত আছে, রাণা কুম্ভের কন্যার বিবাহের সময় এগুলি নির্ম্মিত

হইয়াছিল। একটি ঘৃতে পূর্ণ করা হইয়াছিল, একটি তৈলে পূর্ণ করা হইয়াছিল। কুম্ভ রাণার কন্যা অসাধারণ রূপবতী ছিলেন ; তিনি এজন্য "লাল মেওয়ারী" ("Ruby of Mewar"—Tod) নামে পরিচিত ছিলেন। জৈসলমীরের ভট্টি-বংশীয় রাজা জেঠের সহিত ইঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু জেঠ চিতোরের নিকট আসিয়া, দুইবার অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিয়া, ইঁহাকে বিবাহ না করিয়া, অপর একটি কন্যাকে বিবাহ করেন। তখন রাণা কুম্ভ গগরাঁয়ের খিচিবংশীয় বিখ্যাত রাজপুত্র অচলদাসের সহিত খুব ধূমধাম করিয়া ইঁহার বিবাহ দেন।

ইহা ব্যতীত চিতোরে অন্নপূর্ণার মন্দির এবং আরও অনেক মন্দির আছে। অপরাহ্ণে আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। এই প্রান্তরে কতবার যুদ্ধ হইয়াছে, কত সহস্র রাজপুত প্রাণ দিয়াছে, রাজপুত রমণীর বক্ষের রক্তে এখানকার মৃত্তিকা সিক্ত হইয়াছে। কিন্তু আবার যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই সহস্র সহস্র বীরপুরুষ এবং বীররমণীর আবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেকবারের বীরত্বের কীর্ত্তি যেন পূর্ব্ববারের বীরত্বকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। কথাটি যদিও একটু অদ্ভুত শোনায় তথাপি প্রকৃতপক্ষে যে কয়বার চিতোর শত্রু কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছিল, সেই কয়বারের কাহিনীই চিতোরের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কাহিনী।

চারণ কবিরা বলেন, সাড়ে তিনবার চিতোর ধ্বংস হইয়াছিল। একবার আলাউদ্দিন ধ্বংস করেন, দ্বিতীয়বার গুর্জরের সুলতান বাহাদুর, তৃতীয়বার আকবর। আলাউদ্দিন যেবার ভীমসিংহকে বন্দী করেন এবং ৩,৫০০ শ্রেষ্ঠ রাজপুত ভীমসিংহকে রক্ষা করিতে প্রাণ দেয়, তাহাকে অর্দ্ধেক চিতোর-ধ্বংস বলা হয় ; কারণ সেবার শ্রেষ্ঠ রাজপুত বীরগণ মারা যায়। আলাউদ্দিন এবং আকবরের আক্রমণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বাহাদুর যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন রাণা ছিলেন বিক্রমজিৎ। তিনি তখন চিতোরে ছিলেন না। রাঠোরবংশীয় রাণী জও আহির বাই স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করেন এবং বর্ম্ম পরিয়া একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাজ-বলি না হইলে চিতোর রক্ষা হইবে না—চিতোরে এইরূপ একটি ধারণা ছিল। দেওলার রাজা বাগ্‌জি বলিলেন—রাণাবংশের রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত,—তাঁহাকে বলি দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাকে সিংহাসনে বসান হইল, মাথার উপর রাজছত্র ধরা হইল। আবার জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান হইল। প্রাচীর ভগ্ন হইয়াছিল, চিতা রচনা করিবারও সময় ছিল না, জলাধার এবং বারুদখানার মধ্যে বারুদের স্তূপ করিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইল। রাণী কর্ণবতী সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন। ১৩০০০ রাজপুত রমণী স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিল। তাহার পর দুর্গদ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট রাজপুত সৈন্য লইয়া বাগ্‌জি শত্রু সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। এইবার ৩২০০০ রাজপুত চিতোরের জন্য প্রাণ দিয়াছিল।

যে সমতল ভূমির উপর চিতোর পাহাড় অবস্থিত, তাহার উচ্চতা ১৩০০ ফিট। ইহার উপর পাহাড়ের উচ্চতা আরও ৪০০।৫০০ ফিট। চিতোরের প্রাচীন নাম চিত্রকূট। 'খুমান রাসা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র এখানে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যে চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্র বাস করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণতঃ অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। এলাহাবাদ হইতে ঝাঁসি যাইবার পথে চিত্রকূট নামে একটী ষ্টেশন আছে,—ইহাই প্রাচীন চিত্রকূট বলিয়া পরিচিত। গিলোটবংশের পূর্ব্বে চিতোরে প্রামারবংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিতেন। বাপ্পা প্রামারদের নিকট হইতে চিতোর কাড়িয়া লইয়া এখানে গিলোটবংশের

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রামার-রাজ বাপ্পাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে চিতোর কাড়িয়া লওয়া বাপ্পার অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইয়াছিল। সেই পাপে কি তাঁহার বংশধরগণকে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল?

অপরাহ্নে রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার চিতোরের পাহাড় এবং চারিদিকের বিশাল প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। একটা সুগভীর বিষাদের ভাব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। এত সহস্র সহস্র রাজপুত বীর এবং রাজপুত রমণী দেশের জন্য প্রাণ দিল, কিন্তু তথাপি দেশ রক্ষা করিতে পারিল না। তখন মনে হইল, তাহারা দেশ রক্ষা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু দেশের চেয়েও বড়—ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল, আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, জগতে তাহার তুলনা নাই। তাহারা আমাদের জন্য হিন্দুরাজ্য রাখিয়া যাইতে পারে নাই, কিন্তু যাহা রাখিয়া গিয়াছে তাহা চিরস্থায়ী।

অযোধ্যা

পূজার বন্ধে অযোধ্যা বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম। যেদিন ইহা স্থির করিলাম, সেইদিনই রওনা হওয়া চাই; সুতরাং কাপড় চোপড় তাড়াতাড়ি বাক্সবন্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় গাড়ী করিয়া হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পূজার ভিড়, হাওড়ার পুলের উপর দিয়া অসংখ্য গাড়ী চলিয়াছে, ষ্টেশনে লোকারণ্য, কষ্টে টিকিট কাটিয়া কোনও রকমে ট্রেণে একটু জায়গা করিয়া লইলাম। গাড়ীগুলি ভর্ত্তি হইয়া গেল, তবুও যাত্রীর বিরাম নাই। পিঠের উপর লাঠিতে বোচ্‌কা ঝুলাইয়া নাগ্‌রা জুতা পরিহিত হিন্দুস্থানীরা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দলে দলে আসিতে লাগিল। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া উদ্বিগ্ন-ভাবে গাড়ীতে গাড়ীতে উঁকি মারিয়া স্থান খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া সবুজ আলো দোলাইল, তারপর, গর্জ্জন করিতে করিতে গাড়ী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া ছুটিল।

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে প্রকৃতির দৃশ্য অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। রেল-লাইনের উভয় পার্শ্বে ঘনবিন্যস্ত তরুলতা, তাহাদের মধ্য দিয়া লোকা-লয়ের দুই একটী আলোক দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কোথাও বা দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। এই সব দেখিতে দেখিতে, রাত্রি অধিক হইলে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সারা রাত্রি ধরিয়া গাড়ী ছুটিল। মোকামা ষ্টেশনে সকাল হইল। আমরা নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলাম, পৃথিবীর বক্ষে একটি নির্ম্মল শারদীয় প্রভাত ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশ, নবীন সূর্য্যালোক এবং শ্যামল শস্যক্ষেত্র, এই সকলে মিলিয়া একটী সুন্দর দৃশ্য সৃজন

করিয়াছে। এবং কৃষকেরা এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের দৈনিক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

বাঁকীপুর, আরা, বক্সার প্রভৃতি ষ্টেশন পার হইয়া বেলা প্রায় দশটার সময় মোগলসরাইয়ে উপস্থিত হইলাম। এইখানে গাড়ী বদল করিতে হইবে। অযোধ্যার গাড়ী ছাড়িতে প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব ছিল। এই অবসরে স্নানাহার করিয়া লইবার জন্য আমরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটি ধর্ম্মশালা অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

বেশীদূর যাইতে হইল না। ধর্ম্মশালার একটী কুঠরীতে জিনিসপত্র রাখিয়া আমরা স্নান করিয়া লইলাম। তারপর ভোজনাগারে গিয়া সাদাসিধা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আহার তৃপ্তিসহকারে সমাধা করিলাম। যখন ষ্টেশনে ফিরিলাম তখন দেখিলাম গাড়ী প্রস্তুত, ছাড়িতে বেশী বিলম্ব নাই। ছুটাছুটি করিয়া সামনে যে গাড়ী পাইলাম তাহাতেই উঠিয়া পড়িলাম।

মাঠের মধ্য দিয়া গাড়ী অল্পদূর অগ্রসর হইলে কাশীর মনোমুগ্ধকর শোভা নয়নপথে আবিষ্কৃত হইল। ট্রেণ হইতে সেই শোভা প্রথম দেখিয়া কাহার হৃদয় না ভক্তি ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গা উত্তরদিকে বহিয়া চলিয়াছেন। সূর্য্যকিরণ মৃদু-পবনোত্থিত ক্ষুদ্রবীচিমালার উপর পড়িয়া ঝল্‌মল্ করিতেছে। আর পড়িয়াছে গঙ্গার উচ্চতীরস্থ শ্রেণী পরম্পরায় সজ্জিত ধবলসৌধমালা এবং অসংখ্য স্বর্ণমণ্ডিত দেবমন্দিরের চূড়ার উপর। সে শোভা বর্ণনা করিতে গিয়া রসনা স্তব্ধ হইয়া যায় এবং হৃদয় ভক্তিবিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

ধীরে ধীরে প্রাচীন ডাফ্‌রিণ ব্রিজ অতিক্রম করিয়া গাড়ী কাশীতে উপস্থিত হইল। কাশী নগরীর দুইটী ষ্টেশন। প্রথম ষ্টেশনটীর নাম কাশী—ঠিক গঙ্গার উপরেই। এই ষ্টেশনটী ছোট। দ্বিতীয় ষ্টেশনের

নাম বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ; এই ষ্টেশনটী খুব বড়। সহর হইতে দূরে হইলেও এইখানেই অধিকাংশ লোক নামিয়া থাকেন। এই দুইটী ষ্টেশনে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী যাত্রী নামিয়া গেলেন। তারপর গাড়ী অপেক্ষাকৃত লঘুভার হইয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইল।

প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলাম। তাহার যেন আর শেষ নাই। অড়হর ক্ষেত্রের পাশে ছোট ছোট গ্রামগুলি দেখা যাইতেছিল। গ্রামবাসিগণ বৃক্ষচ্ছায়ায় খাটিয়া পাতিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি কৌতুহলদৃষ্টিতে আমাদের গাড়ীগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। আমাদের প্রতিদিনকার কর্ম্মজগতের বাহিরে, দেশের কত লোক তাহাদের সুখ দুঃখের বিচিত্র সম্ভার লইয়া জীবনের পথে চলিয়াছে, তাহাদের বিষয় আমরা অতি অল্প সময়ই ভাবিয়া থাকি। ঐ যে সরল, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশীল এবং অল্পে সন্তুষ্ট লোকগুলি রহিয়াছে, উহারা আমাদের কত আপনার লোক, এ কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করা ভাল। আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, যদি আমরা উহাদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অধিক সুখী করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন ধন্য।

গাড়ী বৈকালে অযোধ্যা পৌছিবে। দুই চারি ষ্টেশন পূর্ব্ব হইতেই পাণ্ডাদের লোকেরা শীকারের সন্ধানে গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। "বাবু আপনাদের নাম কি ?" "আপনাদের বাস কোথায় ?" "আপনাদের কোনও লোক এখানে আসিয়াছিলেন ?" এই সকল প্রশ্নের বিশদ উত্তর প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইল। দুই চারি জনকে এই সকল পরিচয় প্রদান করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠে। তাহাদের ধৈর্য্য কিন্তু প্রশংসনীয়। তোমার কোনও আত্মীয় যদি কখনও এই স্থানে আসিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়

তাঁহার নাম বাহির করিয়া দিবে। এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে যে উহা বাহির করিবে, তুমি তাহারই ন্যায়-সঙ্গত শীকার হইলে। অপর পাণ্ডা-গুলি মাত্র লোলুপদৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাইতে পারে।

যথা সময়ে গাড়ী অযোধ্যা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিগ্বিলম্বী হইয়াছেন। অপরাহ্নের মৃদুবায়ু আমাদের রৌদ্রতপ্ত ক্লান্ত শরীর শীতল করিতেছিল। ক্ষুদ্র ষ্টেশনটীতে আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া ট্রেণ তাহার অসমাপ্ত যাত্রার পথে চলিয়া গেল। আমরা ষ্টেশন হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়ী করিয়া সহর অভিমুখে চলিলাম।

এই কি সেই অযোধ্যা? যাহার ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় অমরকবির পুণ্যলেখনী ক্লান্তি বোধ করে নাই, আজ এই ঘনবিন্যস্ত গৃহাদির সমষ্টি, এই ধূলি-মলিন নগরী, এই কি সেই অযোধ্যা? কোথায় গেল তাহার গগনস্পর্দ্ধী অট্টালিকা, কোথায় তাহার পরিখাবেষ্টিত প্রাচীর, কোথায় সেই তোরণালঙ্কৃত রাজপথ? কিছুই নাই, কালের করাল প্রবাহে সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। আছে শুধু সেই কবির বর্ণনা, আর আছে পুণ্যসলিলা ধীর-বাহিনী সরযূ। সরযূর জল দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। বিশাল সলিলরাশি লইয়া স্রোতস্বিনী ধীর-মন্থর-গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। পরপারের বনরাজি-শোভিত তীরভূমি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। আজ আর সরযূ "নৌভির্বিগাহ্যমানা" নহে, আজ আর তাহার তীরে চক্রবাকের শোভা নাই। একদিন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র ইহারই সলিলে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। সেদিন চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না। তাই বুঝি সরযু এত বিষাদময়ী!

পাণ্ডাজীর বাড়ীতে পৌছিতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেদিন আর কিছু দেখা হইল না। পাণ্ডাজীর অবস্থা বেশ ভাল, এককালে বোধহয় আরও ভাল ছিল। প্রশস্ত সোপানাবলী এবং সুন্দর

ঠাকুরঘর দেখিতে পাইলাম, ঠাকুরঘরে সীতারামের বিগ্রহ রহিয়াছে, তথায় নিয়মিত পূজা আরতি হয়। বাটীর এক অংশে তিনি বাস করেন। অপর অংশে যাত্রীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর নির্দিষ্ট হয়। আমরা পছন্দমত একটি ঘরে জিনিস পত্র নামাইয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া সরযূতে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলাম। নদীতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কচ্ছপ; তাহাদের জন্য বাতাসা, থৈয়ের লাড়ু প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ছুড়িয়া দিলে তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়া ফেলে। কিছুক্ষণ সরযূর সৈকতে বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম কতলোক তর্পণ করিতেছেন। নদীতীরে স্বর্গদ্বারী ঘাট, লক্ষ্মণ ঘাট প্রভৃতি অনেকগুলি সুন্দর ঘাট রহিয়াছে। নদী হইতে বাসায় ফিরিবার সময় কয়েকটী দেবালয় দর্শন করিয়া ফিরিলাম।

অপরাহ্ণে হনুমান্ গড় দর্শন করিতে গেলাম। এইটী এখানকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মন্দির। বানর-কুলজাত হইলেও সেই শ্রেষ্ঠ ভক্তই এই তীর্থে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইয়া থাকেন। মন্দিরটী উচ্চস্থানের উপর অবস্থিত। অনেকগুলি সোপান আরোহণ করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে উঠিতে হয়। প্রাঙ্গণটি পাথরে বাঁধান। তাহার মধ্যস্থলে মন্দির, তন্মধ্যে হনুমান্জীর মূর্ত্তি। তাহারই সংলগ্ন নাটমন্দিরে একটী পণ্ডিত বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম।

অযোধ্যাতে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের সহিত জড়িত কয়েকটী দেখিবার স্থান আছে। যেখানে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তথায় কোন মন্দির নাই। একটী ক্ষুদ্র আশ্রমের তলে তাঁহার শ্রীচরণচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। এই জন্মস্থানের গায়েই একটী মুসলমানদের মস্জিদ, কোনও মুসলমান

বাদসাহের অতিরিক্ত ধার্ম্মিকতার নিদর্শন। জন্মস্থান এবং মস্‌জিদ রেলিং দিয়া পৃথক করা হইয়াছে—বোধ হয় সম্প্রতি।

পুত্র কামনা করিয়া রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গঋষিকে আনাইয়া যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং যে যজ্ঞের দেবদত্ত চরু ভক্ষণ করিয়া মহিষীত্রয় অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছিলেন, সেই যজ্ঞশালা আজও পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহের পর কৌশল্যা তাঁহার শয়নমন্দিরে নবোঢ়া দম্পতির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; রত্নমন্দির নামে উদ্যানমধ্যস্থিত সুগঠিত ভবন সেই স্থানটী আজও নির্দ্দেশ করিতেছে। বনগমনের পূর্ব্বে এইস্থানে অতিবাহিত দিনগুলির সুখস্মৃতি মনে করিয়া উত্তররামচরিতে শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করিয়াছেন,

"জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ॥"

"যে সময় পিতা জীবিত ছিলেন, আমরা সবে মাত্র দারপরিগ্রহ করিয়াছি, আর মাতৃগণ আমাদের সকল ভাবনা ভাবিতেন, আমাদের সে সকল দিবস অতীত হইয়াছে।" যে স্থানে লক্ষ্মণ সত্যরক্ষার্থ সরযুতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অগ্রজসেবার্থ উৎসর্গীকৃত পুণ্যময় জীবনের মহান্ উপসংহার করিয়াছেন, সেই লক্ষ্মণঘাট আজও দেখিতে পাইবে।

এই স্থানগুলি যে সেই সুদূর অতীতের ঘটনাগুলির যথার্থ নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার অবশ্য কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। কিন্তু ইহারা সেই সকল ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়া হৃদয়ে যে ভক্তির উৎস খুলিয়া দেয়, তাহার মূল্য কি কম? যে চরিত্র-গুণগানে ভারতভূমির আপামর জনসাধারণ মুগ্ধ, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া সুখদুঃখময় বিচিত্র অনুভূতিতে সকলের হৃদয় উদ্বেল হইয়া আসিতেছে, সেই সকল ঘটনা এইখানেই কোনও না কোন স্থানে ঘটিয়াছিল। ভাব

দেখি, যেখানে তুমি এক্ষণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ ঐ স্থানটীতেই ঐ সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল! তাহা হইলে তুমি কতকটা অনুভব করিতে পারিবে, এই সকল তীর্থ দর্শন করিয়া দেশের দূরদূরান্তর হইতে আগত লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সরলবিশ্বাসপূর্ণ ও ভক্তিময় হৃদয়ে কি গভীর ভাবের উদয় হয়!

অযোধ্যায় বহুসংখ্যক দেবালয় দর্শন করিলাম। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বত্রই বিগ্রহত্রয়-প্রতিষ্ঠিত—মধ্যে রাম, বামে সীতা ও দক্ষিণে লক্ষ্মণ; ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা পড়িয়া গেল। সেদিন দেবীপক্ষের অষ্টমী তিথি। শুনিলাম সন্ধ্যার সময় রাজবাটীতে 'ঝাণ্ডা' হইবে। কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া রাজবাটী অভিমুখে চলিলাম। চন্দ্রালোকে সুধালিপ্ত-রাজভবনগুলি শোভা পাইতেছিল। দেখিলাম উৎসব দেখিবার জন্য বহুলোক সমবেত হইয়াছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ঠাকুরবাড়ীর দরজা খোলা হইল, আমরা ভিতরে গিয়া দেখিলাম, দেবী সিংহবাহিনী অসুর বধ করিয়া বিজয়গর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছেন, অসুরের ছিন্নমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত, তাহার বক্ষে দেবীর করধৃত বর্শার অগ্রভাগ বিদ্ধ এবং তাহার ছিন্ন গলদেশ হইতে অজস্র ধারায় শোণিতপাত হইয়া গৃহতল ভাসাইয়া দিয়াছে। এই শোণিত অবশ্য লাল জলের ফোয়ারা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমবেত লোক কিছুক্ষণ ধরিয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অদূরে একটী বালক দাঁড়াইয়া ছিল, শুনিলাম এই বালকই গদীর উত্তরাধিকারী। বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে এইরূপ অষ্টমীর পূজা দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে গোপ্রতার ঘাট দেখিতে যাত্রা করিলাম। গোপ্রতার ঘাট অযোধ্যা হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে। ফৈজাবাদ সহর পার হইয়া এই ঘাটে আসিতে হয়। সহরটী বেশ পরিষ্কার। সহরের পর সৈন্যদের ছাউনি। তাহা অতিক্রম করিয়া গোপ্রতার ঘাটে উপস্থিত হইলাম।

ঘাটের শোভা দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ হইল। সরযু এখানে অনেক খানি ঘুরিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। সেই বাঁকের উপর প্রস্তরগঠিত বিস্তৃত সোপানাবলি। মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ, নীচে স্বচ্ছসলিলা সরযুর বিশাল প্রবাহ। এইস্থলে জল অত্যন্ত গভীর। বহুদূর পর্য্যন্ত নদীর প্রবাহ দেখা যাইতেছিল। আমরা স্নানাদি সমাপন করিয়া ঘাটের ধারে বসিয়া নদীর শোভা দেখিতে লাগিলাম। মনে পড়িতে লাগিল সেই দৃশ্য—শ্রীরামচন্দ্র দেহ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত অযোধ্যা হইতে চলিয়া আসিতেছেন, অযোধ্যার যাবৎ অধিবাসিবৃন্দ গৃহ ছাড়িয়া তাঁহার অনুগামী হইয়াছে, ঐ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-কলেবর ধীরে ধীরে সরযুর সলিলমধ্যে নামিয়া যাইতেছেন, ঐ ভরত নামিলেন, ঐ শত্রুঘ্ন নামিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পুরবাসিগণ দেহ বিসর্জ্জন করিল—

"গোপ্রতরকল্লোহভূৎ সন্মর্দ্দস্তত্র মজ্জতাম্।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সকল কোলাহল নীরব হইয়া গেল, স্থান জনহীন হইয়া পড়িল, শুধু উদাস বায়ু নদীর বক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃজন করিয়া বহিতে লাগিল।

বেলা হইয়া গিয়াছিল। আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই পবিত্র স্থান ত্যাগ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

নবমীর দিন সন্ধ্যাবেলা অযোধ্যাতে রামলীলা হয়; আমরা সে দিন রামলীলা দেখিতে গেলাম। সরযুর ঠিক উপরেই রামলীলা হইতেছিল। দূর হইতে লোকের ভিড় টের পাইলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানা-প্রকার খাবারের দোকান অতিক্রম করিয়া আমরা রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলাম। দীর্ঘ একখণ্ড ভূমির এক প্রান্তে একটী উচ্চ মঞ্চের উপর তিনটী লোক রাজবেশ পরিয়া বসিয়া আছে। শুনিলাম তাহারা রাবণ, ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণ। অপর প্রান্তে ঐরূপ আর একটী মঞ্চ, তাহার উপর ৭।৮ বৎসরের দুইটী সজ্জিত বালক বসিয়াছে; ইহারা রাম ও লক্ষ্মণ।

এই মঞ্চের নিকট ভূমির উপর আসন পাতিয়া বহুসংখ্যক পণ্ডিত বসিয়া আছেন। রঙ্গভূমির উপর কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। তাহার চারিদিকে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী গৃহের ছাদে মেয়েদের বসিবার স্থান হইয়াছে। রামলক্ষ্মণের মঞ্চের নিকট একটী পণ্ডিত বাল্মীকির রামায়ণ হইতে বিশিষ্ট স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং তদনুরূপ অভিনয় হইতেছিল। একদল লোক রাক্ষস সাজিয়াছিল, আর একদল বানর সাজিয়াছিল। তাহাদের অস্ত্র, প্রত্যেকের করস্থিত এক একটী চর্ম্ম-গোলক। সঙ্কেত পাইয়া উভয় দলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইখানে তাহারা অভিনয় ছাড়িয়া সত্য সত্যই মারামারি করিতে লাগিল। চামড়ার গোলকগুলি আঘাত-প্রঘাতে ছিঁড়িয়া গেল। তখন রিক্ত-হস্তে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুই চারিজন বীর উভয় হস্তে শত্রুপাত করিতে করিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে রাক্ষসের দলেই বলবান্ লোকের সংখ্যা বেশী ছিল। বানরের দল আর পারিতেছিল না। তাহারা ক্রমশঃই হটিয়া যাইতেছিল। উপস্থিত যে কয়জন যোদ্ধা পাওয়া গেল, তাহা-দিগকে বানরদলের সাহায্যে নিয়োগ করিলেও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না। মাতব্বর লোকেরা প্রমাদ গণিলেন। আমাদের ছৈলবিহারী পাণ্ডা ছুটকট করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অনুনয়বিনয়ে রাক্ষসদের দলের যুযুৎসা কিছু কমাইতে পারা গেল। বানরের দল তখন মহা উৎসাহে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেল।

রামলক্ষ্মণের সহিত রাবণের যুদ্ধ দেখিলাম। রামলক্ষ্মণবেশধারী শিশুদ্বয় নির্ভয়ে ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাবণ একটা মস্ত জোয়ান লোক, রামলক্ষ্মণ বহুক্ষণ তাহার বিপক্ষে যুদ্ধের অভিনয় করিতে লাগিল। অবশেষে শক্তিশেল আঘাতে

লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইলেন। পণ্ডিতজী রামায়ণ হইতে বিলাপ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। হনুমান্ গন্ধমাদন লইয়া আসিল। লক্ষ্মণ আবার বাঁচিয়া উঠিলেন।

সেই রাত্রেই আমাদিগকে অযোধ্যা ত্যাগ করিতে হইবে, সুতরাং আমরা আর থাকিতে পারিলাম না, চলিয়া আসিলাম। যে সরযূ একদিন রামের প্রকৃতলীলা দেখিয়াছিল, সে আজ তাহার তীরে রামলীলার এই অভিনয় দেখিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে, আমরা ষ্টেশনে পৌছিলাম। তখনও ট্রেণ আসিতে বিলম্ব আছে। কিছুক্ষণ ষ্টেশনে পাদচারণ করিয়া ক্লান্তিবশতঃ সতরঞ্চি পাতিয়া উপবেশন করিলাম। বসিয়া বসিয়া শুইতে ইচ্ছা করিল,—একটু শুইলাম। যখন নিদ্রা প্রায় আসিয়াছে, বিশ্রামের জন্য শরীর অত্যন্তই কাতর, তখন গোলমাল হইল,—"গাড়ী আ গিয়া" "গাড়ী আ গিয়া"। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, লাইনস্ম্যান সবুজ আলো দোলাইতেছে, লোকজন ব্যস্ত হইয়া চলাফেরা করিতেছে, হুস্ হুস্ শব্দ করিতে করিতে ষ্টেশন কাঁপাইয়া গাড়ী আসিয়া পড়িল। আমরা তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুপ্তিমগ্ন নগরীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম।

আমাদের গাড়ীতে বেশী ভিড় ছিল না, আমরা অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রিত জনপদের মধ্য দিয়া নিদ্রামগ্ন আরোহী লইয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। যখন উদীয়মান সূর্য্যের পুরোগামী আলোকপ্রবাহে পূর্ব্বাকাশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সেই সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসারিত হইতেছিল। তরুলতা এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রনিচয় ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে মাঠের

মধ্যে দুই চারিটি করিয়া গ্রামবাসী দেখা যাইতে লাগিল। পূর্ব্বদিগন্তে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। পৃথিবীর বক্ষে স্বর্ণরশ্মি পড়িয়া হাস্ত করিতে লাগিল। প্রভাতেই গাড়ী কাশীতে পৌঁছিল। আমরা নামিয়া পড়িলাম।

কাশীতে আমরা কোথায় উঠিব, কিছুই ঠিক ছিল না। ঠিক ছিল, শুধু একটা পাণ্ডা। মোটা পেট এবং দীর্ঘ লাঠি লইয়া পাণ্ডাজী দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভাঙ্গা বাঙ্গলাভাষায় তিনি আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বলিলেন যে আমাদের জন্ত একটা বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে আমরা রওনা হইলাম। কিন্তু যে বাসায় তিনি আমাদিগকে লইয়া গেলেন, দেখিলাম, সেখানে বাস করা অসম্ভব—অন্ধকার, সাঁৎসেতে, বায়ুর চলাচল রহিত। অগত্যা অন্ত একটা বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। কলিকাতায় শুনিয়াছিলাম যে, মানমন্দিরে ভাড়া দিয়া থাকিতে পারা যায় কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম তাহা হইবে না। দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট দুই চারিটা বাসা দেখিলাম। একটা বাটী পছন্দ হইয়াছিল, কিন্তু সে বাটীর গৃহস্বামী অপর এক পাণ্ডা, আমাদের পাণ্ডার ন্তায় তাঁহারও হাতে দীর্ঘ লাঠি ছিল, উভয় পাণ্ডাতে মারামারি হয় আর কি! আমরা সে বাটীর আশা ত্যাগ করিলাম। এ দিকে বেলা বাড়িয়া যাইতেছিল; গাড়োয়ান চ্যাচামেচি করিতেছিল। তখন একটা পছন্দমত বাটী অত্যন্ত অপছন্দ মূল্যে স্থির করিয়া তাহাতেই আশ্রয় লইলাম।

সে দিন বিজয়া-দশমী। শুনিলাম, সন্ধ্যার সময় বহুসংখ্যক প্রতিমা নৌকা করিয়া গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করাইয়া অবশেষে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে। নৌকায় চড়িয়া ঐ দৃশ্ত দেখিতে নাকি বড়ই সুন্দর। অনেক কষ্টে একখানি নৌকা যোগাড় করা গেল। বৈকালে আমরা তাহাতে

উঠিলাম। দশাশ্ব-মেধের দীর্ঘসোপানশ্রেণীযুক্ত উচ্চ ঘাটগুলি লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। দুই একখানি করিয়া দুর্গা-প্রতিমা আসিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল ; কাশীর অসংখ্য দেবালয় হইতে আরতির শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। নগরী আলোকমালায় বিভূষিতা হইল। গঙ্গার চঞ্চল জলে পড়িয়া আলোকরশ্মি নৃত্য করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অনেকগুলি প্রতিমা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিমাগুলি সুন্দর ভাবে সজ্জিত। নহবৎ, কনসার্ট প্রভৃতির ধ্বনিতে নৈশবায়ু আন্দোলিত হইতেছিল। গঙ্গাবক্ষ অসংখ্য আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এক একখানি করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উৎসব দৃশ্য মলিন হইয়া আসিল। আমরা বাড়ী ফিরিলাম। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, আজ বঙ্গের প্রতি গ্রাম বিদায়ের করুণ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। মা যে আজ ঘর আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন—যে মা আসিবেন বলিয়া সন্তানগণ দীর্ঘ এক বৎসর উৎসুক-হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিল, যাঁহার অবস্থানের তিন দিন আনন্দ ও উৎসবের মধ্যে কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহার ঠিক ছিল না, সেই মায়ের আনন্দ-মূর্ত্তি জলে ভাসাইয়া দিয়া বাঙ্গালী আজ নিরানন্দহৃদয়ে ঘরে ফিরিতেছে।

কাশীতে আমরা ৪।৫ দিন ছিলাম, থাকিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। আমাদের বাটী দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটেই থাকায় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিবার সুবিধা ছিল। একদিন মণিকার্ণিকার ঘাটে স্নান করিলাম। আওরঙ্গজেবের মসজিদের সংলগ্ন উচ্চ ধ্বজার উপর আরোহণ করিয়া ঘন-সৌধ-গঠিত মন্দির-বহুল কাশীনগরের এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশের শোভা দর্শন করিলাম। কুইন্‌স্ কলেজের গঠন-সৌন্দর্য্য এবং তাহার চারিদিকে সুন্দর বাগান অতি তৃপ্তিদায়ক বোধ হইল। কেদারঘাট,

তিলভাণ্ডেশ্বর, কালভৈরব প্রভৃতি দর্শন করিলাম। দুর্গাবাড়ীর রক্ত-প্রস্তরগঠিত মন্দির এবং তাহার সুন্দর শিল্পকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কবীরের আখড়া, ভাস্করানন্দের মর্ম্মরনির্ম্মিত সমাধিগৃহ, তুলসীদাসের স্থান প্রভৃতি দেখিলাম। কাশীতে দেখিবার স্থান অসংখ্য। সকলের বর্ণনা করিলে বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। দুই একটীর কথা বলিব।

বিশ্বেশ্বরের আরতি কাশীতে দেখিবার জিনিষ। সন্ধ্যাবেলায় আমরা যখন মন্দির অভিমুখে যাইতেছিলাম, দেখিলাম, রাজপথ দিয়া জনস্রোত সেই দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে লোকারণ্য। কোন মতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রাশি রাশি প্রফুল্ল পুষ্প দ্বারা শিবলিঙ্গ সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। চারিদিকে সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে আরতি আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণগণের সম্মিলিত স্বরে মধুর ও গম্ভীর শিবস্তোত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলী ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

প্রভাতে নৌকা করিয়া কাশীনগরীর সম্মুখে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ একটী অতি রমণীয় ব্যাপার। সে সুন্দর দৃশ্য এখনও মানস চক্ষে ভাসিতেছে ধীরসমীরে গঙ্গাবারি তরঙ্গায়িত, নবীন সূর্য্যালোক অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিন্যস্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী সৌধমালার উপর পড়িয়াছে, অসংখ্য মন্দির হইতে উত্থিত নহবতের মধুর সঙ্গীত আকাশবায়ু পরিপূর্ণ করিয়াছে, ঐটী মণিকর্ণিকার ঘাট, ঐ পঞ্চগঙ্গাঘাট, ঐ সিন্ধিয়ার ঘাট, ঐ দশাশ্বমেধ ঘাট—ঐ একটী সতীস্তম্ভ,—ঘাটে ঘাটে বিভিন্নবর্ণের বেশপরিহিত বিভিন্নদেশীয় স্নানার্থী, কেহ বা স্নানান্তে সমাহিতচিত্তে পূজা করিতেছে—নৌকায় বসিয়া এই সকল দৃশ্য দেখিতে সুন্দর। ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ রাজা-মহারাজার বাটী গঙ্গাতীরে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মানসিংহের মানমন্দির, চৈৎসিংহের প্রাসাদ দেখিতে

পাইবেন। ঐ জানালা হইতে গঙ্গার উপর লাফ দিয়া চৈৎসিংহ পলায়ন করিয়াছিলেন। ঐ পরপারে রামনগরের আধুনিক প্রাসাদের শোভা।

কাশীতে আসিলে সকলের একবার সারনাথ যাওয়া উচিত। সারনাথ কাশী হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বরুণা নদীর প্রায়-স্রোতোহীন সলিল উত্তীর্ণ হইয়া সারনাথের বৃক্ষচ্ছায়াশীতল পথটী উভয় পার্শ্বের দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রসারিত। পথের ধারে মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ও দোকান; কচিৎ দুই একটী উদ্যানবাটিকা। পথের কিয়দংশ ছোট রেল-লাইনের পাশ দিয়া গিয়াছে। সারনাথের কাছে আসিয়া পথের বামপার্শ্বে এক প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়াইয়া গিয়া অল্পদূরেই সারনাথের ধ্বংসাবশেষ। এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড খনন করিয়া ছোট বড় নানা আকারের গৃহ, স্তূপের ভিত্তি, স্তম্ভের নিম্নাংশ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অশোকের একটী অখণ্ড শিলাস্তম্ভের কিয়দংশ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। উপরের অংশ অদূরে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। অশোকস্তম্ভের উপর পালিভাষায় খোদিত শিলালিপি। এই স্থান খনন করিয়া যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, তাহা প্রথমতঃ একটী ছোট খোলা-ঘরে রাখিয়া পরে সন্নিহিত মিউজিয়মে লইয়া যাওয়া হইতেছে। মিউজিয়মটী একটী দেখিবার জিনিস। অশোকস্তম্ভের সিংহশীর্ষটী (Lion capital) এখানে রহিয়াছে। ৭।৮ হাত উচ্চ একটী প্রকাণ্ড বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি এবং তাহার উপরিস্থ ছত্রের দণ্ড ও শিরোভাগ বিদ্যমান। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের, দেবদেবীর এবং স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতির অসংখ্য মূর্ত্তি বিদ্যমান। বহু উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন যত্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা ছাড়া অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ নানা আকারের মৃন্ময় ও প্রস্তরপাত্র রহিয়াছে।

মিউজিয়ম দেখিয়া বৌদ্ধস্তূপ দেখিতে গেলাম। যে সকল স্থান খনন

করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বভাগে এই প্রাচীন স্তূপটী বৃদ্ধের ন্যায় লতা-গুল্মাবলীরূপ পক্ককেশ সমাবৃত মস্তক উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সাধারণতঃ বুদ্ধদেবের শরীরের কোনও একটী ক্ষুদ্র অংশ স্থাপন করিয়া তাহার উপর এই সকল স্তূপ নির্ম্মিত হইত। স্তূপের গাঁথনি নিরেট। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনও পথ নাই। নীচের কতক অংশ সরকারের দ্বারা সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে। যে অংশগুলি মেরামত হয় নাই, তাহাতে প্রাচীন শিল্পের মনোহর নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

কত শত বৎসর ধরিয়া এই স্তূপটী এখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমক্ষে কত অতীত ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল। সে অদূরবর্ত্তী ঐ বৌদ্ধ-বিহারের সমৃদ্ধ অবস্থা বোধহয় দেখিয়াছিল, তারপর সেই বিহারের ধ্বংস হইল, পৃথিবীবক্ষ হইতে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল, এই সকল ঘটনাই স্তূপটী অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত দেখিয়া আসিয়াছে। কত দুর্দ্দিনের ঝড়-জল ইহার উপর আঘাত করিয়াছে। এখনও প্রভাতে ও সন্ধ্যায় স্নিগ্ধ সমীর ইহার সর্ব্বগাত্র স্পর্শ করে—তখন কি ইহার পুলকিত হৃদয়ে সুদূর অতীতের স্মৃতিগুলি জাগিয়া উঠে—যখন ইহার নবীন কলেবরের উপরিভাগ পুষ্প ও পতকা দ্বারা সজ্জিত হইত এবং ইহার চারিদিকে উৎসব হইত !

যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর এই সকল অতীতের নিদর্শন রহিয়াছে তাহার দুইদিক ঘেরিয়া একটী দীর্ঘ জলাশয়ের প্রণালী বর্ত্তমান। বহুপূর্ব্বে বোধ হয় এখানে কয়েকটী দীঘি ছিল, তাহা হইতে বিহারের ভিক্ষুগণের জল সংগ্রহ হইত। এক্ষণে এই জলাশয়ের গর্ভ প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে, সামান্য পঙ্কিল জল তথায় বর্ত্তমান। তাহাতে নামিয়া গ্রাম্য স্ত্রীলোক এবং বালকেরা এক প্রকার জলজ শাক-সংগ্রহে নিযুক্ত

রহিয়াছে দেখিলাম।

অদূরে একটী উচ্চস্থানের উপর সোমনাথ ও সারনাথ নামক শিবলিঙ্গ রহিয়াছেন। শিবলিঙ্গদ্বয় দর্শন করিয়া আমরা কাশী ফিরিলাম।

আমাদের ইচ্ছা হইল যে, কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল গিয়া সেখান হইতে কলিকাতা ফিরিব। টাইম-টেবলে দেখিলাম যে, কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত মোটর-কোচ চলে। মটর-কোচে যাওয়াই সুবিধা দেখিলাম। মোটর-কোচ কি জিনিস জানিতাম না। ভাবিলাম, অনেকটা মোটর-কারের মতই হইবে। সস্তায় মোটর-কারে চড়া হইবে, এই ভাবিয়া উৎসাহ বাড়িয়া গেল। যথা সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার বহুক্ষণ পরে মোটর-কোচ দর্শন দিলেন। ইহার কিছুমাত্র বিশেষত্ব ছিল না, ঠিক একখানি রেলগাড়ী। অনেক লোক হইল। গাড়ী গঙ্গার সেতু পার হইয়া একটী নূতন পথে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-লাইনে উপস্থিত হইল। তাহার পর পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। এক এক ষ্টেশনে গাড়ী থামে, কয়েকজন আরোহী নামিয়া যায়, আর তাহার দ্বিগুণসংখ্যক লোক গাড়ীতে আরোহণ করে। গাড়ীতে আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই। বসিয়া থাকা অতিশয় কষ্টকর বোধ হইতেছিল। ভাবিলাম, মোটরকার চড়ার সুখ হইতেছে বটে।

চুণার ষ্টেশন হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাহাড়ের উপর দুর্গটী দেখা যাইতেছিল। মির্জ্জাপুর একটা বড় ষ্টেশন, তাহার পরেই এবং অতি নিকটে বিন্ধ্যাচল। বিন্ধ্যাচলে যখন পৌছিলাম, তখন অপরাহ্ণ। বামপার্শ্বে দেখিলাম, পাহাড়ের উপর পাহাড় অনন্ত শ্রেণীপরম্পরায় অগ্রসর হইয়া দূরে পশ্চিমগগনপ্রান্তে মিলাইয়া গিয়াছে। আমরা মোটরকোচের নিকট বিদায় লইয়া ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম।

গাড়ীতেই একটী পাণ্ডার লোকের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল।

তাহার সহিত ষ্টেশন হইতে চলিলাম। সুদীর্ঘ ভুট্টাগাছের মধ্য দিয়া পথ। প্রথমে আমরা ধর্ম্মশালার খোঁজ লইলাম, শুনিলাম, কোথাকার রাণী সদলবলে তথায় অবস্থান করিতেছেন; অন্যের প্রবেশ নিষেধ। অগত্যা পাণ্ডাজীর আশ্রয় লইতে হইল। পাণ্ডাজীর একটী দোতলা বাড়ী ছিল, সেটী দেখিলাম বেশ সুবিধার, কিন্তু আমাদের একটী সহযাত্রী আমাদের দুর্ভাগ্য এবং তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব্বেই তাহা অধিকার করিয়াছিলেন। আর কোনও ঘর পছন্দ হইল না। অবশেষে পাণ্ডাজীর বসতবাটীরই বৈঠকখানাঘরে আশ্রয় লইলাম।

সেখান হইতে গঙ্গা অতি নিকটে। বৈকালে সে দিকে বেড়াইতে গেলাম। কি উচ্চ তীরভূমি! বহুসংখ্যক বড় বড় সিঁড়ির ধাপ—নামিয়া গিয়া জলের নিকট উপস্থিত হইলাম। বুঝিলাম এই স্থানের নাম বিন্ধ্যাচল কেন। ষ্টেশন হইতে যে পশ্চিমদিগন্তপ্রসারী পর্ব্বতমালা দেখিলাম তাহা বিন্ধ্যগিরির সহিত সংযুক্ত এবং সেই পর্ব্বতশ্রেণীর শেষ প্রান্ত এইখানে আসিয়া গঙ্গার সলিল স্পর্শ করিয়াছে।

বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মূর্ত্তি আছেন। সন্ধ্যার সময় একবার দর্শন করিয়া আসিলাম। শুনিলাম মায়ের প্রতিমা ভাল করিয়া সাজাইয়া আরতি করা হয়। তাই মধ্য-রাত্রে উঠিয়া পুনরায় দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরে যাইবার পথটী ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়াছে। বোধ হইল, মন্দিরটী পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থলে অবস্থিত। মন্দিরের তলভাগ চতুষ্কোণাকার ও প্রশস্ত। তাহার এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় স্থানে পাষাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অধিক রাত্রে যখন নূতন বস্ত্র এবং প্রচুর পুষ্পের দ্বারা প্রতিমা সজ্জিত হইয়াছিল, তখন দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল।

পরদিন সকালে যখন মন্দিরে পূজা দিতে গেলাম, তখন ভয়ানক ভিড়

হইয়াছিল। সে দিন বুঝি শুভদিন ছিল। প্রবেশ করিবার সময় বেশী ভিড় হইবে বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই। তাহার পর যখন অভ্যন্তরস্থ প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম, বাহির হইতে দলের পর দল লোক ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, অধিকাংশই পশ্চিমদেশীয় শ্রমজীবি। মন্দিরের প্রশস্ত গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। ভয়ানক ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। তথাপি বাহির হইতে লোক আসিতে লাগিল। শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেদিনকার কষ্ট বহুকাল মনে থাকিবে।

কলিকাতা যাইবার ট্রেন বৈকালে এখানে উপস্থিত হইবে। এখনও অনেক সময় আছে। এখান হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অষ্টভুজার মন্দির আছে, তাহা দেখিয়া আসিব স্থির করিলাম। একখানি গাড়ী ঠিক করিলাম,—কতকটা বালিকাবিদ্যালয়ের গাড়ীর মত, কেবল উপরের আবরণ নাই এবং আকার ক্ষুদ্র। রেল-রাস্তা পার হইয়া গাড়ী শৈল-শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যে পাহাড়ের উপর মন্দির অবস্থিত, তাহার তলদেশে আসিয়া আমরা গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগাত্রে প্রস্তরগঠিত সোপানশ্রেণী। নির্জ্জন স্থান। দক্ষিণে ও পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত পর্ব্বতমালা। উত্তরদিকে গঙ্গা পশ্চিম হইতে আসিয়া পূর্ব্বদিকে বহিয়া গিয়াছে—বহুদূর পর্য্যন্ত জলপ্রবাহ দেখা যাইতেছে। অবশেষে মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। অষ্টভুজার মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। নিকটে দুই চারি ঘর লোক বাস করে। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। শুনিলাম, পর্ব্বতশিখরে অনেকখানি পরিষ্কৃত ভূমি আছে এবং তাহাতে একটি কৃত্রিম হ্রদ আছে। কিন্তু আমাদের আর তাহা দেখা হইল না। আমরা বিন্ধ্যাচলে ফিরিলাম।

বিন্ধ্যাচলে একটী স্বাস্থ্যনিবাস আছে। দেখিলাম, সেখানে কয়েক-

জন ভদ্রলোক বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নিজেদের খাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। বাটীর কিয়দংশে ভদ্রলোকদের সপরিবারে থাকিবারও বন্দোবস্ত আছে।

বৈকালের গাড়ীতে আমরা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ীতে খুব ভিড়। পূজার ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, অনেক বাঙ্গালী দেশে ফিরিতেছেন। তাঁহারা মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা প্রভৃতির বর্ণনা করিতেছেন। আমরা স্বচক্ষে সেই সকল স্থান দেখিতে দেখিতে কলিকাতা ফিরিলাম।

মিথিলা—জনকপুর

গঙ্গা বহথি জনিক দক্ষিন দিশি পূর্ব্ব কৌশিকী ধারা।
পশ্চিম বহথি গণ্ডকী, উত্তর হিমবৎ বলবিস্তারা॥
কমলা ত্রিযুগা অমৃতা ধেমুড়া বাগবতী কৃত সারা।
মধ্য বহথি লক্ষ্মণা প্রভৃতি সে মিথিলা বিদ্যাগারা॥

চন্দাঝা

"গঙ্গা যাহার দক্ষিণে বহিতেছে, যাহার পূর্ব্বে কৌশিকী নদী; গণ্ডকী যাহার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত, উত্তরে হিমাচল বল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; যাহার মধ্যে লক্ষ্মণা প্রভৃতি নদী বহিতেছে, যাহার ভূমি কমলা ত্রিযুগা অমৃতা ধেমুড়া বাগবতী প্রভৃতির সলিলে সরস, সেই মিথিলা বিদ্যাগার।"

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী")।

বর্ত্তমান কালের চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দারভাঙ্গা জেলা লইয়া প্রাচীন মিথিলা গঠিত হইয়াছিল। মিথিলার অতীত গৌরবময়। এখানে জনক রাজত্ব করিয়াছিলেন,—সীতাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনকের রাজ-সভা বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল এখানে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধযুগেও মিথিলার খ্যাতি নষ্ট হয় নাই। মিথিলার অন্তর্গত বৈশালী নগরে প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ গণতন্ত্র-প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেন। বুদ্ধদেব ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে মিথিলার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—বৈশালী নগরে তিনি তিনবার পদার্পণ করিয়াছিলেন। জৈনধর্ম্ম-প্রচারক মহাবীর বৈশালীর সম্ভ্রান্ত লিচ্ছবিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিও বুদ্ধদেবের ন্যায় সাংসারিক সুখ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ

করিয়া ধর্ম্মসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। চম্পারণ জেলার অন্তর্গত লউড়িয়া নন্দনগড়, লউড়িয়া অররাজ প্রভৃতি স্থানের অশোক স্তম্ভ ও অশোক অনুশাসন এখনও মিথিলায় বৌদ্ধকীর্ত্তি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ্গ মিথিলা ভ্রমণ করিয়া ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে বাচস্পতি, উদয়ন, পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিতগণ মিথিলার যশোভাতি উজ্জ্বলতর করিয়াছিলেন। রাজা শিবসিংহের রাজত্বকালে তাঁহার সভাকবি বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীতে মিথিলা মুখরিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাজা শিবসিংহ এবং তাঁহার বিদুষী মহিষী লখিমা দেবী চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পদাবলীর মধ্যে আমরা রাজ-দম্পতির সুখময় চিত্র পাই ;—তাঁহাদের জীবনের শেষ ভাগ যে সুমহৎ দুঃখ ও বিপদের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল, পদাবলী পড়িবার সময় তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। কথিত আছে যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা শিবসিংহ দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ১৪০২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন হইতে সমর্থ হন। মাত্র তিন বৎসর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া শিবসিংহ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হন, এবং বন্দী ভাবে দিল্লীতে আনীত হন। তাঁহার মহিষী লখিমা দেবী বিশ্বস্ত অনুচর বিদ্যাপতি কবির সহিত নেপালের অন্তর্গত জনকপুরের নিকটবর্ত্তী বণৌলি গ্রামে আশ্রয়লাভ করেন। সেখানে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করিয়া, অবশেষে স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া, লখিমা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করেন (Bengal District Gazetteers, Darbhanga by L.S.S.O'Malley)। অপর প্রবাদ এই যে, রাজা শিবসিংহ যবন কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিরুদ্দেশ বা নিহত হন (শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিদ্যাপতি ঠাকুরের জীবন বৃত্তান্ত)।

মিথিলার অন্তর্গত নানা স্থান জনশ্রুতি প্রাচীন কীর্ত্তির সহিত বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। কথিত হয়, দারভাঙ্গা জেলার নিকটবর্ত্তী নেপালের অন্তর্গত জনকপুর নামক স্থানে রাজর্ষি জনকের রাজধানী ছিল। এখান হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ধনুষ্ক নামক স্থানে হরধনু ভঙ্গ হইয়াছিল; সেই ভগ্ন ধনুঃখণ্ডগুলি প্রস্তরীভূত হইয়া এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। যমুনা ও কমলা নদীর সঙ্গমের নিকট জৈমিনি ঋষি বাস করিতেন। কমলা ও করাই নদীর সঙ্গমের নিকট ককৃরোল গ্রামে কপিলমুনি বাস করিতেন। কমতোল ষ্টেশনের নিকট অহিয়ারি গ্রামে ন্যায়শাস্ত্র প্রণেতা গৌতম মুনির আশ্রম ছিল। এখানে তাঁহার অভিশাপে পত্নী অহল্যা দেবী পাষাণে পরিণত হন; পরে বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়া পাষাণে পদস্পর্শ করাতে অহল্যা দেবী উজ্জীবিত হন। * নিকটবর্ত্তী বিশৌল গ্রামে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল; এবং জগবনে একটী বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে যাজ্ঞবল্কের আশ্রম নির্দ্দেশ করা হয়। এই সকল স্থান দারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত। মজঃফরপুরের অন্তর্গত সীতামাটী নামক স্থানে সীতাদেবীর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

আমি একবার কার্য্যোপলক্ষে দারভাঙ্গা গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম যে, দুইদিন পরে শ্রীরামনবমী উপলক্ষে জনকপুরে খুব বড় মেলা হইবে। ইহা শুনিয়া আমি মেলার সময় জনকপুর দেখিবার সংকল্প করিলাম। জনকপুরে যাইবার দুইটি পথ আছে। দারভাঙ্গা

* অপর প্রবাদ অনুসারে বক্সারের নিকটবর্ত্তী চরিত্রবন নামক গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল; এবং এখান হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে অহোরিয়া গ্রামে অহল্যা দেবী পাষাণীভূতা হইয়াছিলেন। ঐ গ্রামে একটী ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে একটী প্রাচীন শিলামূর্ত্তি অহল্যামাঈ বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

হইতে জয়নগর পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়া, সেখান হইতে গরুর গাড়ীতে ১৫।১৬ মাইল যাইলে জনকপুর পাওয়া যায়। অপর পথে দারভাঙ্গা হইতে ভিন্ন রেলওয়ে লাইনে জনকপুর রোড নামক ষ্টেশনে গিয়া, সেখান হইতে গরুর গাড়ী করিয়া যাইতে হয়। আমি শুনিলাম, প্রথমোক্ত পথটি বেশী সুবিধা জনক—কিম্বা কম অসুবিধাজনক। এ জন্য আমি জয়নগর দিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। বৈকালে দারভাঙ্গা জেলার সদর লাহেরিয়াসরাই ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলাম। মেলা উপলক্ষে ট্রেণে অসম্ভব জনতা। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি যাত্রীতে বোঝাই হইয়াছে; তাহার উপর গাড়ীর বাহিরে পাদানীর উপর দাঁড়াইয়া অসংখ্য যাত্রী। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিও ভর্ত্তি। সেই ভীড়ের মধ্যে কে বা কাহার টিকিট দেখে। অল্পক্ষণ পরে গাড়ী দারভাঙ্গা ষ্টেশনে পৌঁছিল। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া জয়নগরের জন্য অন্য গাড়ীতে উঠিতে হইবে। ষ্টেশনে লোকারণ্য দেখিয়া মনে ভীতির সঞ্চার হইল—কি করিয়া গাড়ীতে স্থান পাওয়া যাইবে! ভীড়ের মধ্যে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশু—সবই রহিয়াছে। সকলেই জয়নগর যাইবে। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। সেবা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ ভীড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া আমি ট্রেণের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ আসিলে একটী কামরায় উঠিয়া পড়িলাম এবং বেশী ভীড় হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্কের উপর উঠিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলাম। গাড়ী ছাড়িবার পর মধ্যে-মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িতেছিলাম,—মধ্যে-মধ্যে যাত্রীগণের কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। জয়নগর ষ্টেশনে যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের জনতার মধ্যে কোনরূপে অগ্রসর হইয়া বিশ্রামঘরে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলাম।

প্রত্যূষে একটি গরুর গাড়ীতে উঠিয়া জনকপুর অভিমুখে রওনা হইলাম।

সমস্ত পথ যতদূর দেখা যায়, শ্রেণী বাঁধিয়া যাত্রীর দল চলিয়াছে। অধিকাংশ লোক হাঁটিয়া চলিয়াছে। মধ্যে-মধ্যে দুই একটা গরুর গাড়ীও দেখা যাইতেছে। পথের দুই পাশে চাষের জমি। মাঝে-মাঝে আম-বাগান। এই সকল বাগানকে এদেশে "গাছি" বলে। বাগানের সংখ্যা এখানে খুব বেশী। আমগাছ লাগান লোকে পুণ্য-কার্য্য বলিয়া মনে করে। বলা বাহুল্য আমও খুব চমৎকার হয়।

জয়নগর হইতে জনকপুর সমস্ত পথ হইতে হিমালয় পর্ব্বত দেখা যায়। পর্ব্বত এখান হইতে অনেক দূর,—আকাশের গায়ে চিত্রিতের ন্যায় দেখা যায়। জয়নগর হইতে ৫।৬ মাইল আসিয়া আমরা দেওধা নামক গ্রাম অতিক্রম করিলাম। গ্রামটী বড়—পুলিশের থানা, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। এই গ্রাম ছাড়াইয়া একটু পরেই আমরা নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। ইংরেজ রাজ্য ও নেপাল রাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশ করিবার জন্য কিছু দূরে দূরে ৬।৭ হাত উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হয়। এখন মেলার সময় বলিয়া তাহার দরকার ছিল না। বেলা ১০॥০টার সময় আমরা দুহবি নামক গ্রামে পৌঁছিলাম। এই সকল গ্রামের অধিবাসিগণ বেহারী বা মৈথিলি; গুরখা ও পাহাড়িয়ারা পাহাড়ের উপরে বাস করে। দুহবি গ্রামে আমি স্নানাহার সমাপন করিলাম। দোকান হইতে লুচি, দহি, মেঠাই, কলা প্রভৃতি কিনিয়া খাইলাম। আবার গাড়ী চলিল। ক্রমে রৌদ্র তেজ প্রখর হইল। আমি গাড়ীতে শুইয়া রহিলাম। সমস্ত পথ যাত্রীর ভীড়। স্ত্রীলোকগণ ক্রোড়ে শিশু এবং মস্তকে, মোট লইয়া রৌদ্র-ক্লান্ত দেহে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছে। রাস্তা বড় খারাপ—গাড়ী কখনও কাত হইতেছে, কখনও উঁচু হইতেছে, কখনও

খালের মধ্যে নামিতেছে, কখনও এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া চলিয়াছে। বৈকালে জনকপুর হইতে ২৷৩ মাইল দূরে আমরা একটী প্রাচীন শিবমন্দির দেখিলাম—নাম কপিলেশ্বর। মেলার জন্য এখানেও পথের ধারে দোকান বসিয়াছিল। এখান হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা জনকপুর পৌঁছিলাম।

গ্রামের চারি ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত মাঠের উপর লোকজন বিশ্রাম করিতেছিল। এখানে তাহারা পাক করিয়া ভোজন করিবে, এবং রাত্রে এখানেই ঘুমাইবে। লোকসংখ্যা বোধ হয় পঞ্চাশ সহস্রের অধিক হইবে। আমরা প্রথমে বাসার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন বাসাই পাওয়া গেল না। অগত্যা গাছের তলাতেই রান্না করিতে বসিলাম। সেইখানেই আহার করিয়া, একটী দোকানদারের বাসার সংলগ্ন বারন্দাতেই রাত্রি কাটাইলাম। রাত্রে মেঘ করিয়া ঝড় উঠিল। বৃষ্টি হইলে কোথায় আশ্রয় পাইবে—এই ভাবিয়া সেই বিশাল জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি হইল না। যখন প্রবল ঝড়ে মেঘ উড়াইয়া লইয়া গেল, তখন সেই জনসমুদ্র হইতে সহস্র-সহস্র মিলিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু প্রবল ধ্বনি উঠিতে লাগিল,—"জানকী মাইজি মহারাণী কি জয়।"

সকালে উঠিয়া মন্দির দেখিতে গেলাম। পথের দুই পাশে অসংখ্য বিপণী—খাবার, কাপড়, বাসন, খেলনা, বড়ি, কত কি জিনিষ সাজান রহিয়াছে। বিপণী-শ্রেণীর মধ্য দিয়া আমরা গঙ্গাসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। প্রবাদ এই যে, এই পুষ্করিণীর নিকটেই জনকের রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। যাত্রীগণ এই পুকুরে স্নান করিতেছে; এবং পুকুরের তীরে রামচন্দ্রজির মন্দির দর্শন করিয়া, নিকটবর্ত্তী জানকীজির মন্দিরে যাইতেছে। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের

সম্মুখে অনেক দূর পর্য্যন্ত অসম্ভব ভীড়। ঠেলাঠেলিতে লোক আগাইতে পারিতেছে না। স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধেরা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। পূজারী, সন্ন্যাসী এবং সেবাসমিতির স্বেচ্ছাসেবকের দল যাত্রীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ভীড় কমাইবার চেষ্টা করিতেছে। জনতা হইতে "জানকী মাইজি কি জয়" "রামচন্দ্রজি কি জয়" এবং মধ্যে-মধ্যে "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনি শোনা যাইতেছে। এই ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করা আমি নিরাপদ মনে করিলাম না। সেখান হইতে জানকীজির মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম, এখানেও ভীড় প্রায় সেইরূপ। অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিলাম: দুপুরে ভীড় কমিলে দর্শন করিব।

রন্ধনের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় পশ্চিম দিকে পাহাড়ের নীচে মেঘ দেখা গেল। মেঘ শীঘ্র-গতিতে আকাশ ছাইয়া ফেলিল; এবং অল্পক্ষণ পরে ঝড় ও জল আরম্ভ হইল। লোকজন আশ্রয়ের জন্য ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। আমি বিছানা লইয়া নিকটবর্ত্তী একটী ছোট মন্দিরে আশ্রয় লইলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই অত্যন্ত শীত করিতে লাগিল। বৃষ্টি থামিলে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পথ অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। দোকানগুলি জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। দোকানীরা জিনিসপত্র সরাইয়া জল ও কাদা পরিষ্কার করিতেছে। এই সময় মন্দিরে ভীড় কিছু কম হইতে পারে, এই আশায় আমি নিকটবর্ত্তী জানকীজির মন্দিরে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে এখন বেশ দর্শন হইল।

এই মন্দিরটি ৭।৮ বৎসর হইল টিকমগড়ের রাজা তাঁহার পুত্রসন্তান লাভের মানসিকরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শুনিলাম মন্দির-নির্ম্মাণে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ—তাহার চারিপাশ উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা। এই দেওয়ালের উপর অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির-আকারের বেষ্টনী নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহাদের ধাতুমণ্ডিত চূড়াগুলি

সূর্য্যালোকে সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত মূল মন্দিরের চূড়া এবং ইতস্ততঃ অন্যান্য মন্দিরের চূড়াও শোভা পাইতেছিল। এখানকার মন্দির খুব বেশী উচ্চ নহে। দেখিতে কতকটা প্রাসাদ বা palaceএর মত। প্রাঙ্গণের চারিদিকে বারান্দা—মধ্যে-মধ্যে কক্ষ এগুলি দুই-তালা। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মন্দির। মন্দিরটি দুইভাগে বিভক্ত। মূল-মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত—সম্মুখে নাটমন্দির। উভয় মন্দিরের তলদেশ মর্ম্মরাবৃত। মূল-মন্দিরের প্রাচীর এবং স্তম্ভগুলিও মর্ম্মর-নির্ম্মিত—মর্ম্মরের উপর সুন্দর কারুকার্য্য। একটা সোপানযুক্ত বেদীর উপর রামচন্দ্রজি ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি;—একপার্শ্বে প্রাচীন মূর্ত্তিদ্বয়, অপর পার্শ্বে টিকমগড়ের রাজার প্রতিষ্ঠিত নূতন মূর্ত্তি। প্রাচীন মূর্ত্তিদ্বয় কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়। নূতন মূর্ত্তিদ্বয় শ্বেতমর্ম্মর-গঠিত এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের। এই মূর্ত্তিগুলির মুখশ্রী অতি কমনীয়,—দৃষ্টি করুণা ও প্রীতিতে পরিপূর্ণ। নাটমন্দিরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দুইসারি স্তম্ভ,—প্রত্যেক সারিতে পাশাপাশি দুইটি করিয়া স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির উপর বারান্দা—উপরের বারান্দাও স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। নাটমন্দিরের স্তম্ভগুলি রক্ত-প্রস্তরনির্ম্মিত; স্তম্ভের মধ্যবর্ত্তী খিলানগুলি সাদা পাথরের,—তাহার উপর উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য। যাত্রিগণ এই নাটমন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইতেছে এবং রামচন্দ্র ও সীতা-দেবীকে দর্শন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। দেবমূর্ত্তির সম্মুখে স্তূপীকৃত পুষ্প, পত্র এবং তণ্ডুলরাশি জমা হইয়াছে। যাত্রীগণের ভক্তি ও ব্যাকুলতা পরিস্ফুট।

এখান হইতে আমি রামচন্দ্রজীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। পিচ্ছিল পথের উপর যথাসম্ভব সাবধানে চলিয়াও আমি মহামতি নিউটন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি

নাই। উচ্চ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ দর্শকগণ ইহাকে ভূমিতে পতন মনে করিয়া হাস্য করিয়াছিল,—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, রামচন্দ্রজির মন্দিরে উপস্থিত হওয়া গেল। এ মন্দিরটি পুরাতন। এখন ভিড় কিছু কম হইয়াছিল। মন্দির-মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু মূল মন্দিরে প্রবেশ করা দেখিলাম অসম্ভব। বাহির হইতে দেখিলাম, মূল মন্দিরটি ক্ষুদ্র। ইহা পার্ব্বত্য প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটি একটী দ্বিতল কক্ষ;—উপরের কক্ষটি নীচের কক্ষ অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট। নীচের কক্ষ ও উপরের কক্ষ উভয়ের উপরে চারিদিকে কাঠের ঢালু ছাদ। এই মন্দিরের সম্মুখে হনুমানজির একটী ছোট মন্দির এবং কয়েকটী শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ দেখিলাম। লোকে ইহাকে অক্ষয় বট বলে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে দ্বিতল বারান্দা ও কক্ষশ্রেণী। এক পার্শ্বে একটি দ্বার দিয়া আর একটী এই প্রকার কক্ষ-বেষ্টিত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। এখানে কয়েকটি ধাতু ও প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিলাম। এই প্রাঙ্গণ হইতে আর একটী পথ দিয়া বাহির হইয়া যাত্রিগণ চলিয়া যাইতেছে।

এই দুইটি বড় মন্দির ব্যতীত জানকীজির মন্দিরের পাশে একটী ছোট মন্দির আছে; তাহাকে লছমণজির মন্দির বলে। জনপ্রবাদ নিকটবর্ত্তী নানাস্থান, শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর পরিণয়-কালীন নানা ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কোন স্থান দেখাইয়া বলে, এখানে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। কোন স্থানে সানুচর দশরথ আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। কোন স্থানে জনকের "ফুলবাড়ী" ছিল—যেখানে বিবাহের পূর্ব্বে, মহাদেবের পূজা করিতে গিয়া সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন;—তুলসীদাসের রামায়ণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। আবার কোন

স্থান দেখাইয়া বলে, এখানে সীতাদেবীর বিবাহের সময় ভেলোয়া সরোবর হইয়াছিল।

সারাদিন থাকিয়া থাকিয়া নহবৎ বাজিতেছিল। বহুদূরের গ্রাম গ্রামান্তর হইতে সমাগত যাত্রীর দল কোলাহল করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমার মনে হইতে লাগিল, বহুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে আর এক দিন এইরূপ জনতা হইয়াছিল, যেদিন সীতাদেবীর বিবাহ উপলক্ষে নগরী উৎসব-বেশে সজ্জিতা হইয়াছিল,—গৃহগুলি পুষ্প ও পতাকা দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছিল,—রাজপথের উপর স্থানে স্থানে তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল,—কোথাও বাদ্যকরের দল সুমধুর সঙ্গীত আলাপ করিতেছিল সেদিনও এইরূপ দূর-দূরান্তর হইতে প্রজাগণ স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া রাজকন্যা চতুষ্টয়ের পরিণয় দর্শন করিবার জন্য জনকরাজপুরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। মঙ্গল-আয়োজন-নিরতা রমণীগণের মধ্যে না জানি সে দিন রাজ-অন্তঃপুরে কোথায় সীতাদেবী বসিয়া ছিলেন। বিবাহ-গৃহের উজ্জল ও সুন্দর দৃশ্যগুলি এবং সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি নিশ্চয় তাঁহার কোমল হৃদয় অভিভূত করিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে—দণ্ডকারণ্যের নিবিড়বনে, লঙ্কার অশোক-কাননে, বাল্মীকির তপোবনে এই উৎসব-রজনীর কথা সীতা-দেবীর স্মৃতিপটে কতবার ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে। সেদিন এই জনকপুরে যে শুভ মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, সংসারের সকল দুঃখ ও বিরহ অতিক্রম করিয়া, কালের কুটিল গতি উপেক্ষা করিয়া, চিরকালের জন্য সেই মিলন অমর হইয়া গিয়াছে। আজিও ভারতবর্ষে সহস্র-সহস্র মন্দিরে সেই মিলনের যুগলমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে; লক্ষ লক্ষ ভক্ত-হৃদয়ে সেই শুভ-মিলনের মহামন্ত্র "সীতা-রাম" শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। অগ্রহায়ণের পঞ্চমী তিথিতে সেই পুণ্যদিন স্মরণ করিয়া আজিও জনকপুরে প্রতি বৎসর মেলা বসিয়া থাকে।

রথ অনুচর-পরিবৃত হইয়া মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন—তাঁহার স্মরণার্থ এখনও শোভাযাত্রা হয়। পশ্চিমাঞ্চলের ভাষায় ইহাকে "বরিয়াত" বলে।

কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। ঐ উত্তরে হিমালয় স্থির নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া কত বিভিন্ন বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন দর্শন করিয়াছেন। এতদিনেও সেই সুদূর অতীতের পুণ্যময় ঘটনাগুলি লোকে ভুলিয়া যায় নাই। যেদিন শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেদিন সীতাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, সেই সকল দিনে চন্দ্রদেব নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, প্রতিবৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্রমা আবার যখন সেই স্থানে ফিরিয়া আসেন, তখন সহস্র-সহস্র যাত্রী শত দুঃখ-কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, দূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া, এই পুণ্যস্থানে সমবেত হয়; এবং সীতারামের পুণ্য-স্মৃতিতে তাহাদের চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়া ভক্তি ব্যাকুল কণ্ঠে "জানকী মাইজি কি জয়" ও "রামচন্দ্রজি কি জয়"—শব্দে আকাশ মুখরিত করে।

বেতিয়া ও সীতামাঢ়ী

বিহারের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, হিমালয়ের পাদদেশে, চম্পারণ জেলা অবস্থিত। চম্পারণের প্রাচীন নাম চম্পক-অরণ্য। গণ্ডকনদ হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। গণ্ডকের অপর নাম শালগ্রামী বা নারায়ণী। নদীগর্ভে বহুসংখ্যক শালগ্রাম-শিলা পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম শালগ্রামী। পুরাকালে চম্পক অরণ্য নিবিড় বনসমাচ্ছন্ন ছিল। এখানে বহুসংখ্যক ঋষি-মুনি নিভৃত-বাস করিতেন। বেদের আরণ্যক অংশ এখানে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ আছে।

চম্পারণ জেলার সদরের নাম মোতিহারি। সুদীর্ঘ জলাশয়ের তীরে ক্ষুদ্র নগরটি অবস্থিত। নগরের গৃহ, উদ্যান, এবং মন্দিরগুলি জলমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল করে ;—এজন্য ইহার মোতিহারি নাম সার্থক হইয়াছে। মোতিহারি জেলার সদর বটে, কিন্তু মোতিহারি অপেক্ষা বেতিয়া নগর অনেক বড়, এবং বেতিয়ার স্বনামখ্যাত রাজবংশের রাজধানী বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। বেতিয়া চম্পারণ জেলার একটি মহকুমা। বেতিয়ার জমিদারীর বাৎসরিক আয় ২৫।২৬ লক্ষ টাকা। সম্পত্তির অধিকাংশ ইংরেজ কুঠিয়ালদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেতিয়া-রাজগণ ভূমিহার ব্রাহ্মণবংশীয়। বেতিয়ার শেষ মহারাজ স্যার হরেন্দ্রকিশোর সিংহের মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পর হইতে জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। মহারাণী প্রকৃতিস্থ নহেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে লাট সাহেবের সভাতে এই বন্দোবস্ত সন্তোষজনক নহে বলিয়া, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার

জন্ত একটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু লাট সাহেবের অনুমোদন না হওয়াতে, মন্তব্য অনুসারে কার্য্য হয় নাই। মহারাণী নিঃসন্তান। তিনি বেতিয়াতে থাকেন না,— সচরাচর প্রয়াগে থাকেন।

বেতিয়াতে রাজার একটী স্কুল আছে। রাজার হাঁসপাতালটী খুব বড়, এবং বহু উন্নতপ্রণালীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সমন্বিত। পাটনা ব্যতীত এ প্রদেশে এত বড় হাঁসপাতাল আর নাই। বেতিয়াতে বৈদ্যুতিক কারখানা আছে। সেখান হইতে রাজবাড়ী, হাঁসপাতাল, এবং কয়েকটি রাজপথ ও ইংরেজ কর্ম্মচারীর গৃহে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া থাকে। বেতিয়া নগরে বহুসংখ্যক দেবালয় আছে। কতকগুলি মন্দিরের গঠন নৈপুণ্য অতি মনোহর। বলা বাহুল্য, মন্দিরগুলি বেতিয়া রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের পার্শ্ব দিয়া চন্দ্রাবতী নদী প্রবাহিতা। এককালে এই নদীতে যথেষ্ট জল থাকিত, এবং সর্ব্বদা নৌকা চলিত। এক্ষণে অযত্নে নদী অতিশয় সঙ্কীর্ণা; প্রবাহ শৈবাল-সমাচ্ছন্ন;—শীর্ণকায়া, ছিন্নবসন পরিহিতা দরিদ্রা রমণীর ন্যায় নগরের একপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। বেতিয়া হইতে তিন মাইল দূরে গণ্ডকনদের একটী পরিত্যক্ত প্রবাহ আছে। ইহাকে উদয়পুরের হ্রদ বলে,—প্রচলিত ভাষায় হ্রদের নাম 'মন'। জলাশয়টি ৩।৪ মাইল দীর্ঘ, অতিশয় গভীর, এবং সুমিষ্ট, স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ। হ্রদে মধ্যে-মধ্যে কুম্ভীর দেখা যায়। হ্রদের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ আছে। শীতকালে ইংরেজগণ এই হ্রদের তীরে শিকার খেলিতে যান। হ্রদের তীরে জঙ্গলের মধ্যে হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। নীলগাই নামক এক জাতীয় হরিণ এখানে থাকে। শীতাগমে যখন হিমালয়ের উপর অতিরিক্ত বরফ পড়ে, তখন মানস সরোবরের হংসগুলি দলে-দলে পাহাড় ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে উড়িতে থাকে। উদয়পুরের হ্রদ তখন এই সকল মানস-বিহারী হংস-সমাচ্ছন্ন

হইয়া যায়। হংসগুলির গলদেশ লোহিত বর্ণের; এজন্য তাহাদের নাম লালসর। শীতকালে হ্রদের জল লালসরগুলিতে লাল হইয়া যায়।

বেত্তিয়া হইতে ১৪ মাইল দূরে লউড়িয়া নামক গ্রাম আছে। এই গ্রামের নিকটে একটী অশোক-স্তম্ভ বর্ত্তমান। স্তম্ভটিকে স্থানীয় লোকে ভীমসেনের লাঠি বলিয়া থাকে। লাঠি বা লগুড় শব্দের অপভ্রংশ হইতে গ্রামের নাম লউড়িয়া হইয়াছে। স্তম্ভটি অনুমান ২৫ হাত উচ্চ। ব্যাস ২ হাত। স্তম্ভ-দেহ একটিমাত্র প্রস্তর-নির্ম্মিত (monolyth)। ইহার উপর পদ্মাকারে উৎকীর্ণ একখণ্ড প্রস্তর নিম্নমুখে অবস্থিত। ইহার পর একটী বৃত্তাকার বেদী,—এ-বেদীর উপর একটি সিংহ-মূর্ত্তি। বেদীর চারিপাশে খাদ্য সংগ্রহ-নিরত হংসমূর্ত্তিসকল উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সিংহের মুখের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নীচে স্তম্ভের গায়ে একটী গোলার চিহ্ন। গোলার আঘাতে উপরবর্ত্তী সিংহমূর্ত্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া বসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্তম্ভটির অপর কোন ক্ষতি হয় নাই। জনপ্রবাদ এই যে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে স্তম্ভের উপর গোলা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। স্তম্ভের উপর ফার্সি ভাষায় ঔরঙ্গজেবের নাম এবং সন ১০৭১ (১৬৬০ খৃঃ) খোদিত আছে। অন্যান্য অশোক-স্তম্ভের ন্যায় এই স্তম্ভের উপর উৎকৃষ্ট পালিশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুদীর্ঘ ২০০০ বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি, বায়ু এবং ধূলিতে সে সুন্দর পালিশের কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই। স্তম্ভের উপর অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। অনুশাসনের পালি অক্ষরগুলি অতিশয় সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্তম্ভের চারিদিকে আজকাল রেলিং দিয়া ঘেরা হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

অশোক স্তম্ভ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটি বৃহৎ ভগ্নস্তূপ আছে। তাহা নন্দনগড় নামে পরিচিত। স্তূপটি প্রায় ৬০ হাত উচ্চ।

স্তূপের উপর নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্য দিয়া স্তূপের শিরোদেশে উঠিবার সঙ্কীর্ণ পথ। বন্য গুল্মগুলি পথের উপর তাহাদের কণ্টকময় বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। স্তূপটি ভগ্ন ইষ্টকখণ্ডে পরিপূর্ণ। কিছুদূর আরোহণ করিয়া অল্প একটু সমতল পৃষ্ঠ। তাহার পর পুনরায় অল্প পথ আরোহণ করিয়া স্তূপ-শীর্ষে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থানটি একটি বিপুলকায় প্রাসাদের শিরোভাগ বলিয়া বোধ হইল। এখান হইতে চারিদিকের বৃক্ষাবৃত বনভূমি এবং শস্যক্ষেত্রগুলি অতিশয় রমণীয় দেখাইতেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইহা একটী বৌদ্ধস্তূপ ছিল। কেহ কেহ বলেন বুদ্ধদেবের দেহাবশিষ্ট ভস্মরাশির উপর যে প্রসিদ্ধ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাই সেই স্তূপ। বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহ অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল। অগ্নিদাহের পর যে অস্থিগুলি অবশিষ্ট ছিল, তাহা আট ভাগ করা হয়। পিপ্পলিবানার মৌর্য্যগণ এক ভাগ চাহিয়া আনিতে দূত পাঠাইয়াছিল। কিন্তু দূত যখন কুশিনারাতে উপস্থিত হইল, তখন অস্থিসকল বিতরিত হইয়া গিয়াছে। দূত বিষণ্ণ-হৃদয়ে চিতাভস্মগুলি মাত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই ভস্মগুলির উপর সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। য়ুয়ান চোয়াং তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে এই স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্তূপটিই নন্দনগড়ের ভগ্নস্তূপ কি না, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এখানকার লোকপ্রবাদ এই যে, এখানে জনক রাজার ভগিনীপতি বাস করিতেন। জনকমহিষীর ননদের বাসস্থান বলিয়া ইহার নাম ননদগড় বা নন্দনগড় হইয়াছে।

লউড়িয়া গ্রামের নিকট নন্দনগড় ব্যতীত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্রতর স্তূপ আছে। সেগুলি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। এই ছোট স্তূপগুলি সংখ্যায় ১৫টি। স্তূপগুলি তিনটি সারিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক

সারিতে পাঁচটি করিয়া স্তূপ আছে। একটি সারি পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা। এই সারিটির পূর্ব্ব প্রান্তের নিকটে অশোক স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সারিটির পশ্চিমে উত্তর-দীর্ঘ লম্বা অপর দুইটি সারি। স্তূপগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত; কিন্তু সে মৃত্তিকা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির মৃত্তিকা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির। স্তূপের মৃত্তিকা হরিদ্রাবর্ণের এবং দৃঢ়,—নিকটের ভূমির মৃত্তিকা শ্বেতবর্ণ এবং ধূলিবহুল। স্তূপের মৃত্তিকার মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উপলখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে মনে হয় যে, এই মৃত্তিকা গণ্ডকনদের গর্ত্ত হইতে আহৃত হইয়াছিল। গণ্ডকনদ এক্ষণে এখান হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে হয় ত কাছে ছিল। স্তূপগুলির কোনটি ছোট, কোনটি কিছু বড়। ইহাদের উচ্চতা ২০ হইতে ৫০ ফিটের মধ্যে। ইহাদের নিম্নভাগ গোলাকার। উপরের দিকে ইহারা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ স্তূপগুলি কিসের—এ বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, এগুলি বৌদ্ধ চৈত্য। কিন্তু অপর প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ মনে করেন যে, এগুলি মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ বৌদ্ধ-যুগের বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে একটী রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার তারিখ খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। অপর একটি স্তূপের মধ্যে খনন করিয়া একটি লৌহনির্ম্মিত শবাধারের মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে ডাক্তার ব্লক আরও কয়েকটি স্তূপ খনন করিয়াছিলেন। দুইটি স্তূপের মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল এবং ক্ষুদ্র স্বুবর্ণ পত্রের (gold leaf) উপর স্ত্রী-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে *। ডাক্তার ব্লক অনুমান করেন যে, সূত্র-গ্রন্থে মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ যে শ্মশানচিতা নির্ম্মাণ করিবার উল্লেখ আছে, এই স্তূপগুলি তাহারই নিদর্শন। প্রভেদের মধ্যে—শ্মশানচিতাগুলি

* আমার স্মরণ হয় যে, এই ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

মনুষ্য দেহের স্থায় উচ্চ হইবার কথা, কিন্তু এগুলি তদপেক্ষা অনেক খর্ব্ব।

সুদূর অতীতের এই সকল নিদর্শন দেখিয়া শীতের অপরাহ্নে আমরা বেতিয়া অভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। ক্ষেত্রে কোথাও অরহর বা ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে,—কোথাও হরিদ্রা ও তিলের চাষ হইয়াছে,—কোথাও বা সোণালি রংয়ের সরিষাপুষ্প মন্দ বায়ুতে আন্দোলিত হইতেছে। এক সময় ইহা সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। তখন বিদেহগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। তাহার পর বৌদ্ধ নরপতিগণ এখানে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজ ক্ষেত্রের মধ্যে ঐ যে সব কৃষক কাজ করিতেছে,—অপর্য্যাপ্ত মলিন বসন, রুক্ষকেশ, শীর্ণকায়—উহারা সেই অতীত সমৃদ্ধির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে।

বেতিয়া হইতে সীতামাঢ়ী যাইতে হইলে, নরকটিয়াগঞ্জে গাড়ী বদলাইতে হয়। সীতামাঢ়ী মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। ইহা লক্ষ্মণদেই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। প্রবাদ এই যে, এখানে সীতাদেবী ক্ষেত্রের মধ্যে রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃতা হইয়াছিলেন। জানকী কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড সেই স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। এই কুণ্ডটি জনক না কি স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুণ্ডের চারিদিক বাঁধান। কিন্তু কুণ্ডের জল অতিশয় অপরিষ্কার। কুণ্ডের নিকটে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত,—মাত্র মুখ ও বক্ষ পর্য্যন্ত আছে। মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। প্রবাদ এই যে, জনক কর্ত্তৃক এই বিগ্রহগুলি স্থাপিত হইয়াছিল, ও মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে স্থানটি বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাধু অযোধ্যা হইতে এখানে

আসেন; এবং ঐশী প্রেরণায় স্থানটি অবিষ্কার করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া জঙ্গলে বাস করিতে থাকেন। মন্দিরটি অনুচ্চ। ইহার দ্বারদেশ ও সিংহাসন রৌপ্যমণ্ডিত। প্রাঙ্গণে মহাদেব, গণেশ ও হনুমানের তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে; এবং বীরবলদাস প্রভৃতি সাধুর সমাধি আছে। নিকটে আরো কয়েকটি আধুনিক মন্দির আছে। বাজারে কতকগুলি বড় বাড়ী ও দোকান দেখিলাম। স্থানটি বর্দ্ধিষ্ণু।

সীতামাঢ়ী হইতে মজঃফরপুর ৩৬ মাইল পথ। মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আমরা মজঃফরপুর রওয়ানা হইলাম। উভয় পার্শ্বে দিগন্তবিস্তৃত উর্ব্বর ভূমি। ক্ষেত্রে অড়হর, সরিষা, ইক্ষু, ধান্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। স্থানে-স্থানে নীলকুঠি (ইদানীং সেগুলি ইংরেজ জমিদারী কুঠি হইয়াছে), চিনির কল প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। চারিদিকে ক্ষেত্রের শস্য-সম্পদ এবং ক্ষেত্রবেষ্টিত কুটীরগুলির এবং কুটীরবাসীদের অত্যন্ত পরিস্ফুট একান্ত নিঃস্বতা বড়ই আশ্চর্য্য। মলিন বসন পরিয়া কৃষক-রমণীগণ ক্ষেত্রের মধ্যে কাজ করিতেছিল; মোটরের শব্দ পাইয়া তাহাদের ক্লান্ত, বিষণ্ণ চক্ষু দুইটি আমাদের দিকে তুলিয়া ধরিল। তৈলসম্পর্কহীন রুক্ষ কেশ চোখের উপর আসিয়া পড়িল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই অতিশয় উর্ব্বর ভূমিতে পরিশ্রম করিয়া ইহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না,—ক্ষুধায় কাতর শিশু সন্তানের রোদন নিবারণ করিতে মুখে খাদ্য তুলিয়া দিতে পারে না,—শীতের সময় একখণ্ড বস্ত্র গায়ে তাহাদের দিতে পারে না। কে সেই সমস্যার মীমাংসা করিবে?

রামায়ণোল্লিখিত কয়েকটি স্থান

শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সহিত অযোধ্যা হইতে কোন্ পথে গিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইবে।

অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধ যোজন গিয়া সরযূ-তীরে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে 'বলা' ও 'অতিবলা' নামক বিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

অধ্যর্দ্ধযোজনং গত্বা সরয্বা দক্ষিণে তটে। ১।২২।১১

প্রথম রাত্রি এইখানে সরযূ-তীরে অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় দিন তাঁহারা গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন।

তৌ প্রযাতৌ মহাবীর্য্যৌ দিব্যাং ত্রিপথগাং নদীং।
দদৃশাতে ততস্তত্র সরয্বাঃ সঙ্গমে শুভে॥ ১।২৩।৫

আজকাল ছাপরার নিকটে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম। রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে, এই সঙ্গমের নিকটে পূর্ব্বে মহাদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যা করিবার সময় মদন মহাদেবের প্রতি পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মহাদেব হুঙ্কার করিয়া মদনের দিকে রোষ-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন।* তাহাতেই মদনের দেহ জ্বলিয়া উঠে,—মদন পলাইয়া যান, এবং যেখানে দেহত্যাগ করেন, তাহাই বর্ত্তমান অঙ্গদেশ (ভাগলপুর)।

স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ। ১।২৩।১৪

যে সময়ে শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমের নিকট পদার্পণ করিয়া-

---

* কিন্তু কালিদাস কুমারসম্ভবে বর্ণনা করিয়াছেন যে এই ঘটনা হিমালয়ের উপর ঘটিয়াছিল।

ছিলেন, সে সময় এখানে কতিপয় শৈব মুনি তপস্যা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র সেখানে তাঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া, মুনিদের আশ্রমে রাত্রি-যাপন করিলেন।

অযোধ্যা হইতে গঙ্গা ও সরযূর বর্ত্তমান সঙ্গম প্রায় ৮০ ক্রোশ। প্রথম দিন ৬ ক্রোশ অতিক্রম করিলে, দ্বিতীয় দিন ৭৪ ক্রোশ অতিক্রম করিতে হয়। পদব্রজে এত সুদীর্ঘ পথ একদিনে অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব অনুমান করিতে হইবে,—হয় (১) বর্ত্তমান অযোধ্যা ও প্রাচীন অযোধ্যা ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল, নতুবা (২) গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম প্রাচীনকালে আরও বহু উত্তরে অবস্থিত ছিল, কিম্বা (৩) ত্রেতাযুগে মনুষ্যেরা অনেক বেশী দীর্ঘাকায় ছিল, এবং তখন বেশী পথ হাঁটা সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় অনুমানই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

পরদিন প্রাতে তাঁহারা নৌকা আরোহণ করিয়া নদী পার হইলেন। নৌকাতে বসিয়া গভীর জলকল্লোল শুনিয়া রামচন্দ্র তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তত্র শুশ্রাব বৈ শব্দং তোয় সংরম্ভবর্দ্ধিতং। ১|২৪|৫

* * * *

অথ রামঃ সরিন্মধ্য পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবং॥ ৬
বারিণো ভিদ্য মানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ।

বিশ্বামিত্র বলিলেন, সরযূর জল গঙ্গার জলের উপর আসিয়া পড়াতে, এই তুমুল ধ্বনি হইতেছে। মুনি আরও বলিলেন, সরযূ মানস-সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "সর" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া নাম হইয়াছে "সরযূ"। ইংরাজি মানচিত্রে দেখিলাম, সরযূর উৎপত্তি মানস-

সরোবরের খুব নিকটে দেখান হইয়াছে। একেবারে মানস-সরোবরের সহিত সংযুক্ত করা হয় নাই।

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া রাম মুনির সহিত অগ্রসর হইলেন।

তীরং দক্ষিণমাসাদ্য জগ্মতুর্লঘুবিক্রমৌ ;

স বনং ঘোর সঙ্কাশং দৃষ্ট্বা নরবরাত্মজঃ॥ ১।২৪।১২

সেই নিবিড় অরণ্য দেখিয়া রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কিম্বিদং দারুণং বনং"—"ইহা কোন বন?" মুনি কহিলেন, পূর্ব্বে এখানে "স্ফীত জনপদ" ছিল—

এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্ব্বমাস্তাং নরোত্তম॥ ১।২৪।১৭

মলদাশ্চ করূষাশ্চ দেব নির্ম্মান নির্ম্মিতৌ। ১।২৪।১৮

"ধীমান" সুন্দের ভার্য্যা তাড়কা রাক্ষসী এখানকার প্রজাদিগকে নষ্ট করিয়া, এইরূপ ভীষণ অরণ্যে পরিণত করিয়াছে।

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণমুখে গিয়াছিলেন। কারণ, আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, ফিরিবার সময় তিনি উত্তরমুখে ফিরিয়াছিলেন। এই অরণ্যের মধ্যে তাড়কা বধ হইল। বর্ত্তমান আরা ও পাটনার দক্ষিণে এই বন ছিল। কালের প্রভাবে এখানে আবার পূর্ব্বের ন্যায় "স্ফীত জনপদ" হইয়াছে। রামচন্দ্র সে রাত্রি বনেই কাটাইয়াছিলেন।

ইহাদ্য রজনীং রাম বসাম শুভদর্শন। ১।২৬।৩৩

শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামস্তমাশ্রমপদং মম।

পরদিন প্রভাতে অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া, দূর হইতে পর্ব্বত দেখিয়া, রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ রমণীয় স্থান কি?

"কিমেতন্মেঘসঙ্কাশং পর্ব্বতস্যাবিদূরতঃ"। ১।২৮।১৭

ইহাই বিশ্বামিত্রের আশ্রম,—নাম সিদ্ধাশ্রম। পূর্ব্বে বিষ্ণু বামন

অবতারে এই আশ্রমে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধাশ্রম কোন স্থান?

জনপ্রবাদ এই যে, সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান বক্সার সহরের নিকটেই বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানটি দেখিয়াছিলাম। স্থনাটি রমনীয় সন্দেহ নাই। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উচ্চ তটভূমির উপর এই স্থানটি অবস্থিত। ইহাকে আজকাল চরিত্রবান বলে। স্থানটি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ-সমাচ্ছন্ন—ভূমি কোথাও উচ্চ কোথাও নিম্ন। ভগ্নস্তূপের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টক বহুপরিমাণে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে এখানে যে অনেক মন্দির ও লোকালয় ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত রামরেখা ঘাটে শ্রীরামচন্দ্র স্নান করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। ঘাটের অপর পারে বলিয়া জেলার অন্তর্গত উজিয়ারপুর ভোরালি গ্রাম। বিশ্বামিত্রের সহিত আসিবার সময় রামচন্দ্র এই গ্রামে না কি রাত্রি-যাপন করিয়াছিলেন—এইখানে প্রভাতের আলো দেখিয়াছিলেন বলিয়া 'উজিয়ার,' এবং ভোর হইয়াছিল 'ভোরালি' নাম হইয়াছে।

এই সকল জন-প্রবাদ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বাল্মীকির বর্ণনা পড়িয়া প্রতীতি হয় যে, বিশ্বামিত্রের আশ্রম গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল না। আশ্রমে যাইবার সময় গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পথে এক রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল,—ফিরিবার সময়ও পথে এক রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল। এজন্য মনে হয়, সিদ্ধাশ্রম গঙ্গার দক্ষিণে আন্দাজ ২০ ক্রোশ দূর হইবে। সিদ্ধাশ্রম পর্ব্বতের নিকটে অবস্থিত ছিল, "পর্ব্বতস্যাবিদূরতঃ"। ইহার অবস্থান পর্ব্বতের উপরেও হইতে পারে; কারণ, "মেঘসঙ্কাশং" বলিয়া ইহার বর্ণনা আছে। গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণে আসিলে, বরাবর পাহাড়ও তাহার পূর্ব্বে কিছু দূরে

রাজগির পাহাড় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বোধ হয় অপর কোন পাহাড় পাওয়া যায় না। এজন্য সিদ্ধাশ্রম এই দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি পাহাড়ের সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। সিদ্ধাশ্রম হইতে ফিরিবার সময় উল্লেখ আছে যে, আশ্রম হইতে উত্তর মুখে আসিয়া রামচন্দ্র মুনিগণের সহিত শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এজন্য অনুমান হয় যে, সিদ্ধাশ্রম বরাবর পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত ছিল। কারণ বরাবর পাহাড় হইতে উত্তরে গেলে শোণ পাওয়া যায়,—রাজগির হইতে উত্তরাভিমুখে গেলে শোণ পাওয়া যায় না।

বাল্মীকি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাম ও লক্ষ্মণ সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা জনকের যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মুনিগণের সহিত উত্তর মুখে বহুদূর গমন করিয়া, সন্ধ্যাবেলা শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য প্রস্থাতুমুপচক্রমে। ১।৩১।১৬

* * * *

তে গত্বা দূর মধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে।

বাসঞ্চক্রুঃ মুনিগণাঃ শোণাকূলে সমাহিতাঃ॥ ১।৩১।১৯,২০

শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন দেশ?

বিশ্বামিত্র, এইরূপ ইতিবৃত্ত বলিলেন, "ব্রহ্মার পুত্র কুশ, কুশের পুত্র বসু; বসু গিরিব্রজ নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন; এই সেই নগর। ইহার অপর নাম বসুমতী। ঐ পাঁচটি পাহাড়—তাহাদের মধ্যে মাগধী (শোণ?) মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই বর্ণনার সামঞ্জস্য করা কঠিন। কারণ, শোণের তীর হইতে রাজগৃহ (রাজগির) বহুদূরে, শোণ হইতে রাজগির দেখা যায় না।

চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্ ॥
সৈষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ ।
সুমাগধী নদী রম্যা মাগধান্ বিশ্রুতো যযৌ ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে ॥
সৈষা হি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১।৩২।৭-১০

পরদিন প্রভাতে রাম লক্ষ্মণ মুনিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্নে তাঁহারা জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

তে গত্বা দূরমধ্বানং গতেঽর্দ্ধ দিবসে তদা।
জাহ্নবী সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাং ॥ ১।৩৫।৯

নৌকাযোগে তাঁহারা জাহ্নবী উত্তীর্ণ হইয়া পরপারে উপস্থিত হইলেন এবং পরম রমণীয় বিশালা নগরী দর্শন করিলেন।

গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীং। ১।৪৫।৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন, সমুদ্র-মন্থনের পর অমৃতের জন্য দেব ও অসুরে যুদ্ধ হয়। তাহাতে অসুরগণ নিহত হয়। অসুরগণের মাতা দিতি ইন্দ্রঘাতী পুত্র-কামনায় এই স্থানে বসিয়া তপস্যা করেন। এই স্থানে ইন্দ্র দিতির গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভকে ৪৯ খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই গর্ভ হইতে ৪৯ মরুতের জন্ম হয়। পরে ইক্ষাকু-বংশীয় বিশাল নামক নরপতি এস্থানে বিশালা নামক নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে সময় রাম-লক্ষ্মণ এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় বিশালের বংশধর সুমতি এখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি পুরী হইতে নির্গত হইয়া বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সুমতিস্তু মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রমুপাগতং।
শ্রুত্বা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাগচ্ছন্মহাযশাঃ ॥ ১।৪৭।২০

মজঃফরপুর জেলায় বশাঢ় নামক স্থান আছে উহা গণ্ডক বা নরায়ণী নদীর তীরে অবস্থিত,—গঙ্গার বর্ত্তমান প্রবাহ হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে। বশাঢ়ে লিচ্ছবিদের রাজধানী প্রাচীন বৈশালি নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে। এখানে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। লোকে তাহাকে রাজবৈশাল-কা-গড় বলে। ইহাই রামায়ণোক্ত বিশালা নগরীর স্থান কি না- আহা বিবেচনার বিষয়। যদি হয় তাহা হইলে রামায়ণের যুগে গঙ্গা বর্ত্তমান প্রবাহের ১০ ক্রোশ উত্তরে প্রবাহিত হইতেন, সিদ্ধান্ত করিতে হয়। *

বিশালার নিকটে রজনী অতিবাহিত করিয়া পরদিন যাত্রা করিয়া তাঁহারা জনক রাজধানী মিথিলা নগর দেখিতে পাইলেন।

উষ্যতত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্মিথিলাং ততঃ।
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়েঃ সর্ব্বে জনকস্য পুরীং শুভাং।
সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্॥ ১।৪৮।৯-১০

বশাঢ় হইতে জনকপুরের ব্যবধান প্রায় ৩০ ক্রোশ। একদিনে পদব্রজে ৩০ ক্রোশ অতিক্রম করা অসম্ভব। মিথিলা কি বর্ত্তমান জনকপুরের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল?

রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে, গৌতমের আশ্রম—যেখানে অহল্যার উদ্ধার হইয়াছিল—তাহা মিথিলার উপবনে অবস্থিত ছিল।

মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ।
পুরাণং নির্জ্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবং॥ ১।৪৮।১১

প্রচলিত গল্প এই যে অহল্যা পাষাণ হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রামায়ণের বর্ণনা পড়িয়া দেখা যায় যে অহল্যা পাষাণীভূতা হন নাই,—

---

*গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম যে বর্ত্তমান স্থান হইতে অনেক উত্তরে ছিলেন এইরূপ অনুমান করিবার কারণ আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

অস্পষ্ট-দৃশ্যা হইয়া নিরাহারে তপস্যা করিতেছিলেন।

ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব।

রামচন্দ্রের আগমনেই অহল্যা শাপমুক্তা হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণ অহল্যার পাদ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর গৌতম আসিয়া অহল্যার সহিত মিলিত হইলেন।

গৌতমের আশ্রম কোথায় ছিল? আজকাল গৌতমের আশ্রম বলিয়া তিনটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

(১) বক্সারের নিকটবর্ত্তী আহেরিয়া গ্রাম।

(২) ছাপরার নিকটে রেভেলগঞ্জ নামক স্থান।

(৩) দারভাঙ্গা হইতে ১৫ মাইল উত্তর—পশ্চিমে কমতৌল ষ্টেশনের নিকট আহিয়ারি গ্রাম।

শেষোক্ত স্থান রামায়ণ-বর্ণিত গৌতম আশ্রমের সমধিক নিকটবর্ত্তী।

রামায়ণে জনকের যজ্ঞভূমির সুন্দর বর্ণনা আছে।

সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধিহি জনকস্য মহাত্মনঃ।
বহূনীহ সহস্রাণি নানাদেশনিবাসিনাং॥
ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাং।
ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশত সঙ্কুলাঃ।

শ্রীরামচন্দ্র যে হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই ধনুর দ্বারা মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন। তদনন্তর মহাদেব তাঁহার ধনুতে জ্যারোপ করিয়া দেবগণকে বলিলেন, তোমরা যজ্ঞে আমার হবি নির্দ্দেশ কর নাই, তোমাদের শিরশ্ছেদ করিব। দেবগণ ভীত হইয়া স্তব করেন। তখন মহাদেব প্রীত হইয়া দেবগণকে ধনু প্রদান করেন। এই ধনু দেবগণ জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাজের নিকট ন্যাসরূপে প্রদান করেন।

দক্ষযজ্ঞ কোথায় হইয়াছিল? এক প্রবাদ অনুসারে হরিদ্বারের

নিকটে। অপর প্রবাদ অনুসারে, ছাপরার নিকটে। ছাপরার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থান দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রবাদ আছে। যেখানে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার নাম অম্বিকাভবন। যে স্থানে দক্ষ-পত্নীর স্তবে মহাদেব শান্ত হইয়াছিলেন তাহার বর্ত্তমান নাম শান্তা। শিব বর দিয়াছিলেন যে, উত্তরদিকে শির করিয়া শয়ান আছে, এরূপ প্রাণীর মাথা আনিয়া দক্ষের দেহের সহিত যোগ করিয়া দিলে, তিনি পুনর্জ্জীবিত হইবেন। এই ঘটনা হইতে "দিগ্‌বর" বা বর্ত্তমান "দিগওয়ারা" নামক স্থানের উৎপত্তি। বিষ্ণু চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন; এজন্য শিব ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর অনুসরণ করিয়াছিলেন। তখন বিষ্ণু তাঁহার চক্র ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই স্থানের নাম বনমালীচক্র বা বনোয়ারিচক। অম্বিকাভবন, শান্তা, দিগ্‌ওয়ারা, বনোয়ারিচক—এই সকল নামের স্থান ছাপরার নিকটে বর্ত্তমান। সর্ব্বশেষে মহাদেব ও বিষ্ণুর যে স্থানে মিলন হয়, তাহাই বর্ত্তমান শোণপুর। এখানে হরিহরনাথের মন্দির আছে। এখানে প্রসিদ্ধ হরিহর ছত্রের মেলা হইয়া থাকে। রামায়ণের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, দক্ষযজ্ঞ ছাপরার নিকটেই হইয়াছিল। এ বিষয়ে কোন্ পুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি না, জানি না।

মিথিলা হইতে যে সকল দূত অযোধ্যায় গিয়াছিল, তাহারা পথে তিন রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল।

জনকেন সমাদিষ্টা দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতা মার্গে তেঽযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীং॥ ১।৬৮।১

অযোধ্যা হইতে জনকপুর প্রায় ১২০ ক্রোশ। তিনদিনে ১২০ ক্রোশ অতিক্রম করিলে প্রত্যহ ৪০ ক্রোশ অতিক্রম করা হয়। ইহা দুরূহ বটে, কিন্তু অসম্ভব নহে। দশরথ ৪ দিনে অযোধ্যা হইতে মিথিলা

গিয়াছিলেন। রথারোহণে প্রত্যহ ৩০ ক্রোশ যাওয়াও কঠিন।

পরিশেষে একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উপরিক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীতি হইবে যে, বিহার দেবগণের লীলাভূমি ছিল—সত্যযুগের বহু ঘটনার স্থল বিহারে। বামন অবতার, মদনভস্ম, সমুদ্রমন্থন, দক্ষযজ্ঞ—এই সকল ঘটনা ত্রেতাযুগের বহুপূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। পাঞ্জাব বা যুক্তপ্রদেশে এত অধিক সংখ্যক প্রাচীন ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। এই কারণে বোধ হয় যে আর্য্যগণ ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়া প্রথমে পাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং পরে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হন—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

রেমুণা

যস্মৈদাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎ প্রেম্না মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

"যাঁহাকে অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরপাত্র অপহরণ করিয়া গোপীনাথ "ক্ষীরচোরা" নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপাল (গোবর্দ্ধনে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আমি সেই মাধবেন্দ্র-পুরীকে নমস্কার করি।"

"পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

বালেশ্বর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে রেমুণা নামক গ্রাম। এই গ্রামে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরেও ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিগ্রহ আছে; মূল বিগ্রহ রেমুণাতে। রেমুণা এবং ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যদেব গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরীর গুরুর নাম মাধবেন্দ্রপুরী অতএব মাধবেন্দ্রপুরী চৈতন্যদেবের গুরুর গুরু—অর্থাৎ পরমগুরু। মাধবেন্দ্রপুরীর অপর নাম পুরী গোসাঞি। মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে স্বপ্নাদেশ পাইয়া জঙ্গলের মধ্যে

একটি গোপালমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তি লইয়া তিনি বৃন্দাবনে মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিগ্রহের সেবা করিতেন। মাধবেন্দ্রপুরী একবার পুরী যাইবার পথে রেমুণাতে গোপীনাথের বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন। তখন বার ভাণ্ড ক্ষীর দিয়া গোপীনাথের ভোগ দেওয়া হইতেছিল। পুরী গোসাঞি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে রেমুণার ক্ষীর বিখ্যাত।* পুরী গোসাঞির মনে হইল তিনি যদি একভাণ্ড ক্ষীর পান তাহা হইলে ক্ষীর খাইয়া দেখেন এবং কি প্রকারে ঐ ক্ষীর প্রস্তুত হয় তাহাও বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকারে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া বৃন্দাবনে তাঁহার গোপালের ভোগ দিতে পারেন। পুরী গোসাঞি অযাচক সাধু ছিলেন; কখনও কাহারও নিকট ভিক্ষা করিতেন না। তাঁহার মনে ক্ষীরের প্রতি লোভ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দিরের অনতিদূরে রেমুণার হাটে বসিয়া মালা জপিতে লাগিলেন।

রাত্রে গোপীনাথ স্বপ্নে পূজারিকে দেখা দিয়া বলিলেন, "দেখ, এক ভাণ্ড ক্ষীর আমার ধড়ার অঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি, তোমরা দেখিতে পাও নাই। ঐ ক্ষীরভাণ্ড লইয়া যাও। হাটে মাধবেন্দ্রপুরী নামক সাধু আছেন; তাঁহাকে ঐ ক্ষীর দাও।" পূজারি উঠিয়া দেখিল বাস্তবিক এক ভাণ্ড ক্ষীর ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা রহিয়াছে। সে আশ্চর্য্য হইয়া ঐ ক্ষীর লইয়া হাটে মাধবেন্দ্রপুরীর সন্ধান লইয়া তাঁহাকে দিল এবং স্বপ্নের বিবরণ বলিল। "কাহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী সে এই ক্ষীর লও। গোপীনাথ তাহার জন্য এই ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

---

* গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাছে নাহি আর॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

গোপীনাথের এত দয়া দেখিয়া মাধবেন্দ্রপুরী অভিভূত হইলেন। তিনি নিঃশেষে ক্ষীর পান করিয়া ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া সঙ্গে রাখিলেন এবং প্রত্যহ একটি করিয়া খণ্ড খাইতেন।

মাধবেন্দ্রপুরী রেমুণাতে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি ও পাদুকা অদ্যাপি পূজিত হয়। সেখানে একটি টোল স্থাপিত হইয়াছিল। শুনিলাম ছাত্রের অভাবে টোলটী উঠিয়া গিয়াছে।

গোপীনাথের মন্দিরটি প্রাচীন। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরটি সাধারণ বাসগৃহের আকারের; ছাদের নিকট প্রস্তরময় মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মন্দিরমধ্যে তিনটি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত কৃষ্ণমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি ক্ষুদ্র। মধ্যের মূর্ত্তিটি গোপীনাথের। দুই পার্শ্বে মদনমোহন এবং বংশীধরের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে চিত্রকূট পাহাড়ে প্রস্তরের উপর ধনুর শাণিত অগ্রভাগ দিয়া তাঁহার দ্বাপরযুগের ভাবী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সীতাদেবীকে দেখাইয়াছিলেন। পুরীর রাজা লাঙ্গুলা নৃসিংহদেব ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই মূর্ত্তি চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। * রেমুণা রমণীয় শব্দের অপভ্রংশ। কথিত আছে, লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সীতাদেবীর স্ত্রীদেহ সুলভ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীরামচন্দ্র এখানে চারি দিবস

* রেমুণার মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত উদ্ধব বারাণসীতে এই মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন; পরে বারাণসী হইতে মূর্ত্তিটী এখানে আনীত হয়।

অপেক্ষা করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবসে সীতাদেবীর স্নানের জন্য সাতটি শর নিক্ষেপ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র এখানে একটি স্রোত সৃষ্টি করেন। নদীর নাম সপ্তশরা। একটী অতিশয় সঙ্কীর্ণ স্রোতকে সেই প্রাচীন নদী বলিয়া লোকে আজকাল দেখাইয়া থাকে। নিকটে একটি কুণ্ডে তীরে গর্গেশ্বর নামক প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি অল্পদিন হইল সংস্কার করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন রেমুণাতে একটি প্রাচীন গ্রাম্যদেবী আছেন, তাঁহার নাম রামচণ্ডী। প্রবাদ এই যে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এই মূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাইবার সময় রেমুণায় গোপীনাথজি দর্শন করিয়াছিলেন।

"রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচুড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥
চুড়া পাঞা প্রভু মনে আনন্দিত হৈঞা।
বহু নৃত্য গীত কৈল ভক্তগণ লৈঞা॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মাধবেন্দ্রপুরী জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যে শ্লোক পড়িতে পড়িতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব সেই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মন্দির-মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই,

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥

ইহা রাধাঠাকুরাণীর উক্তি ; ঠাকুরাণীর কৃপায় মাধবেন্দ্র পুরীর হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছিল। শ্লোকের অর্থ, হে দীনদয়াদ্র নাথ, হে মথুরাপতি, তুমি কখন আমাকে দর্শন দিবে? হে দয়িত, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে এবং ঘূর্ণিত হইতেছে। আমি কি করি?

"এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িলা ॥

*　　*　　*　　*

অয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বলে বারবার।
কণ্ঠে না উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার ॥"

রেমুণা একটি বড় গ্রাম। গ্রামের নিকটে প্রাচীন দীঘি আছে। অদূরে পাহাড় শ্রেণী দেখা যায়। পাহাড়ের নাম নীলগিরি। তাহার পরেই উড়িষ্যার করদরাজ্য কেওঞ্ঝর প্রভৃতি।

বালেশ্বর শব্দ বাণেশ্বর শব্দের অপভ্রংশ। এখানে দ্বাপর যুগে নাকি বাণাসুর রাজত্ব করিত। বণাসুর চারিটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন— বাণেশ্বর, গর্গেশ্বর, ঝাড়েশ্বর ও মণিনাগেশ্বর। গর্গেশ্বর রেমুণাতে। ঝাড়েশ্বর বালেশ্বর সহরে। বাণেশ্বর ও মণিনাগেশ্বর বালেশ্বর হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে বিভিন্ন দিকে অবস্থিত। বাণাসুর প্রত্যহ এই চারিটি শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। বাণাসুরের কন্যার নাম উষা। কৃষ্ণের পুত্র অনুরাধা উষাকে হরণ করিয়াছিলেন। উষামেড় নামক স্থানে উষার প্রাসাদ ছিল বলিয়া লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে।

"বালেশ্বর হইতে সমুদ্রতীর চারিক্রোশ দূরে। পথে Orissa coast canal পার হইতে হয়; canalএর উপর সেতু আছে। সমুদ্র তীরে একটা সরকারি অফিস আছে, নাম Proof office। এখানে কামানের গোলা পরীক্ষা করা হয়। সমুদ্রতীরে আফিস এবং কয়েকটি কর্ম্মচরীর বাড়ী। নিকটে অনেকগুলি বালির ঢিপি আছে, সেগুলি দেখিয়া কপালকুণ্ডলার বালিয়াড়ির কথা মনে হইল। এখানে সমুদ্রতটে বেশী বালি নাই। তটভূমি দৃঢ়, সমুদ্র অগভীর; একক্রোশ চলিয়া গেলেও নাকি বেশী জল পাওয়া যায় না। একটী বালিয়াড়ির উপর একটি ডাকবাঙ্গালা আছে; আমরা তাহার বারণ্ডায় বসিয়া সমুদ্রের শোভা দেখিতে লাগিলাম। পশ্চাতে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূমি দেখা যাইতেছিল। তখন সূর্য্যদেব দিগ্বলয় হইতে বহু উর্দ্ধে ছিলেন, কিন্তু সৌররশ্মি অতি মৃদু ও অতি ম্লান বোধ হইল। সম্ভবতঃ আর্দ্র বায়ুর উৎক্ষেপক ও তিরোধানকারী গুণে এইরূপ প্রতীতি হইতেছিল (Diffraction and absorption of rays)।

সমুদ্রের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! একদণ্ড সমুদ্রেরতীরে বসিলে মন জুড়াইয়া যায়। এই দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল সমুদ্রের তুলনায় মানব কি ক্ষুদ্র; মানবের সুখদুঃখ, যে সকল চিন্তা অহরহঃ তাহার মনকে পর্য্যাকুল করে—এই বিশাল জগৎব্যাপারের নিকট তাহারা কি নগণ্য, এই ভাব স্বভাবতঃই মনে উদয় হয়। সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি আমাদের

বারাণস্যামুদ্ধবেন স্থাপিতঃ পূজিতঃ পুরা।
ব্রাহ্মণানুগ্রহার্থায় তত্র গত্বা স্থিতো হরিঃ॥ মুরারি।

এ সম্বন্ধে বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র প্রণীত "উৎকলে শ্রীচৈতন্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

চিত্তকে নিমজ্জিত করিয়া শান্ত ও স্থির করিয়া রাখে। তাহার উপর হৃদয়স্নিগ্ধকারী সমুদ্রবায়ু সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া দেয়। যুগপৎ চক্ষু কর্ণ ও স্পর্শ এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া সমুদ্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া আমাদের হৃদয় এঁত শীঘ্র অভিভূত হয়। আমরা এরূপ একটা অস্তিত্বের সান্নিধ্য উপলব্ধি করি যাহার বিস্তার অনন্ত, যাহার অন্তর রহস্যময় ও ভয়ানক, যাহার শক্তি দুর্জ্জয় ও অপরিমেয়। স্বভাবতঃই আমাদের হইতে সকল ক্ষুদ্রচিন্তা স্খলিত হইয়া পড়ে এবং যে অনাদি অনন্ত পুরুষের মহিমা এই রুদ্র মনোহর সমুদ্রের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে, আমাদের মন তাঁহার শ্রীচরণ উদ্দেশে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

যাজপুর

বালেশ্বর হইতে যাজপুর যাইতেছিলাম। সকাল বেলা ট্রেণ ছাড়িবার কথা। তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু ট্রেণ আসিল সন্ধ্যার সময়, কারণ লিলুয়ার ধর্ম্মঘটকারিগণ ভোগপুরের নিকট রেলের লাইন খুলিয়া রাখিয়াছিল, গাড়ী উল্‌টিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইল। যাজপুর রোড ষ্টেশনে পৌছিলাম রাত্রি ১০টার সময়। ষ্টেশনের নিকট ধর্ম্মশালাতে রাত্রি কাটাইলাম। সকালে উঠিয়া যাজপুর পাইলাম। ৮ ক্রোশ পথ। পূর্ব্ব হইতে গরুর গাড়ী বা পাল্কীর বন্দোবস্ত করিতে হয়। আমার সঙ্গে পাল্কী ছিল। তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পাল্কীতে উঠিলাম। বেহারারা নানাবিধ দুর্বোধ্য শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পাল্কী লইয়া চলিল। পথে একটী বৃহৎ খাল পার হইলাম। ইহা High Canal নামে পরিচিত। যাইতে যাইতে অনতিদূরে কয়েকটী প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। এগুলি অনাবৃত স্থানে পড়িয়া আছে। রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত না হইলে কালক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিছুক্ষণ পরে পথ বৈতরণীর তীরে তীরে চলিল। পথের দুই ধারে লোকালয়। তাল খেজুর নারিকেল আম প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষপুঞ্জ শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। একটি সুন্দর মন্দির দেখিলাম। মন্দিরটি আধুনিক। একজন সাহু (মহাজন) ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরের মেঝে মর্ম্মরমণ্ডিত। অনেক চিত্র ও মূর্ত্তির দ্বারা মন্দিরটি সুশোভিত। কিছু দূরে গিয়া বৈতরণী পার হইলাম। বেলা

১১টার সময় যাজপুর পৌঁছিলাম। ৮ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে ৪॥০ ঘণ্টা লাগিল।

যাজপুর অতি প্রাচীন স্থান। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। যাজপুর যজ্ঞপুর শব্দের অপভ্রংশ। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছেন।

এতে কলিঙ্গা কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাচ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতং।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং গিরিসেবিতং॥

মহাভারত, বনপর্ব্ব।

পুরাকালে এই পুণ্যভূমিতে ঋষিগণ বাস করিতেন। এখনও এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস। বহু ব্রাহ্মণের বাস বলিয়া পূর্ব্বে ইহা দ্বিজভূমি বা ব্রাহ্মণ-নগর নামে পরিচিত ছিল। যাজপুর এক সময়ে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। যাজপুরের অসংখ্য হিন্দু দেবালয় ইহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে। পরে রাজধানী এখান হইতে কটকে উঠিয়া গিয়াছিল। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে যাজপুরের নিকটেই পরাভূত ও নিহত করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্বের লোপ হয়।

যাজপুরে প্রধান মন্দির দুইটি—বিরজাদেবীর মন্দির (বা ঠাকুরাণীর মন্দির) এবং বরাহনাথের মন্দির। বিরাজাদেবীর মাহাত্ম্যে এই স্থানের নাম বিরজাক্ষেত্র এবং ইহা ৫১ পীঠের মধ্যে অন্যতম। বিরজাদেবীর মন্দির বৈতরণী হইতে দুই মাইল দূরে। মন্দিরটি প্রাচীন। চারিদিকে পাথরের দেওয়াল দিয়া ঘেরা। এই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি একজন সাধুর চেষ্টায় জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছে. শুনিলাম, সাধুটি প্রত্যেক

গৃহস্থের ঘরে একটি হাঁড়ি রাখিয়া অনুরোধ করেন, যেন প্রত্যহ এক মুষ্টি করিয়া চাউল এই মন্দির সারাইবার জন্য দেওয়া হয়। এই সহজ উপায়ে তিনি এই বৃহৎ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার পূর্ব্বদিকে। প্রবেশ মার্গে দুই পার্শ্বে দুইটি সিংহ। উপরে একটি মন্দির আছে। প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া একটি মন্দিরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ দেখিলাম। যাত্রিগণকে এখানে প্রণাম করিতে হয়। মূল মন্দিরের সংলগ্ন আর একটি মন্দির আছে। ইহা জগমোহন নামে পরিচিত। বিরজাদেবীর মূর্ত্তি কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত, পর্য্যাপ্ত পরিচ্ছদে ভূষিত, নানাবিধ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত,—বক্ষ পর্য্যন্ত রৌপ্যের অলঙ্কার, তদূর্দ্ধে স্বর্ণালঙ্কার। মূল বিগ্রহের পার্শ্বে একটি পিতলের ভোগ-মূর্ত্তি—উৎসবের সময় এই মূর্ত্তি বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। মন্দিরের বাহিরে আমরা একটি বৃহৎ রথ দেখিয়াছিলাম। শুনিলাম বিরজাদেবীর রথযাত্রা হয়।

মন্দিরের নিকট কয়েকটি শিবালয় আছে। একটি মন্দিরের মধ্যে একটি কূপ আছে, উহাকে নাভিগয়া বলে। প্রবাদ এই যে, গয়াসুরের মস্তক গয়াতে পড়িয়াছিল, নাভি এইখানে পড়িয়াছিল, এবং পদদ্বয় রাজামাহেন্দ্রীতে (গোদাবরীতে) পড়িয়াছিল। অপর প্রবাদ অনুসারে সতীর নাভি এই স্থানে পড়িয়াছিল। যাত্রিগণ এখানে তর্পণ করিয়া কূপমধ্যে পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকটে একটী প্রাচীন প্রস্তরাবদ্ধ সরোবর আছে। ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড।

বরাহনাথের মন্দির বৈতরণীর মধ্যে একটী দ্বীপের উপর অবস্থিত। মন্দিরের উত্তর দিকে নদীর ধারাতে সর্ব্বদা জল থাকে; দক্ষিণের ধারাতে জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। আমরা প্রথমে বৈতরণীতে স্নান করিতে চলিলাম। মন্দিরের পাশেই বহু সংখ্যক পাণ্ডাদের বাড়ী। পাণ্ডাদের অবস্থা আজকাল বড় খারাপ—বাড়ীগুলি তাহার

পরিচয় দিতেছে। সাধারণতঃ দরজার পার্শে দেওয়ালের উপর আলপনা দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। অধিকাংশ বাড়ীর সম্মুখে উচ্চ তুলসীমঞ্চ। ইহা উৎকলের বিশেষত্ব। একটী তুলসী-মঞ্চের তলে একটী প্রস্তরের সুগঠিত রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সম্ভবতঃ উহা মন্দিরের কোন অংশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

বৈতরণীতে স্নান সারিয়া আমরা মন্দির দেখিতে গেলাম। এখানে প্রধান বিগ্রহ বরাহ অবতার; মনুষ্যাকৃতি—মুখ বরাহের ন্যায়। ইহার পার্শ্বে শ্বেতবরাহ—যাঁহার কল্প এক্ষণে প্রচলিত; অপর পার্শ্বে গজ-লক্ষ্মী। মন্দিরের বাহিরেও একটি বেদীর উপর বরাহদেবের মূর্ত্তি রহি-য়াছে। বাম ভুজ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত—তাহার উপর একটি ক্ষুদ্র আকারের লক্ষ্মীমূর্ত্তি। মন্দিরের পার্শ্বে দশাশ্বমেধ ঘাট। প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা এখানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈতরণীর প্রবাহ এক্ষণে ঘাট হইতে সরিয়া গিয়াছে। ঘাটের সম্মুখে অল্পপরিমাণে স্রোতহীন জল পড়িয়া রহিয়াছে। মন্দিরের দেওয়ালে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতি প্রস্তর-মূর্ত্তি হয়াছে।

এখান হইতে জগন্নাথদেবের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দির বৈতরণীর দক্ষিণ তীরে নদীর বর্ত্তমান প্রবাহ হইতে কিছু দূরে। এই মন্দিরটিও প্রাচীন; চারিদিকে প্রস্তরের উচ্চ দেওয়াল—প্রাঙ্গণে নারিকেল প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ। মন্দির মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি—পুরীর মন্দিরের ন্যায়। জগন্নাথদেবের মন্দিরের বাহিরে গণেশের মন্দির। তাহার পার্শ্বে অষ্টমাতৃকার মন্দির। এই মন্দিরের মধ্যে সারি সারি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি—বারাহী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী ও নারসিংহী। মূর্ত্তিগুলি নানা-বিধ অলঙ্কারে ভূষিত। কাহার মুখে প্রসন্ন ভাব, কাহারও মুখে রুদ্র

ভাব,—নানাবিধ ভাব সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

এতদ্ব্যতীত যাজপুরে একটী প্রাচীন স্তম্ভ আছে, ইহার নাম শুভস্তম্ভ। বিরজাদেবীর মন্দিরে যাইবার পথ হইতে অল্পদূরে এই স্তম্ভ অবস্থিত। স্তম্ভটী কৃষ্ণপ্রস্তরের, উৎকৃষ্টভাবে পালিশ করা। ইহা তিনটী বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের উপর অবস্থিত। ইহা একটী প্রস্তরখণ্ড হইতে নির্ম্মিত (Monolith)—দৈর্ঘ্যে ২২।২৩ ফুট। ইহার উপর ১০ ফুট উচ্চ অপর একটী প্রস্তরখণ্ড। তাহার গায়ে সিংহের মুখ এবং নির্ম্মাল্য উৎকীর্ণ হইয়াছে। উপরে গরুড় মূর্ত্তি ছিল, এখন তাহা একটী মন্দির মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। এই স্তম্ভের নিকটে কোন মন্দিরের চিহ্ন নাই। কালাপাহাড় এই স্তম্ভটী সরাইবার জন্য ইহার গায়ে ছিদ্র করিয়া দড়ি গলাইয়া হাতী দিয়া টানিয়াছিল, বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই স্তম্ভমধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণিমাণিক্য লুক্কায়িত ছিল, তাহা এক সন্ন্যাসী বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভটী কোন রাজা কর্ত্তৃক কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থির হয় নাই। ইহা কীর্ত্তিস্তম্ভ, গরুড়স্তম্ভ বা সভাস্তম্ভ নামে পরিচিত।

বিরজাদেবীর মন্দিরে যাইবার পথে একটী সেতু আছে। ইহা তেঁতুলিমাল বা এগারনালা নামে পরিচিত। ইহার গঠন-প্রণালী পুরীর বিখ্যাত আঠারনালা সেতুর অনুরূপ,—খিলান ব্যবহৃত হয় নাই। সেতুটী খুব প্রাচীন। স্থানে স্থানে পাথরের উপর বিবিধ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে।

যাজপুরের সবডিভিসনাল অফিসারের আফিসের নিকটেই চারিটি অতিশয় বৃহৎ আকারের প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে,—মূর্ত্তিগুলি বারাহী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী ও শান্ত মাধবের। প্রথম তিনটি মূর্ত্তি সার্দ্ধপঞ্চহস্ত পরিমিত। বরাহী দেবী মহিষাসনা, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা, তাঁহার ক্রোড়ে

শিশু। চামুণ্ডামূর্ত্তি অতি ভয়ানক,—শুষ্কদেহ মুণ্ডমালাবিভূষিতা। ইন্দ্রাণী গজারূঢ়া, সৌম্য মূর্ত্তি—ইঁহারও ক্রোড়ে শিশু। শান্ত মাধবের মূর্ত্তি অতি বৃহৎ—১৬।১৭ ফুট দীর্ঘ। মূর্ত্তিটি স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। এক্ষণে ভূমির উপর পড়িয়া আছে।

যাজপুরের নানাস্থানে বহুসংখ্যক শিবালয় আছে। মন্দির-গুলির আকার ক্ষুদ্র। অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ বিশেষতঃ কালাপাহাড় অনেক মন্দির এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

উৎকলের অন্য তীর্থের ন্যায় যাজপুর শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। যাজপুরে চৈতন্যদেবের লীলার বিস্তারিত বিবরণ ৺সারদা-চরণ মিত্র মহাশয়ের "উৎকলে শ্রীচৈতন্য" গ্রন্থে লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেব দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান করিয়া বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। পরে বিরজাদেবীর মন্দিরে গিয়া ভক্তিভরে দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। সেখানে নাভিগয়াতে পিতৃকৃত্য সমাপণ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। অতঃপর চৈতন্যদেব নিজ শিষ্যগণের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া একাকী যাজপুরের অসংখ্য মন্দির এবং দেব দেবী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। যাজপুরে কত মন্দির ও দেবালয় ছিল, সে সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম।
যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥

যাজপুরের সে গৌরব-দিবস আজ নাই। বিশেষতঃ রেলওয়ে হইবার পর হইতে যাজপুরের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। পূর্ব্বে যাত্রি-গণ যখন পদব্রজে যাইত, তখন সকল জগন্নাথযাত্রী যাজপুর দিয়া যাইত;

এখানে মন্দির ও তীর্থ সকল দর্শন করিত। এক্ষণে রেলওয়ে লাইন এখান হইতে ৮ ক্রোশ দূর দিয়া গিয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক যাত্রী এক্ষণে কষ্ট করিয়া যাজপুরে আসে। যাজপুরের ব্রাহ্মণগণের অতিশয় দুরবস্থা।

যাজপুর হইতে আমি যাজপুর রোড ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম। এই ষ্টেশনের নাম পূর্ব্বে ব্যাস সরোবর ছিল। ষ্টেশন হইতে মাইল-খানেক দূরে বনের মধ্যে একটি দেবালয় আছে। এখানে বৎসরে একবার করিয়া মেলা বসে। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন স্থানটী জনহীন। দেবালয়ের চারিদিক খোলা,—কয়েকটি স্তম্ভের উপর ছাদ রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি সমাধি। তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত জটাজুট-মণ্ডিত, অক্ষমালা-সমন্বিত একটী মূর্ত্তি—বোধ হয় ইহাই ব্যাসদেবের মূর্ত্তি।

ওয়ালটেয়ার

এক দিন ভাদ্রের অপরাহ্ণে ওয়ালটেয়ারে যাইব বলিয়া মাদ্রাজ মেলে আরোহণ করিলাম। হাওড়া হইতে খড়্গপুর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত রেল পথের দুই পাশের ভূমি জলপ্লাবিত হইয়াছিল। এক কোমর জলে নামিয়া দরিদ্র রমণীরা জলজ শাক সংগ্রহ করিতেছিল। চারিদিকে জলের মধ্যে একটু উচ্চ ভূমির উপর দুই চারিটি করিয়া বৃক্ষাবৃত কুটীর দেখা যাইতেছিল।

জলপ্লাবিত দেশ এবং বর্ষাস্ফীত নদনদী দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বর্ষার জলে রূপনারায়ণ রুদ্র-মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। খড়্গপুরের পর বৃষ্টি পাইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রীতিমত দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া ট্রেণ চলিতে লাগিল নিবিড় অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া সৌদামিনী কখনও সম্মুখে, কখনও পশ্চাতে, কখনও নিকটে, কখনও দূরে খেলা করিতে লাগিলেন। অন্ধকার অপেক্ষা সে বিদ্যুতের আলোক যেন আরও ভয়ানক মনে হইতেছিল। অধিক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

গাড়ী যখন বহরমপুর (গঞ্জামে) পৌছিল, রাত্রি তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছে। বহরমপুরের পর আর বড় নদী নাই। এখান হইতে যত দক্ষিণে যাওয়া যায়, ট্রেণ হইতে প্রায় অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বত-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতশ্রেণী এবং সদ্যোবর্ষণপুষ্ট স্রোতস্বিনীগুলি পথটি বড় রমণীয় করিয়াছিল। কখনও সূর্য্যালোকে প্রকৃতি হাসিয়া উঠিতেছিলেন, আবার কখনও অরণ্য ও পর্ব্বতের উপর শুভ্র আবরণ টানিয়া দিয়া

বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছিল। বেলা একটার সময় ট্রেণ ওয়ালটেয়ার ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওয়ালটেয়ার ভিজিগাপটম জেলার অন্তর্গত। ভিজিগাপটম জেলার আকার ভারতবর্ষের সকল জেলার অপেক্ষা বৃহত্তম। মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্যে এই জেলার লোক-সংখ্যাও সর্ব্বপেক্ষা বেশী। জেলার প্রধান নগরের নাম ভিজিগাপটম—সংক্ষেপে ভাইজাগ বলা হয়। ভিজিগাপটম শব্দটি বিশাখপত্তন শব্দের অপভ্রংশ। বিশাখপত্তন শব্দের অর্থ কার্ত্তিকের মন্দির। শোনা যায়, এখানে সমুদ্রতীরে একটী প্রাচীন কার্ত্তিকের মন্দির ছিল এখন তাহা সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই ভিজিগাপটম বা ভাইজাগ নগরের সহতলীর (Suburb) নাম ওয়ালটেয়ার। ভিজিগাপটম এবং ওয়ালটেয়ার উভয় স্থানই সমুদ্রতীরে অবস্থিত,—ভিজিগাপটম নিম্নভূমির উপর, ওয়ালটেয়ার উচ্চ পার্ব্বত্য-ভূমির উপর। উচ্চভূমির উপর বলিয়া এবং বিরল-বসতি বলিয়া ওয়ালটেয়ারের স্বাস্থ্য ভাল। এ জন্য ইংরাজেরা ওয়ালটেয়ারে বাস করেন। ভাইজাগে দেশী লোকেরা থাকেন। ফিরিঙ্গি ও (Eurasian) ভাইজাগে থাকেন।

ভাইজাগে একটি পান্থশালা আছে—তাহার নাম Turner's choultry। দুই চারি দিন থাকিবার পক্ষে এ স্থানটি সুবিধাজনক। সমুদ্রতীরে Piroj Mansions নামক বাড়ীতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। তবে সেখানে ফিরিঙ্গির প্রাদুর্ভাব বেশী। ওয়ালটেয়ারে ইংরাজদের থাকিবার একাধিক হোটেল আছে। বাড়ীভাড়াও পাওয়া যায়। তবে পুরীর ন্যায় এখানেও প্রায় সব বাড়ীতেই যক্ষ্মা রোগী ছিল বলিয়া কিছু বিপজ্জনক।

ওয়ালটেয়ারের নিকটে সমুদ্রতীর প্রায় পূর্ব্ব-পশ্চিম ভাবে বিস্তৃত। পূর্ব্বাংশে ওয়ালটেয়ার, পশ্চিমাংশে ভাইজাগ। ভাইজাগের পশ্চিমে

একটী ক্ষুদ্র নদীর মোহানা (১) আছে। তাহার অপর পারে একটী পাহাড় সমুদ্রের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। সমুদ্রের জল হইতে পাহাড়টি উঠিয়াছে। পাহাড়টি Dolphin's Nose নামে পরিচিত—জানি না ডলফিন নামক মৎস্যের নাসিকার সহিত ইহার সাদৃশ্য কিরূপ। ভাইজাগের শেষ প্রান্ত হইতে ওয়ালটেয়ার পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরে একটা সুদীর্ঘ রাজপথ আছে। পথের ধারে মাঝে মাঝে বসিবার স্থান আছে। এইরূপ একটী বসিবার বাঁধান জায়গার নাম Scandal Point. লাল পথ, দুই পাশে নারিকেল গাছের সারি, পশ্চাতে নগর, সম্মুখে সমুদ্রের দিগন্ত-বিস্তৃত নীল জলরাশি। সমুদ্র-তীর হইতে একটী রাস্তা ওয়ালটেয়ারের উচ্চ ভূমি আরোহণ করিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া কিছু দূর উঠিলে সমুদ্র বেশ সুন্দর দেখায়। সম্মুখে কিছু দূরে—সমুদ্রের জলরাশি একখণ্ড সুবৃহৎ নীল কাচের ন্যায় দেখায়। দূর হইতে তরঙ্গগুলি ছোট দেখায়, তীরের নিকটে যেখানে তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, সেখানে সারি-সারি শুভ্র নির্ম্মাল্যের ন্যায় বোধ হয়। সমুদ্রের ভীম গর্জ্জন এখানে শুনিতে পাওয়া যায় না,—অনুচ্চ মর্ম্মরধ্বনি সমুদ্রের বাতাসে ভাসিয়া আসে। পশ্চাতে চাহিলে, নিকটে ও দূরে পর্ব্বতশ্রেণী, পাহাড়ের উপর বাড়ী ও গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। চারি দিকে ভূমি উচ্চ-নীচ—কোথাও সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, কোথাও গভীর খাদ, উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পর্ব্বত গাত্রের উপর অসংখ্য স্রোতের চিহ্ন। (২)

ভাইজাগে সমুদ্রতীরে একটি প্রাসাদ তুল্য গৃহে Town Hall বা club আছে। এখানকার হাসপাতালটি খুব বড়। একটি Medical

(১) নদীর মুখটি সাধারণতঃ Back water নামে পরিচিত।

(২) 'The Scene from this high ground is probably to the most beautiful on the east coast of India.'—District Gazetteer, Vizagapatam.

College এবং Engineering Schoolও আছে। ভাইজাগের পশ্চিম দিকে নগরের কিয়দংশকে Fort বলে, এখানে ডাকঘর, Custom House, Light House প্রভৃতি আছে। নগরের পশ্চিম প্রান্তে নদীর ধারে কয়েকটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে—এক পার্শ্বে Dolphin's Nose, অপরপার্শ্বে এই পাহাড়গুলি, মধ্যে নদী। একটি পাহাড়—তাহার নাম Ross' Hill—তাহার উপর গির্জ্জা; একটি পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ; অপর পাহাড়টির উপর একটি হিন্দু মন্দির। তিনটি পাহাড়ের উপর তিন ধর্ম্মের তিনটি দেবালয় আছে। ওয়ালটেয়ারের নিকটে যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান আছে তাহাদের মধ্যে সিংহাচলের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মন্দিরে নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি আছে বলিয়া পাহাড়ের নাম সিংহাচল—প্রচলিত কথায় ইহাকে সীমাচল বলে। ওয়ালটেয়ার হইতে সিংহাচল পাহাড় ৫ ক্রোশ। সিংহাচলে যাইব বলিয়া আমরা দুইটি বাণ্ডি ঠিক করিয়াছিলাম। বাণ্ডি এক রকম গরুর গাড়ী। গাড়ীটি আমাদের ঘোড়ার গাড়ীর ন্যায়, তবে কিছু ছোট। অপর প্রভেদ এই যে ঘোড়ার গাড়ীর দুই পাশে দরজা থাকে; কিন্তু বাণ্ডির মাত্র পশ্চাদ্ভাগে একটি দরজা থাকে। গরুতে টানে, কিন্তু গরু প্রায় দৌড়িয়া যায় বলিয়া বাণ্ডি দ্রুতগতিতেই চলে। ৫ ক্রোশ পথ চলিতে ২॥০ ঘণ্টা লাগে।

ভোর চারটার সময় বাণ্ডি আনিতে বলিয়াছিলাম। গাড়ী ঠিক সময়েই আসিয়াছিল। গাড়োয়ানদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া দেখিলাম, চন্দ্রকিরণে বিশাল সমুদ্রবক্ষ এবং তীরস্থ বৃক্ষরাজি উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছে। পূর্ব্বগগনে সূর্য্যের অরুণচ্ছটা তখনও প্রকাশ পায় নাই। যাইবার আয়োজন করিতে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। আমরা যখন গাড়ীতে উঠিলাম, তখন ভোরের আলো বেশ ফুটিয়া উঠি-

য়াছে। আকাশে নক্ষত্রমালা ম্লান হইয়া গিয়াছে। এবং একটি বৃহৎ অর্ণবপোত নক্ষত্রের ন্যায় তিনটি আলো জ্বালিয়া দূর সমুদ্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

রাস্তায় দুই চারিটি করিয়া লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছিল। কদাচিৎ দুই একটি গাড়ীও চলিতেছিল। নগরের উচু নীচু রাস্তা দিয়া আমরা চলিলাম। ক্রমে সহর ছাড়াইয়া ষ্টেসনের নিকট রেল লাইন পার হইলাম। পথের ডানদিকে পাহাড়। পর্ব্বতের নিম্নদেশে ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষরাজির মধ্যে একটি শুভ্র দেবালয় দেখা যাইতেছিল—শুনিলাম উহা মাধোধারা। পর্ব্বতগাত্র গুল্মসমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষ করা হইয়াছে। ক্ষেত্রের সীমাগুলি পর্ব্বতগাত্রে পরিষ্কার ভাবে দেখা যাইতেছে।

আমাদের পথটি পাহাড় ঘুরিয়া তাহার অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইল। দূর হইতে দুইটি পাহাড়ের সন্ধিস্থলে একটি ক্ষীণ রেখা দেখা যাইতেছিল। উহাই সীমাচলে উঠিবার সোপান। একটু পরেই আমরা সীমাচল গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামটি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কার। পাঠশালাতে বসিয়া শিশুগণ পাঠ অভ্যাস করিতেছে। গ্রামে একটি ডাকঘর এবং দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিলাম। জলের কল আছে। সীমাচলের পাহাড়ের হনুমন্ত বঙ্ক নামক নদী হইতে নলে করিয়া ভাইজাগ পর্য্যন্ত জল আসে—এ জন্য ক্ষুদ্র গ্রামেও জলের কল বসান সহজ হইয়াছে। রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ ঘর। সেখানে মন্দিরের কর্ম্মচারী এবং পুরোহিত প্রভৃতি থাকেন। গৃহশ্রেণী এবং রাজপথের মধ্যে পরিচ্ছন্ন ভূমি—তাহাতে দুই চারিটি ফল ও ফুলের গাছ আছে। তেলেগু রমণীগণ গৃহ-কর্ম্মে নিরত ছিল, কেহ বা প্রয়োজন বশতঃ গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতেছিল

গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলাম, সম্মুখে বিস্তৃত প্রস্তরবদ্ধ সোপানশ্রেণী পাহাড়ের উপর উঠিয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে বহুসংখ্যক ভিখারী জীর্ণ মলিন বস্ত্র পাতিয়া বসিয়া আছে। দুইটি স্ত্রীলোকের মাথায় জিনিস-পত্র তুলিয়া আমরা সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই সোপানের উপর একটি বৃহৎ তোরণ। এই তোরণের নিকটে এবং সোপানের ধারে অন্যান্য স্থানে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। সোপানের ধারে প্রস্তরবদ্ধ পয়ঃপ্রণালী। অনেক যাত্রী পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছিল। পথের দুই ধারে ঘন জঙ্গল তাহার মধ্যে বিবিধ বন্য কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তরুলতার অন্তরালে বিহগকুল বিচিত্র কলরব করিতেছিল। একটি নির্ঝরের মর্ম্মরধ্বনি পর্ব্বত-গাত্র মুখরিত করিতেছিল। সোপানবলির ধারে বৈদ্যুতিক তার এবং আলোক-মালা দেখিতে পাইলাম—উৎসবের সময় এই সকল আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হয়। নির্ঝরিণীর জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে সোপানে আরোহণ করিতে-ছিলাম। মধ্যে মধ্যে ক্লান্তি বিনোদনের জন্য সোপান-পার্শ্বে উপবেশন করিতেছিলাম। শীতল পর্ব্বত-সমীরণ সেবন করিয়া, নির্ঝরের মর্ম্মরধ্বনি ও উচ্ছ্বাসিত বিহগ-কাকলী শ্রবণ করিয়া, কুসুমিত তরুলতাচ্ছন্ন পর্ব্বত-গাত্র দেখিয়া শীঘ্রই ক্লান্তি দূর হইতেছিল। কিছু দূর উঠিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের কিয়দংশ ধ্বসিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত প্রস্তরবদ্ধ সোপানও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পাশ দিয়া একটি নূতন পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা সেই পথ দিয়া চলিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আর একটি তোরণের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার নাম হনুমান তোরণ। তোরণের পার্শ্ব দিয়া বারিরাশি প্রচণ্ড বেগে উপর হইতে পড়িতেছে। ইহাকে আকাশ-গঙ্গা বলে। এক্ষণে বর্ষাতে

নির্ঝরের জল বাড়িয়া সোপানাবলি প্লাবিত করিয়া বহিয়া গিয়াছে। জলপ্লাবিত শৈবালসমাচ্ছন্ন সোপানাবলি অতি সন্তর্পণে অতিক্রম করিলাম। ক্রমে পর্ব্বতের শিরোভাগে অপেক্ষাকৃত সমতল অংশে উপস্থিত হইলাম। মধ্যে মধ্যে দুই একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখা যাইতেছিল।

সীমাচল পাহাড়ে উঠিবার সোপানের সংখ্যা সহস্রাধিক। অবশেষে সোপানবলি শেষ হইল। পর্ব্বত-পৃষ্ঠে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র গৃহ দৃষ্ট হইল। গৃহগুলির মধ্য দিয়া দুইটি পাথরে বাঁধান পথ। একটি পথ প্রধান মন্দির অভিমুখে চলিয়াছে—পথের দুই পাশে সারি সারি দোকান। অপর পথটি গঙ্গাধারা নামক নির্ঝর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সীতারামের মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমরা প্রথমে একটি ছত্রে গেলাম। ছত্রটি পাথরের তৈয়ারী। চারিধারে সারি সারি ঘর, মাঝে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। আমরা একটী ঘরে জিনিষপত্র রাখিয়া গঙ্গাধারায় স্নান করিতে গেলাম। গঙ্গাধারা মন্দির হইতে ৫।৭ মিনিটের পথ। এখানে পাথরে বাঁধান স্নান করিবার স্থান আছে। জলরাশি উপর হইতে ২।৩ হাত নীচে পড়িতেছে। জল খুব জোরে পড়িতেছে। জলের নীচে বসিলে বেশ একটু আঘাত লাগে। পাশে আরও দুই একটী জলধারা আছে। একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের উপর অনবরত জল পড়িতেছে। স্ত্রীলোকেরা ফুলের মালা বিক্রয় করিতেছে। তীর্থের ব্রাহ্মণেরা পয়সা চাহিতেছে। পাশে রামসীতার মন্দির। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ ছিল।

গঙ্গাধারায় স্নান করিয়া আমরা প্রধান মন্দিরে চলিলাম। মন্দিরের সম্মুখে পথের দুই ধারে অনেক ছোট ছোট দোকান। তাহাতে তিলকের মাটী, সিন্দুর, পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টা ও করতাল

কাঠের খেলনা, গালার চুড়ি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে চন্দন কাঠ বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। চন্দন কাঠ এখানে সস্তা। পথ হইতে অনেকগুলি সিঁড়ি উঠিয়া ফটক পার হইয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণ হইতে আরও কয়েকটি সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরটি বিজিয়ানাগ্রামের রাজার সম্পত্তি। রাজকর্ম্মচারীগণ মন্দিরের তত্ত্বাবধান করেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পথে একজন কর্ম্মচারী থাকে, সে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে চারি পয়সা লইয়া একটি টিকিট দেয়। মন্দিরটি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি প্রধান মন্দির—তাহাতে বিগ্রহ থাকেন। অপরটি মুখ-মণ্ডপ—প্রধান মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। মুখমণ্ডপের ছাদ সারি সারি প্রস্তর-স্তম্ভের উপর স্থাপিত। স্তম্ভগুলি বিচিত্র শিল্পকার্য্য দ্বারা সমলঙ্কৃত। মন্দিরটি অন্ধকার, এজন্য দিনের বেলাতেও বিদ্যুতের আলো জ্বালা হয়। মুখমণ্ডপের এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিষ্ণু, লক্ষ্মী প্রভৃতির পিত্তল মূর্ত্তি রহিয়াছে। মুখমণ্ডপটি অতিক্রম করিয়া আমরা প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এখানে নরসিংহদেবের বিগ্রহ স্থাপিত। এখানে আসিয়া যখন শুনিলাম যে, নরসিংহদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না, তখন বড়ই দুঃখিত হইলাম। মূর্ত্তিটি প্রত্যহ চন্দন দিয়া সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখা হয়। তখন ইহা চন্দনময় একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গের ন্যায় দেখায়। বৎসরে একদিন মাত্র যাত্রিগণ নরসিংহদেবের দর্শন পায়—অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। এখানে ধূপদীপ এবং নারিকেল কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি ফল নিবেদন করিয়া পূজা দেওয়া হয়। পূজারী চরণামৃত খাইতে দেন, কর্পূরের দীপশিখা স্পর্শ করিতে দেন এবং মাথায় দেবতার পিত্তলময় পাদুকা ছোঁয়াইয়া দেন। পূজান্তে বিগ্রহ প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা মূল মন্দিরের বাহিরে আসিলাম। একস্থানে প্রসাদ বিক্রয়

হইতেছে দেখিলাম। দুই তিন প্রকারের অন্নময় প্রসাদ পাওয়া যায়। কোনটি খিচুড়ীর ন্যায়, কোনটি তেঁতুল সরিষা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত। ঝাল এবং টকের প্রাধান্য কিছু বেশী। পদ্মপত্রে উত্তপ্ত প্রসাদ পরিষ্কার ভাবে বিতরণ করা হয়।

মন্দিরের দেওয়ালে বাহিরের দিকে বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সুগঠিত, আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। কতকগুলি মূর্ত্তি মুসলমানগণ নষ্ট করিয়াছে। ভিজিয়ানাগ্রামের রাণীর আদেশে কতকগুলি মূর্ত্তি চুণ দিয়া আবৃত করা হইয়াছে। শোনা যায় যে, মূর্ত্তিগুলি অশ্লীল বলিয়া রাণী এইরূপ আদেশ দেন।

প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে নাট্যমণ্ডপ। ইহা ৯৬টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। ৬সারি স্তম্ভ আছে, প্রতি সারিতে ১৬টি করিয়া স্তম্ভ। এখানে নরসিংহদেবের স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসন, লক্ষ্মীদেবীর রৌপ্য সিংহাসন এবং বৃহদাকার কাঠের হাতী, ঘোড়া, রথ, হাঁস, গরুড় প্রভৃতি বহুবর্ণে চিত্রিত বিবিধ মূর্ত্তি দেখিলাম। বৎসরে এক দিন নরসিংহদেব শোভাযাত্রা করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া নদীতে স্নান করিতে যান,—সেদিন এই সকল মূর্ত্তি বাহির করা হয়। এই ঘরে তিনটি সুললিত মূর্ত্তি দেখাইয়া প্রহরী বলিল, ইহারা রম্ভা, মেনকা এবং উর্ব্বশীর মূর্ত্তি।

প্রাঙ্গণের এক কোণে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত রথ দেখিলাম। রথের চাকা এবং ঘোড়াগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। আকারে এবং শিল্পচাতুর্য্যে কোনারকের বিখ্যাত প্রস্তর-নির্ম্মিত রথের সহিত তুলনীয় না হইলেও, ইহা অনেকটা সেই ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণে দুই তিনটী ক্ষুদ্র মন্দিরও আছে।

সীমাচল পাহাড়ের উচ্চতা ৮০০ ফিট। পাহাড়ের উত্তর দিকে —প্রায় শিখরের নিকটেই মন্দির। মন্দিরের চারিদিক উচ্চভূমি-

বেষ্টিত। ভিজিয়ানাগ্রামের রাজবংশ ২০০ বৎসরের উপর এই মন্দিরের সত্ত্বাধিকারী। বাৎসরিক ৩০,১০০ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি তাঁহারা মন্দিরকে দান করিয়াছেন। স্থলপুরাণে না কি উল্লেখ আছে যে, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সমুদ্রে ফেলিয়া তাঁহার উপর সিংহাচল পাহাড় চাপাইয়া দিয়াছিলেন,—বিষ্ণু নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া পাহাড়টি সরাইয়া দেন,—তখন প্রহ্লাদ বাহির হইয়া আসেন। প্রহ্লাদই না কি মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবে প্রবাদ আছে যে, হিরণ্য কশিপুর রাজধানী ছিল মুলতানে। এখনও মুলতানকে প্রহ্লাদনগরী বলে।

ইহা হইল পৌরাণিক কথা। ঐতিহাসিক এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই—মন্দিরটি ঠিক কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটী শিলালিপির তারিখ ১০৯৮ খৃষ্টাব্দ—তখনই ইহা একটি বিখ্যাত স্থান ছিল। অপর একটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে, রাজা তৃতীয় গোঙ্কের রাণী মূর্ত্তিটি স্বুবর্ণাবৃত করিয়াছিলেন। ঐ রাজার সময় ১১৩৭—৫৬ খৃঃ। তৃতীয় একটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, গঙ্গা-বংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহ (১২৬৭ খৃঃ) প্রধান মন্দির, মুখমণ্ডপ এবং নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের নানা স্থানে বহুসংখ্যক শিলালিপি আছে। অনূ্ন ১২৫টি শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সকল শিলালিপি হইতে জেলার ইতিহাস সংগ্রহ হইতে পারে। (৩)

(৩)......the many other grants inscribed on its walls (the Government epigraphist's lists give no less than 125 of these) make it a regular repository of the history of the district,—Madras District Gazetteer, Vizagapatam.

ভিজিগাপটম প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা কটকের গজপতি রাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব গজপতি প্রতাপরুদ্রকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্যের বিবিধ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সিংহাচলের শিলালিপিতে তাঁহার বিজয়-কাহিনী লিখিত আছে। কৃষ্ণদেব এবং তাঁহার রাণী ৯৯১ মুক্তার একটি হার এবং বিবিধ অলঙ্কার বিগ্রহকে উপহার দিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কাহিনীতে সিংহাচলের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা অনেকটা এই সময়েই হইবে; কারণ, গজপতি প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সমসাময়িক। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

পূর্ব্বরীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে কতদিনে গেলা॥
নৃসিংহে দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীত স্তুতি॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদের জয় পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ॥
এই মত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাহা রহি করিলা গমন॥

ওয়াল্টেয়ারের নিকটে সিংহাচল ব্যতীত আরও কয়েকটি দেখিবার স্থান আছে। একটীর নাম Valley Garden. নগরের পশ্চিম প্রান্তে যে নদী (Backwater) আছে, তাহা পার হইয়া Vally

Gardenএ যাইতে হয়। নদী পার হইবার জন্য খেয়া নৌকা আছে—ভাড়া প্রতি লোকের ৫ পয়সা। Velley Gardenএর তিন দিকে পাহাড়—এক দিকে Backwaterএর জল একটি ঝরণা পাহাড় হইতে আসিয়া বাগানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া Backwaterএর সহিত মিলিত হইয়াছে। বাগানে সারি সারি নারিকেল গাছ আছে, বিবিধ ফল ফুলের গাছও আছে, এবং দুইটি সুন্দর বাড়ী আছে। ১৯২৩ সালের বিখ্যাত Cycloneএ বাগানের অর্দ্ধেক গাছ পড়িয়া গিয়াছে। বাগানটি যে রাজার সম্পত্তি তিনি পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। ঝটিকায় যাহা নষ্ট হইয়াছিল তাহার আর সংস্কার হয় নাই তথাপি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বাগানটি এখনও অতি মনোরম রহিয়াছে। বাগানবাড়ীতে কেহ থাকে না। দেয়ালে অনেকে নাম লিখিয়া রাখিয়াছে। অনেকে এখানে আসিয়া বনভোজন করিয়াছিল, সে কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এক দিন Dolphin's Nose পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। পাহাড়ে উঠিবার পাথর-বাঁধান পথ আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাহাড়টি ঠিক সমুদ্র হইতে উঠিয়াছে। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে পথ হইতে সমুদ্রের শোভা অতি সুন্দর দেখায়। তীরের নীকটে সমুদ্রের ঢেউগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু তীর হইতে কিছু দূরে ঢেউগুলি আর ভাঙ্গিয়া যায় না। সেখানে ঈষৎ নীলাভ জলরাশি সারি সারি দীর্ঘ সরল তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকে। তরঙ্গগুলি আকারে অতি বৃহৎ। পাহাড়ের উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্যও অতি সুন্দর। এক দিকে যত দূর দেখা যায়—পর্ব্বতমালা। সমুদ্র ও পর্ব্বত বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর নগরের ঘন-সন্নিবিষ্ট গৃহগুলি, Light House, সারি সারি তরঙ্গগুলির তটভূমি অভিমুখে অবিরামগতি, এবং তটভূমির

নিকটে আসিয়া সশব্দে ফেণরাশিতে পরিণতি—সব মিলিয়া একটি পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যের ন্যায় প্রতীত হইল। নগরের একদিকে যেমন Dolphin's Nose, অপর দিকে কিছু দূরে দুইটি পাহাড় সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে দেখা গেল। সম্প্রতি দুই দিন খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে নগরের নিকটবর্ত্তী ভূমি জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। সেই জলরাশিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া রেলওয়ে লাইন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী তারের স্তম্ভগুলি দেখা যায়, তাহার মধ্যে সিংহাচল পাহাড়টিই সব চেয়ে বড়।

Dolphin's Nose পাহাড়ের উপর দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। কয়েকটি ভাঙ্গা, ভাঙ্গা দেয়াল এবং পরিত্যক্ত কূপ দেখিতে পাইলাম। অন্য লোকালয় নাই। ছোট ছোট তরুলতা পাহাড়টিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এখানে একটি নূতন জিনিষ দেখিলাম—সজীব শঙ্খ। কাঁকড়ার ন্যায় একপ্রকার মাংসল জীব শাঁখের মধ্যে থাকে, শাঁখটি জীবের পশ্চাদ্ভাগে থাকে—জীবটি যখন চলে, তখন মনে হয়, যেন শাঁখটি পিঠে বহন করিয়া চলিতেছে। একটু শব্দ শুনিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ জীবটি সঙ্কুচিত হইয়া আবরণের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন ক্ষুদ্র শাঁখগুলি সাদা পাথরের মত দেখায়। সন্ধ্যার ছায়া পাহাড়ের উপর নামিয়া আসিতেছিল। শাঁখগুলি বোধ হয় পর্ব্বত-গাত্রস্থ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের পক্ষে পাহাড়টি বিশাল জগৎ। এতগুলি শাঁখ দেখিয়া আমরা পাহাড়টার নাম শঙ্খ-পাহাড় রাখিলাম।

আমরা যখন পাহাড় হইতে নামিলাম, তখন আকাশে কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। ডাকাডাকির পর ওপার হইতে খেয়া নৌকা আসিল আসন্ন ঝটিকার আভাস পাইয়া Backwaterএর কৃষ্ণ

বারিরাশি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা খুব দুলিতে লাগিল। আমরা শঙ্কিত হৃদয়ে নৌকায় উঠিয়াই Backwater অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ওয়ালটেয়ারের নিকটে সীতামধারা নামক একটি স্থান আছে। প্রবাদ—এখানে সীতা স্নান করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের পাদদেশে একটি মনোরম উদ্যান আছে। উদ্যানের পার্শ্বে একটী গৃহ। গৃহের সম্মুখে মালতী ফুলের ঝাড়। চারি দিকে বিবিধ ফল ফুলের গাছ। নির্ঝরের জল একটি ক্ষুদ্র প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া উদ্যানের বৃক্ষাবলীতে জল সেচন করিতেছিল। শুনিলাম, সীতামধারার তীর্থে যাইতে হইলে, পাহাড়ের উপর এক মাইল পথ উঠিতে হইবে। বেলা অধিক হইয়াছিল—সঙ্গে ছেলেমেয়েরা ছিল, তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য আমরা ফিরিয়া আসিলাম—সীতামধারা দেখা হইল না।

আমরা শরৎকালে ওয়ালটেয়ারে গিয়াছিলাম। সে সময় এখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইত। দুই তিন দিন পরিষ্কার থাকে, রোদ হয়, সমুদ্রের হাওয়া জোরে বহিতে থাকে। তাহার পর পশ্চিমের পাহাড় হইতে নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ নামিয়া আসে, এবং প্রচণ্ড বর্ষণ আরম্ভ হয়। বৃষ্টির পর তীর-ভূমি হইতে কর্দ্দমাক্ত জল সমুদ্রের উপর নামিয়া আসে। তখন নীল এবং লাল জলে মিশিয়া বেশ দেখায়। দুই তিন দিন অনবরত বৃষ্টির পর বর্ষণের সময় সমুদ্রকে অতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিতে দেখিয়াছিলাম—যেন রক্তের সমুদ্র। কোন কোন দিন বৃষ্টি থামিয়া গেলে, সমুদ্র নূতন রূপ ধারণ করিতেন। এক দিন মনে আছে, দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। বৈকালে বৃষ্টির বিরাম পাইয়া গাড়ী করিয়া সমুদ্র তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন ছিল।

সমুদ্রের নীল রং আর দেখা যায় না। তাহার পরিবর্ত্তে একটা গাঢ় ধূসর রং সমুদ্রকে আরও ভয়ানক, আরও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তোন্মুখ হইলেন—মেঘাচ্ছন্ন দিবসের অল্প আলোক আরও ক্ষীণ হইয়া আসিল। দুই চারিটি জেলে-ডিঙি এমন দুর্দ্দিনেও বাহির হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিতেছে দেখা গেল। কি সুন্দর সে দৃশ্য! যেন জীব ইহলোক হইতে পরলোক যাত্রা করিয়াছে,—অনন্ত অজানা রহস্যময় পথ—কোন সঙ্গী নাই—পরপারে কখন পৌঁছিবে, কেমন সে দেশ—কিছুই জানা নাই।

কাঞ্চী

মান্দ্রাজ হইতে কঞ্জিবরম প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পথ। মান্দ্রাজ হইতে সকালে এগারটার সময় রওনা হইয়া বেলা দুইটার সময় আমরা চিঙ্গলপৎ জংশনে পঁহুছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। চিঙ্গলপৎই একটী তীর্থস্থান—এখান হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে পক্ষিতীর্থ অবস্থিত। কিন্তু সেখানে যাইবার আমাদের সুবিধা হয় নাই। আমরা কঞ্জিবরম অভিমুখে চলিলাম। বেলা চারিটা বাজিল। দূরে দুইটি গোপুরমের উচ্চ চূড়া নয়নগোচর হইল। বুঝিলাম, আমরা কঞ্জিবরমের নিকটে আসিয়াছি। গাড়ী ষ্টেশনে আসিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। এক জন পাণ্ডা ভাল ঘর দেখাইয়া দিবে বলিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। কাঞ্চীনগর দুই ভাগে বিভক্ত—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চী ষ্টেশনের নিকটে। আমরা সেখানেই থাকিব, স্থির করিলাম। কাঞ্চীর পথগুলি অতি সুন্দর। পরিস্কৃত প্রশস্ত পথগুলি ঋজুভাবে বিস্তৃত। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষের শ্রেণী—সাধারণতঃ নারিকেল বৃক্ষ। বৃক্ষশ্রেণীর পর একটু ব্যবধান, তাহার পর বাড়ীগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। বড় বাড়ী বেশী দেখিলাম না। রাস্তার ধারে জলের কল। সেখানে বিচিত্র,বস্ত্র-পরিহিত তামিল-রমণীগণ কলসী লইয়া জল আহরণ করিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ছায়ায় ছেলে মেয়েরা খেলা করিতেছে। নগরের সুপ্রশস্ত পথগুলি "নগরেষু কাঞ্চী" এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছিল।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমরা একটী বাসা পাইলাম। বাসাটি

রোয়াকে,—এবং শিবকাঞ্চীর বৃহৎ গোপুরমের সন্নিহিত। নীল আকাশের পটে গোপুরমের সমুন্নত শ্রী আমরা বাসায় বসিয়াই দেখিতে পাইতাম। গোপুরমের সম্মুখস্থ প্রস্তরগঠিত চত্বরের উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যও এখান হইতে দেখা যাইত। সন্ধ্যাবেলায় নহবৎ বাজিত, গোপুরমের সর্ব্বাঙ্গে আলোক প্রজ্বলিত হইত, এবং মন্দির-যাত্রীদিগের ভিড়ে সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত পথ জনাকীর্ণ হইত—সে সময় সকলের হৃদয় আপনা হইতেই ভক্তি ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইত।

শিবকাঞ্চীর এই সুবৃহৎ মন্দিরে একাম্রনাথ নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। মন্দিরের চারি পার্শ্ব উচ্চ প্রস্তরগঠিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৫০০।৬০০ গজ হইবে। এই প্রাচীরের দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বারের উপর দুইটি গোপুরম। দক্ষিণের গোপুরমটিই সমধিক উচ্চ। ইহা কাঞ্চীর মধ্যে উচ্চতম গোপুরম, এবং দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ গোপুরমগুলির মধ্যে অন্যতম। গোপুরমের চিত্র অনেকেই হয় ত দেখিয়াছেন। ইহা সমচতুষ্কোণ ভিত্তির উপর নির্ম্মিত। শিবকাঞ্চীর বৃহৎ গোপুরমে সর্ব্বশুদ্ধ এগারটি তল আছে। উপরের দিকে ক্রমশঃ আয়তন কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র চতুষ্কোণ। হিন্দু স্থপতিবিদ্যার বিশিষ্ট লক্ষণ arch বা খিলানের অভাব। দক্ষিণ-ভারতের গোপুরম ও মন্দিরগুলিতে কোথাও খিলান নাই। এই গোপুরমের প্রতি তলের মধ্যদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি।

গোপুরমের উপর এতদ্ব্যতীত আরও মূর্ত্তি ও শিল্পকার্য্য বিদ্যমান আছে। গোপুরম দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে দুই তিনটি সরোবর দেখা যায়। একধারে সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট একটী দালান। সংস্কারাভাবে ইহা ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। মূল মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত চত্বর। তাহার স্তম্ভগুলি নানা প্রকার কারুকার্য্যে খচিত। একটি অশ্ব সম্মুখের

পা দুইটী তুলিয়া প্রায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহার পৃষ্ঠে যোদ্ধবেশে একজন অশ্বারোহী উপবিষ্ট—এই মূর্ত্তিটি দক্ষিণ-ভারতের স্তম্ভগুলির উপর প্রায়ই উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলায় এই সকল স্তম্ভগুলি এবং দ্বারপথ আলোকমালায় সজ্জিত হয়; তখন দৃশ্য অতিশয় মনোহর হয়। মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎ পিত্তলনির্ম্মিত বৃষভ-মূর্ত্তি। দক্ষিণ-ভারতের পাঁচটি প্রসিদ্ধ স্থানে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতের পাঁচটী শিবলিঙ্গ আছে। কাঞ্চীতে ক্ষিতি-মূর্ত্তি। এই জন্য এখানে শিবলিঙ্গ জল বা দুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত হয় না। মন্দিরের অভ্যন্তরে এক স্থানে এক অতি প্রাচীন আম্র বৃক্ষ আছে। শোনা যায় যে, ইহার চারি শাখায় চারি প্রকার ভিন্ন আস্বাদনের ফল ধরিয়া থাকে। এই আম্রবৃক্ষ হইতেই মহাদেবের নাম একাম্রনাথ হইয়াছে। বিমান মন্দিরের চারি পাশে বারাণ্ডায় অসংখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজিত।

শিবকাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন। দক্ষিণদেশীয় অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় ইহাও উচ্চ প্রাচীর দিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। সুপ্রশস্ত বাঁধান প্রাঙ্গনের মধ্যে পুষ্করিণী, মণ্ডপ ও বিমান মন্দির বিরাজিত। এখানে একটী মন্দিরের মধ্যে জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। কামাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি,—বিশেষ করিয়া তাঁহার বহুপুষ্পাভরণ-ভূষিত, ভোগমূর্ত্তি * দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মা যেন অল্প অল্প হাসিতেছেন। তাঁহার সেই ঈষৎ-স্মিতবিকশিত বদন হইতে করুণা ও প্রসন্নতা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে।

শিবকাঞ্চী হইতে বিষ্ণুকাঞ্চী প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

---

* দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিতে সাধারণতঃ দুইটী করিয়া মূর্ত্তি থাকে। একটী প্রস্তরনির্ম্মিত অচল মূর্ত্তি, আর একটী ধাতুনির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তি। উৎসবাদির সময় এই ভোগমূর্ত্তিই বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়।

উভয় স্থান দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সংযুক্ত। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, এবং তাহার পশ্চাতে সুবিন্যস্ত গৃহশ্রেণী। বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দিরও অতিশয় প্রাচীন। এখানে শতস্তম্ভবিশিষ্ট একটী মণ্ডপ আছে। কৃষ্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভগুলির উপর অশ্বারোহীর মূর্ত্তি এবং নানা প্রকার জীব জন্তর মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এই মণ্ডপের শিল্পকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট। বিষ্ণুকাঞ্চীর বিগ্রহের নাম বরদরাজস্বামী। অন্ধকার প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নানালঙ্কারশোভিত বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তির সম্মুখে আমরা নীত হইলাম। দর্শনানন্তর অন্যান্য ক্ষুদ্র বিগ্রহ দেখিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীরঙ্গম যাইবার পূর্ব্বে রামানুজ কয়েক বৎসর বিষ্ণুকাঞ্চীতে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী উভয় স্থানই দর্শন করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে দেখিতে পাই—

শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত শৈবগণ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥

কাঞ্চীতে দুই দিন থাকিয়া আমরা বিকালের ট্রেণে তাঞ্জোর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। চিঙ্গলপৎ ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া Ceylon Boat mailএ আরোহণ করিলাম। এই ট্রেণ মান্দ্রাজ নগরী হইতে লঙ্কাযাত্রীদিগকে লইয়া রামেশ্বর এবং তাহার পরবর্ত্তী ষ্টেশন ধনুষ্কোটি পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। সেখানে ষ্টীমার (Ceylon Boat) যোগে লঙ্কাদ্বীপ দুই ঘণ্টার পথ। সমস্ত রাত্রি ট্রেণে কাটিল। প্রত্যুষে গাড়ী তাঞ্জোর

ষ্টেশনে থামিল। ষ্টেশনের খুব নিকটেই নবনির্ম্মিত তাঞ্জোর-রাজ-ছত্রমের প্রাসাদতুল্য ত্রিতল অট্টালিকা। এখানে থাকিবার কিছুমাত্র অসুবিধা নাই। আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে আমাদের মনে হইয়াছিল, যে, হোটেলের সন্ধান লইলে আমাদের কম কষ্ট হইত। দক্ষিণ-যাত্রিগণ হোটেলের সন্ধান লইলে অনেক অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। কলিকাতায় হোটেলগুলি সাধারণতঃ বেশ পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন নহে। তাহার পর নানা অখাদ্য থাকে বলিয়া নিষ্ঠাবান লোকদের খাইতে অভিরুচি হয় না। কিন্তু দক্ষিণ দেশের হোটেলগুলি বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল। বলা বাহুল্য, মাছ মাংস নাই, তবে কোথাও কোথাও পলাণ্ডু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনে অবশ্য ঝালের ভাগ বেশী। কিন্তু ঘোল ও দধি বেশী করিয়া খাইলে সে ঝাল সহ্য করা যায়। স্বাস্থ্যবান লোকদের বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

তাঞ্জোরের মন্দিরটি অতিশয় উচ্চ ও সুগঠিত। মন্দিরের বাহিরে গোপুরম্ আছে—কিন্তু অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এখানে গোপুরমটি মূল মন্দির অপেক্ষা বৃহত্তর নহে। মন্দির-বেষ্টনকারী প্রাচীরের চারিধারে পরিখা। যুদ্ধের সময় এখানে সৈন্যসমাবেশ করা হইত, এবং কামান বন্দুক প্রভৃতির জন্য দেওয়ালে ছিদ্র কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। মন্দির-মধ্যস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণটি প্রস্তরমণ্ডিত। মন্দিরের সম্মুখে তাঞ্জোরের প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ প্রস্তরগঠিত বৃষভ-মূর্ত্তি। বৃষভ-রাজের বিশাল মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। নিকটে এমন পাহাড় নাই; যেখানে এই প্রস্তর পাওয়া যাইতে পারে। দূরস্থ পর্ব্বত হইতে এই বৃহৎ ব্যাপারটি এত দূরে আনিয়া এই উচ্চ বেদীর উপর স্থাপন করিতে যে কত পরিশ্রম ও কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। মন্দিরমধ্যস্থ

শিবলিঙ্গটিও অতি বৃহৎ—আমরা এত বৃহৎ লিঙ্গ কুত্রাপি দেখি নাই। তাঞ্জোরের সমুন্নত মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। প্রাঙ্গণস্থ সুব্রহ্মণ্য * দেবের মন্দিরের শিল্পকার্য্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর উজ্জ্বল বর্ণের বিবিধ চিত্রে সুশোভিত। একটী কক্ষের মধ্যে তাঞ্জোরের রাজাদের চিত্র, এবং অশ্ব, ময়ূর প্রভৃতি বিবিধ প্রাণীর সুরঞ্জিত প্রতিকৃতি। তাঞ্জোরের মন্দিরে আমরা দেব-দর্শনার্থীর বিশেষ সমাগম দেখিলাম না। এত ঐশ্বর্য্য ও শিল্পকৌশল ভক্তিপূর্ণ যাত্রীর অভাবে প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইল।

বৈকালে আমরা রাজপ্রসাদ দেখিতে গেলাম। ইহাও একটি দুর্গ-মধ্যে অবস্থিত। সকালে এক জন Guide বা প্রদর্শকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বৈকালেও সে আমাদের সঙ্গে চলিল। সে ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে পারে। প্রাসাদের বিবিধ দ্রষ্টব্য বস্তু সে অনর্গল বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিল। বেশ বোঝা গেল যে, সে এই সব বর্ণনা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। তাঞ্জোরের রাজপ্রাসাদের কিয়দংশে এক্ষণে সরকারী আফিস হইতেছে। বিচিত্র সভাগৃহ দেখিয়া আমরা অন্তঃপুরের প্রবেশ করিলাম। এক অংশে রাজবংশের বর্ত্তমান বংশধরগণ বাস করিয়া থাকেন। রাজবাটীর মধ্যস্থ কক্ষগুলি বিশৃঙ্খলভাবে নির্ম্মিত। প্রাচীরবেষ্টিত একটী শুষ্ক জলাশয় দেখিলাম—রাজারা এখানে জলবিহার করিতেন। একটী ভূগর্ভস্থ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া আমরা কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। স্থানটি ভীতিজনক। একটী কক্ষে সুবর্ণময় অশ্বাভরণ, সিংহাসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বদ্ধ রহিয়াছে —এই সকল লইয়া উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মোকদ্দমা চলিতেছে।

* দক্ষিণ দেশে বহুসংখ্যক কার্ত্তিকের মন্দির আছে; তিনি এতদ্দেশে সুব্রহ্মণ্য দেব নামেই সমধিক পরিচিত।

স্মৃক্ষপ্রাসাদে বিশেষ চিত্তাকর্ষক কিছু নাই। প্রাসাদের বাহিরে পরিখার পার্শ্বে মঞ্চের উপর এক বৃহৎ কামান দেখিলাম। কতকগুলি দরিদ্র শিশু নগ্নদেহে নিশ্চিন্তমনে ইহার উপর চড়িয়া খেলা করিতেছিল।

পর দিন প্রাতে আমরা মন্দিরপার্শ্বস্থ শিবগঙ্গা নামক জলাশয় দেখিতে গেলাম। বর্ষাকালে নদীর জল ঘোলা হয়, এই পুষ্করিণীর জলও তদ্রূপ। প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় প্রশস্ত বাঁধানঘাট। ঘাটের সোপানাবলী আরোহণ করিয়া রমণীগণ কলসীকক্ষে জল লইয়া যাইতেছিল। পুষ্করিণীর নিকটে Schwartz নামক ওলন্দাজ পাদ্রীর গির্জ্জা। দাক্ষিণাত্যে পাদ্রীগণ বহু দিন হইতে প্রচার কার্য্য করিতেছে। সেই জন্য নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বহুসংখ্যক খৃষ্টান আছে। সরোবর পার্শ্বস্থ উদ্যান দেখিয়া আমরা ঝটকায় করিয়া নগরের মধ্য দিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। সুপ্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে দোকান, বাজার এবং বসতবাটী। পথোপরি জনপ্রবাহ। দুই চারিটী ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোক হাঁটিয়া যাইতেছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, দাক্ষিণাত্যে পর্দ্দা নাই। ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকেরা অনাবৃতমুখে প্রকাশ্য স্থলে বাহির হন। কিন্তু আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকগণ যেরূপ পরপুরুষের সহিত আলাপ করেন না, দক্ষিণাত্যের প্রথাও সেইরূপ। মূল প্রথা উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে এক; উভয় দেশের সমাজেই স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র করিয়া রাখে।

তাঞ্জোর হইতে ত্রিচিনাপল্লী আড়াই ঘণ্টার পথ। আমরা দুইটার পর গাড়ীতে চড়িলাম। বৈকালে ত্রিচিনাপল্লী জংশন ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ত্রিচিনাপল্লী বড় সহর, এখানে তিনটী রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ফোর্ট ষ্টেশনের কাছেই দেশী লোকের বাস, এবং এখান হইতে শ্রীরঙ্গম নিকটবর্ত্তী—তাই আমরা ফোর্ট ষ্টেশনেই নামিলাম।

আমরা যখন ষ্টেশন হইতে সহরের অভিমুখে যাইতেছিলাম, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িয়াছেন। পৃথিবীর তপ্ত বক্ষ হইতে ক্লেশাবসান-ব্যঞ্জক নিঃশ্বাসের ন্যায় বৈকালের বাতাস বহিতেছিল। পথের ধারে হরিৎ বর্ণের ক্ষেত্রগুলি শোভা পাইতেছিল। নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষের উচ্চ শিরগুলি সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত হইতেছিল। পাদ্রীদের গির্জ্জা, কলেজ, ছাত্রাবাস প্রভৃতির বৃহৎ অট্টালিকাগুলি শোভা পাইতেছিল। ছাত্রেরা টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন প্রভৃতি খেলিতেছিল।

আমাদের গাড়ীর গরুগুলি ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে ছুটিতেছিল। রাজপথস্থ লোকগণ বিদেশী দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল। পথের ধারে এক বিস্তীর্ণ জলাবৃত স্থান দেখিলাম। শুনিলাম, কাবেরী নদীর প্রবাহ হইতে এই জল ছাপাইয়া আসিয়াছে। একটু পরেই আমাদের গাড়ীগুলি চিনিয়া পিল্লের সুন্দর ছত্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছত্রটি দ্বিতল। যাত্রীরা সাধারণতঃ এক তলাতেই থাকে। সম্ভ্রান্ত যাত্রিগণ গৃহস্বামীর বিশেষ অনুমতি পাইলে দ্বিতলে থাকিতে পারেন। আমরা শুনিলাম, একতলায় স্থান নাই—ছত্ররক্ষক আমাদিগকে স্বতন্ত্র আশ্রয় খুঁজিতে বলিল। অগত্যা আমরা গৃহস্বামীর ভবন অভিমুখে গাড়ী ছুটাইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। পথিপার্শ্বস্থ জলের কলের চারিধারে বিচিত্র-বেশ-পরিহিত জলার্থিনী রমণীবৃন্দের ভিড় অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। ক্রমে আমরা উদ্দিষ্ট ভবনে উপস্থিত হইলাম। পিলে মহাশয় ব্যবসাদার লোক। একটী দ্বিতল প্রকোষ্ঠে তাঁহার কয়েকটি কর্ম্মচারী দোকানের খাতা খুলিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা পরিচয় প্রদান করিলে তাঁহারা যথেষ্ট সমাদর করিয়া আমাদিগকে পাশের সুসজ্জিত কক্ষে বসিতে বলিলেন, এবং কহিলেন, ছত্রের ভৃত্যদিগকে এই

পঁচিশ দিলেই উপরের ঘর খুলিয়া দিবে। আপনারা সেখানে থাকিতে পারিবেন।" ইহাদের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা ছত্রমে ফিরিলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পান্থনিবাসের স্থানে স্থানে স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীগণ ছোট ছোট দল বাঁধিয়া বসিয়াছিল। একটী বৃহৎ কক্ষে রঙ্গনাথ স্বামীর শয়ান মূর্ত্তি। আমরা উপরের ঘরে গেলাম। একটী দীর্ঘ হলের দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র ঘর। দেওয়ালে বহুসংখ্যক ছবি। চেয়ার টেবিল ও অন্যান্য গৃহোপকরণে কক্ষগুলি সুসজ্জিত।

পরদিন প্রাতে শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলাম। সহর ছাড়াইয়া আমরা কাবেরী নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। পবিত্র নদীর সুন্দর শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল।

শ্রীরঙ্গম্

বিস্তীর্ণ জলপ্রবাহ। বর্ষাসমাগমে বারিরাশি গাঢ় গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। জল কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। পর পারে শ্রীরঙ্গমের শ্যামল স্নিগ্ধ কান্তি দেখা যাইতেছে। তীরস্থিত ঘনবিন্যস্ত তরুরাজির অধোবিলম্বিত শ্যামল পত্রাবলী প্রায় স্পর্শ করিয়া গৈরিক বর্ণের জলরাশি দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কাবেরী নদীর উপরে বৃহৎ সেতু বিস্তৃত। আমাদের গাড়ী যখন সেই পুলের উপর দিয়া যাইতেছিল, তখন আমরা একবার নীচে চাহিয়া গভীর জলরাশির দ্রুত প্রবাহ দেখিতেছিলাম, একবার শ্রীরঙ্গমের তরুরাজির শ্যামকান্তি ও একবার ত্রিচিনাপল্লীর শুভ্রসৌধখচিত তীর-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে আমরা পর পারে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীরঙ্গম্ কাবেরী নদীর মধ্যস্থ দ্বীপ। কিন্তু দ্বীপটির আয়তন বিশাল বলিয়া এবং নদীর গতি এখানে বক্রাকার বলিয়া ইহার দ্বীপত্ব সহজে প্রতিভাত হয় না; মনে হয়, ইহা বুঝি নদীর পর পার। আমরা মন্দির-অভিমুখে চলিলাম। পথের ধারে দুই একটা বাড়ী দেখা যাইতেছিল। প্রায় প্রত্যেক গৃহের উপরেই বড় করিয়া আঁকা ত্রিবন্ধ—(ত্রিপুণ্ড, সুদর্শন ও পাঞ্চজন্য)—ঘোষণা করিয়া দিতেছিল যে, ইহা বৈষ্ণব-প্রধান স্থান। কাবেরীর একটা সঙ্কীর্ণ প্রণালী এই দ্বীপের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কাবেরীর সেই ক্ষুদ্র শাখা অতিক্রম করিয়া একটু পরেই আমরা মন্দিরের বহির্দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা মিলিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার

আলয়ে দ্রব্যাদি রাখিয়া আমরা স্নানার্থ কাবেরীর ঘাটে ফিরিয়া চলিলাম।

নদীতীরে বহু নর নারী সংকল্প করিয়া স্নান করিতেছিল। আমরাও পাণ্ডার সম্মুখে সংকল্প করিয়া স্নান করিলাম। নদীজল খরবেগে প্রবাহিত। আমরা সাহস করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। দুই চারিটি ক্ষুদ্র মৎস্য পাদদেশে দংশন করিয়া আমাদিগকে মুহূর্ত্তের জন্য চকিত করিয়া তুলিতেছিল। স্নানান্তে আমরা মন্দিরাভিমুখে চলিলাম।

শ্রীরঙ্গমের মন্দির অতিশয় বৃহৎ,—অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া আছে। সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা সুবৃহৎ তোরণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এই তোরণের উপর একটী গোপুরম। মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরে অবস্থিত প্রাচীরের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবার এই পথ। এই তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া আমরা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক বিপণী ও গৃহাবলী দেখিতে পাইলাম। রাজপথের জনতার মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। সম্মুখে দ্বিতীয় তোরণ, তাহার উপরে গোপুরম, এবং মন্দির বেষ্টনকারী দ্বিতীয় প্রাচীর। এই ভাবে উপর্য্যুপরি সাতটি তোরণের মধ্য দিয়া সাতটি প্রাচীর অতিক্রম করিলে মূল মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই সকল প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এত অধিকসংখ্যক গৃহ ও বিপণী রহিয়াছে যে, মন্দিরটিকেই একটী নগরী বলা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরের প্রাচীর দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইলের তিন-চতুর্থাংশ, এবং প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। তোরণ সাতটি অতিক্রম করিয়া আমরা সকলের অভ্যন্তরে একটি কারুকার্য্য-খচিত বহুসংখ্যক-স্তম্ভযুক্ত একটি প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দেখিতে পাইলাম। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে মন্দির-মধ্যে গরুড় দেবের বৃহৎ মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে

বিমান-মন্দির। আমরা দ্বারের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর বহুসুবর্ণালঙ্কারশোভিত ভোগমূর্ত্তি, এবং তাহার পশ্চাতে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত বিশাল শয়ান-মূর্ত্তি। বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মস্তকের উপর অনন্তের সহস্র ফণা বিস্তৃত। অন্ধকারে এই মূর্ত্তি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। প্রদীপের আলোক সুচিক্কণ বিগ্রহের নানা স্থলে প্রতিফলিত হইতেছিল। পূজাসমাপনান্তে আমরা বাহিরে আসিলাম। আমাদের মাথার উপর ছাদ থাকায় বিমান-মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। কিছু দূর সরিয়া গিয়া মন্দিরের সুবর্ণমণ্ডিত চূড়া দেখিতে পাইলাম। ছোট ছোট দোকানগুলি চিত্র, শঙ্খ, আয়না প্রভৃতি বিচিত্র দ্রব্যে পরিপূর্ণ। যে রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক স্থানে তাঁহার, তাঁহার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। রঙ্গনাথস্বামীর বহুমূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণালঙ্কার আছে। উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলে তাহা দর্শকগণকে দেখান হইয়া থাকে।

এই মন্দিরনির্ম্মাণে কত অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়াছে, এবং এই দেবায়তন কত দীর্ঘকাল ধরিয়া দূরদেশ হইতে আগত ধর্ম্মপিপাসু ভারতবাসীর হৃদয়ে ভক্তির উৎস ছুটাইয়াছে, আমরা তাহাই ভাবিতেছিলাম। রামানুজের গুরু যামুনাচার্য্য এইখানে বাস করিতেন। যামুনাচার্য্যের মৃত্যুর পর রামানুজ কাঞ্চী হইতে আসিয়া এই স্থানে তাঁহার পুণ্যময় দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বেদান্ত-সূত্রের বৈষ্ণব ভাষ্য—ভারতবিখ্যাত শ্রীভাষ্য—এবং অন্যান্য বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এই স্থানে রচিত হইয়াছিল। আজ প্রায় আট শত বৎসর হইল, তিনি শ্রীরঙ্গমে তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। আরও চারি শত বৎসর পরে সুদূর বঙ্গদেশ হইতে সমাগত

এক কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত যুবকের শ্রীচরণস্পর্শে শ্রীরঙ্গমের পবিত্র ধূলি পবিত্রতর হইয়াছিল। সেই যুবকটি ভারতের গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে চারি মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দরারবিন্দসদৃশ নয়নযুগল হইতে উৎসারিত প্রেম প্রবাহে কতবার মন্দির প্রাঙ্গন অভিষিক্ত হইয়াছিল; তাঁহার মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত অমৃতময় হরিনামে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বায়ু বহুবার তরঙ্গায়িত হইয়াছিল।

কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সব লোকের মন।

—চৈতন্যচরিতামৃত।

মন্দিরমধ্যে পরম বৈষ্ণব বেঙ্কটভট্টের বাটীতে চারিমাস কাল অবস্থান করিয়া মহাপ্রভু চাতুর্মাস্য ব্রত পরাণ করিয়াছিলেন।

জনৈক ভক্ত-বিপ্রের অশুদ্ধ গীতা-পাঠের কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। এই শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং শ্রীচৈতন্যদেবই সেই উপহসিত বিপ্রের ভক্তির উৎকর্ষ সর্ব্বজনের বিদিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে আমরা সেই কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি করে গীতা-আবর্ত্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায়ে পড়ে আনন্দ-বশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক সব উপহাসে॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে॥

পুলকাশ্রু কম্পস্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিল তারে—শুন মহাশয়।
কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে—মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়-রজ্জু-ধর।
বসিয়াছেন তাতে যেন শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিয়াছেন হিত উপদেশ।
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পাঠো তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে—গীতা-পাঠ তোমার অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতায় অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু পদে ধরি বিপ্র করেন রোদন॥

সেই জ্ঞানহীন ভক্ত ব্রাহ্মণের হৃদয়ে ভগবানের অনুগ্রহে কৃষ্ণমূর্ত্তি যেভাবে স্ফুরিত হইত, পাণ্ডিত্যাভিমানী দর্শকগণের হৃদয়ে সেভাবে স্ফূর্ত্তি হইলে তাহারা ধন্য হইত,—ইহা দেখাইবার জন্যই লীলাময় মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে এই অভিনয় করিয়াছিলেন।

শ্রীরঙ্গম দ্বীপে রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে শৈবদের একটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের নাম জম্বুকেশ্বরের মন্দির। বিখ্যাত পঞ্চলিঙ্গের মধ্যে অম্ময় (অপ্ অর্থাৎ জলময়) লিঙ্গ এখানে বিরাজিত। জম্বুকেশ্বরের মন্দিরও সুবৃহৎ, এবং বহু কারুকার্য্যে

শোভিত। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন মন্দিরের সংস্কারকার্য্য চলিতেছিল। শুনিলাম,একজন শ্রেষ্ঠী মন্দিরটি সংস্কৃত করিবার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। প্রস্তরখণ্ড উৎকীর্ণ করিয়া সে সকল মূর্ত্তি গঠিত হইতেছিল, সেই মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন শিল্পকার্য্যের পার্শ্বে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভুবনেশ্বর, শ্রীরঙ্গম্ ও রামেশ্বরে প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্কার-কার্য্য দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছেন যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে শিল্পের যে অবনতি ঘটিয়াছে, শিল্পীর অভাব তাহার কারণ নহে। প্রকৃত কারণ এই যে, দেশের শিল্পীগণ যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পায় না। পূর্ব্বে হিন্দু নরপতি এবং বণিকগণ দেবমন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লইয়া মুক্তহস্তে কার্য্য আরম্ভ করিতেন। দূর-দূরান্তর হইতে শিল্পীগণ তথায় উপনীত হইত, এবং পরস্পরের প্রতি-যোগিতায় জাতীয় শিল্পের উন্নতিবিধান করিত। এক্ষণে সে অমিত-ব্যয়িতা নাই। আমরা ইংরেজী ফ্যাশনে বাড়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহার মধ্যে ভারতীয় শিল্পের কোনও বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার কথনও প্রয়াস করি না। যাঁহারা খুঁজিয়াছেন, তাঁহারা কথনও শিল্পীর অভাব অনুভব করেন নাই।

মন্দির দুইটি দেখিয়া আমরা দ্বিপ্রহরের পর ছত্রমে ফিরিয়া আসিলাম। প্রখর সূর্য্যকিরণে নগরের গৃহগুলি সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহাদেরই মধ্যে হইতে নগরের কেন্দ্রস্থলে ত্রিচিনাপল্লীর পর্ব্বত-দুর্গ হঠাৎ আকাশে সমুত্থিত দেখিলাম। পর্ব্বতের অনাবৃত পৃষ্ঠে সেনানিবাস, এবং সর্ব্বোচ্চ শিখরে গণেশের মন্দির শোভা পাইতেছিল। পর্ব্বতবেষ্টনকারী পথ ধরিয়া দুই চারিটি পথিক গতিশীল বিন্দুর ন্যায় যাতায়াত করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় আমাদের ট্রেণ। সহর হইতে কয়েকটি আবশ্যক বস্তু ক্রয় করিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া আমরা ষ্টেশনে চলিলাম। আমাদের ঝটকা

গুলি দ্রুতবেগে ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইল। পথের উভয় পার্শ্বে ফলবিক্রেত্রীগণ আতা ও আপেলের ঝুড়ি লইয়া বসিয়াছিল। রাজপথের নরনারীগণ গাড়ী দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছিল। গৃহ ও বৃক্ষগুলির শিরোভাগ অস্তোন্মুখ-সূর্য্য-কিরণে রঞ্জিত হইয়াছিল। কাল আমরা বহু দূরে চলিয়া যাইব। এই সকল দৃশ্য আর কখনও দেখিতে পাইব কি না সন্দেহ। এই চিন্তা সুন্দর দৃশ্যগুলির মধ্যে করুণ ভাব সঞ্চারিত করিল। দুই দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াও সংসারী জীবকে মায়ার বন্ধনে পড়িতে হয়!

রামেশ্বরম্ ও ধনুষ্কোটী

ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়িয়া আমরা জংশন ষ্টেশনে আসিয়া রামেশ্বরম্ এক্স্প্রেসের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথা সময়ে গাড়ী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। গাড়ীতে উঠিয়া আমরা শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। সমস্ত রাত্রি গাড়ী ছুটিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা মাদুরা ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিতে পাইলাম, রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বে নারিকেলের বাগান। বালুকাময় ভূমির উপর স্থানে স্থানে ঘোড়া ও গরু চরিতেছে। ক্বচিৎ দুই একটী লোকালয়। অনেকক্ষণ পরে গাড়ী মণ্ডপম্ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। লঙ্কা-যাত্রিগণকে এখানে আটক করিয়া রাখা হয়; ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া অনুমতি দিলে ইহারা লঙ্কা যাইতে পারে। ষ্টেশনের নিকটেই কুটীরগুলির মধ্য হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী আমাদের ট্রেণের দিকে, কৌতুহলের সহিত চাহিয়াছিল। ক্রমে রেল লাইনের উভয় পার্শ্বেই দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের নীল জল দেখা যাইতে লাগিল। অবশেষে ভূমি শেষ হইয়া গেল। আমাদের ট্রেণ সমুদ্রের উপরে সেতু দিয়া চলিতে লাগিল। রামেশ্বর সমুদ্র বেষ্টিত একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে ভারতভূমি হইতে ষ্টীমারে রামেশ্বর যাইতে হইত। আজ কাল উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ ও অগভীর সমুদ্রপ্রণালীর উপর একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুর উপর হইতে সমুদ্রের শোভা অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে—যত দূর দেখা যায়, নীল জল। জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ। তরঙ্গের উপর সূর্য্যকিরণ ক্রীড়া করিতেছিল। দূরে, স্থানে স্থানে, সমুদ্রের নীল বর্ণ গাঢ়তর হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দ্বীপের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছিল। রেলওয়ে সেতুর স্তম্ভগুলির চারি পাশে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দিয়া স্তম্ভগুলিকে দৃঢ়তর করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি সেই সকল প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছিল। ক্রমে আমরা পরপারে উপস্থিত হইলাম। এখানে গাড়ী অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া পুনরায় চলিতে লাগিল। পরের ষ্টেশনই রামেশ্বর। যে মহাতীর্থের নাম করিয়া আমরা সুদূর বঙ্গদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। উভয় পার্শ্বে ঘনবিন্যস্ত নারিকেল বৃক্ষের বাগানের মধ্য দিয়া গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে যথাসময়ে রামেশ্বর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের পাণ্ডা স্থির ছিল। ট্রেণ হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া আমরা গোযানে রামেশ্বরের বালুকাময় পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম।

আমাদের পাণ্ডামহারাজের বাটী মহারাষ্ট্র দেশে। কয়েক পুরুষ ধরিয়া এখানে তাঁহাদের বাস। শুনিলাম, এখানকার অধিকাংশ পাণ্ডাই মহারাষ্ট্র দেশ হইতে আসিয়াছে। কারণ, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ নাকি আর্য্য নহে। রামেশ্বরে বহুসংখ্যক পশ্চিমা লোক দেখিতে পাইলাম। তাহারা নানা কার্য্য উপলক্ষে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। আমরা প্রথমে আমাদের পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে স্নানাদি শেষ করিয়া মহাদেবের দর্শনের জন্য মন্দির-অভিমুখে চলিলাম।

মন্দিরের পশ্চিমদিকস্থ প্রবেশ-পথের উপরে একটী নাতিবৃহৎ গোপুরম্। তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে মন্দিরাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দোকান শঙ্খ, ঝিনুক, ছবি প্রভৃতি বিচিত্র দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দোকানগুলি অতিক্রম করিয়া আমরা মন্দিরের সুবিস্তীর্ণ বারাণ্ডাগুলির মধ্য দিয়া চলিতে

লাগিলাম। রামেশ্বরের মন্দিরের বারাণ্ডাগুলি দেখিবার জিনিস। দুই পার্শ্বে সুবৃহৎ স্তম্ভের শ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিবার পথ। বারাণ্ডা এত দীর্ঘ যে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় স্তম্ভগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া শেষ প্রান্তে অতিশয় ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়াছে, এবং ছাদ ও মেঝের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ অপর প্রান্তে গিয়া একটী ক্ষুদ্র রন্ধ্রে পরিণত হইয়াছে। স্তম্ভগুলির গাত্রে চূণ ও বালির কাজ। সুতরাং তাহার উপরের শিল্প কার্য্যগুলি বহু স্থলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছাদের উপর বিচিত্র বর্ণের ছবি। কোথাও শিল্পকার্য্য ও ছবি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, কোথাও বা তাহা বিলুপ্তপ্রায়। আমরা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত বারাণ্ডার অর্দ্ধেক অংশ অতিক্রম করিয়া মন্দিরের বিপরীত ভাগে—উপস্থিত হইলাম। এইখানে অর্থাৎ মন্দিরের পূর্ব্বভাগে—প্রধান প্রবেশপথ। ইহার উপরিস্থিত গোপুরম্‌টিও অতিশয় উচ্চ। এই পূর্ব্ব ধারে পাশাপাশি দুইটি বৃহৎ দ্বার অবস্থিত। যেটি বৃহত্তর সেইটির মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সোজা চলিয়া গেলে মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। দ্বিতীয় দ্বার হইতে পার্ব্বতীর মন্দির পর্য্যন্ত আর একটী পথ সরলভাবে বিস্তৃত। মহাদেবের মন্দিরে যাইবার পথে একটী সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজদণ্ড ও একটী সুবৃহৎ বৃষভ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়। পাণ্ডা ব্যতীত কাহারও নিকটে যাইবার অধিকার নাই। যাত্রীদিগের শিবলিঙ্গের উপর গঙ্গাজল ঢালিবার নিয়ম আছে। পাণ্ডাদের নিকট গঙ্গাজল কিনিতে পাওয়া যায়। এখানে গঙ্গাজল বহুমূল্য। এক গ্লাস জলের মূল্য ৩০৲ ৪০৲ টাকা হইবে। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন যে, এই গঙ্গাজল গঙ্গোত্রী হইতে ব্রাহ্মণের দ্বারা পদব্রজে ও শুদ্ধ অবস্থায় আনীত হইয়া থাকে।

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দাম এইরূপই হইবার কথা। এই বহু মূল্যে ক্রীত গঙ্গাজল যাত্রীরা নিজে ঢালিতে পারিবে না। পাণ্ডারা ঢালিয়া দিবেন, যাত্রীগণ দূর হইতে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিবে। এখানকার ভারতবিখ্যাত শিবলিঙ্গটি ক্ষুদ্র। এই প্রধান মন্দিরের উত্তরে কাশী-বিশ্বেশ্বরের মন্দির, দক্ষিণে কিয়দ্দূরে পার্ব্বতীর মন্দির। আমরা যে সময়ে গিয়াছিলাম, সেই সময় মন্দিরের অভ্যন্তরে সংস্কার কার্য্য চলিতেছে। বহুসংখ্যক কারিকর প্রস্তরের উপর বিবিধ মূর্ত্তি সকল অবলীলাক্রমে ফুটাইয়া তুলিতেছিল। তাহাদের পাথর কাটিবার যন্ত্রগুলির মিলিত শব্দে মন্দিরাভ্যন্তর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে খুব জনতা দেখিলাম। এই মন্দির দর্শন করিয়া আমরা পার্ব্বতীর মন্দিরে চলিলাম। এই মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণের উপর বহু কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত সুগঠিত রমণী-মূর্ত্তি বিরাজমান। পার্ব্বতীর মন্দিরের মধ্যে আলোক ও বাতাসের উপযুক্ত প্রবেশপথ নাই। দর্শনান্তর আমরা ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

অপরাহ্ণে আহারাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। ধর্ম্মশালার সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের চারি দিকে তীর্থযাত্রীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি বিস্রম্ভালাপে নিযুক্ত। ছোট ছোট বালকবালিকাগণ খেলা করিতেছিল। অধিকাংশ হিন্দুস্থানী যাত্রী। পাঞ্জাব, গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের লোকও ছিল।

রামেশ্বরে রামতীর্থ, লক্ষ্মণতীর্থ প্রভৃতি কয়েকটি সরোবর আছে। এই সকল সরোবরে স্নান করিবার নিয়ম আছে। সরোবরের জল তত নির্ম্মল নহে। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের মধ্যেই বহুসংখ্যক তীর্থ আছে এই সকল তীর্থের নাম,—সূর্য্যতীর্থ, নল, নীল, গবয়, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ইত্যাদি। এই সকল তীর্থের জল অতি

নির্ম্মল ও সুমিষ্ট রামেশ্বরের অধিবাসিগণ এই সকল তীর্থের জল পান করিয়া থাকে।

মন্দিরের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে—অতি নিকটে সমুদ্র। আমরা আশ্বিন মাসে গিয়াছিলাম সে সময় দেখিলাম, সমুদ্রের জল প্রশান্ত। দূরে নীল সমুদ্রের উপর শুভ্র পাল তুলিয়া দিয়া দুই চারিখানি নৌকা ভাসিতেছে।

মন্দিরের নিকটে শঙ্করাচার্য্যের মঠ। ইহা অতি ক্ষুদ্র ব্যাপার। এক কালে বোধ হয় ইহা বহু সন্ন্যাসীসমাকুল ছিল। এক্ষণে একটি শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি চিত্র মাত্র সম্বল লইয়া মঠের অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসী মঠপ্রতিষ্ঠাতার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন।

রামেশ্বর-যাত্রীগণের রামঝরকা দেখিতে যেন ভুল না হয়। এরূপ মনোহর স্থল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। লোকালয় হইতে বালুকাময় পথ ধরিয়া প্রায় দুই মাইল যাইতে হয়। স্থানটি একটি উচ্চ ভূমি-খণ্ডের উপর অবস্থিত। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশশোভিত পদচিহ্নের উপর একটি দ্বিতল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতলের উপর আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিকের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুলতাচ্ছাদিত বনভূমি। অদূরে বনরাজির মধ্য হইতে রামেশ্বরের গোপুরম্ দুইটি সমুন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান। চারি দিকে সমুদ্রের দিগন্তবিস্তৃত নীল জল। নৌকাগুলির শুভ্র পাল নীল সমুদ্রের গায়ে শ্বেতবিন্দুর ন্যায় দেখা যাইতেছিল ধনুষ্কোটি হইতে লঙ্কাযাত্রী ষ্টীমারের ধূমরাশি দক্ষিণ আকাশে মিলাইয়া যাইতেছিল। পশ্চিমে সমুদ্রের পর পারে ভারতবর্ষের তটভূমি "ধারানিবদ্ধ-কলঙ্করেখা"র ন্যায় শোভা পাইতেছিল। বহুক্ষণ মুগ্ধ হইয়া সেই নয়নমনোহর ছবি

দেখিলাম। সমস্ত দিন আকাশের উজ্জ্বল পথে বিচরণ করিয়া সূর্য্যদেব রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া পশ্চিমাকাশের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। সূর্য্যের মৃদু রশ্মিতে বনভূমির শিরোদেশ রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। চারিদিক যখন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন আমরা একান্ত অনিচ্ছায় সেই পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

রামঝরকার পদতলে একটী হনুমানের মন্দির আছে। তত্রত্য সাধু যাত্রীদিগকে ডাকিয়া হনুমানজীর প্রসাদ ছোলাসিদ্ধ ও মিছরী বিতরণ করিতেছিলেন। অদূরে একটী কূপের জল পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিলাম। প্রবাদ এই যে, সীতাদেবীর তৃষ্ণা-নিবারণার্থ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তীরের দ্বারা ভূমি-ভেদ করিয়া এই সুমিষ্ট জল আনয়ন করিয়াছিলেন।

ধনুষ্কোটী তীর্থ রামেশ্বর হইতে এগার মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে যখন ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, তখন ধনুষ্কোটী যাওয়া অতি কঠিন ছিল। এখন রেল হইয়াছে। লঙ্কা যাইবার এই প্রধান পথ। এবং ধনুষ্কোটী পর্য্যন্ত পথটী—কেবল অনায়াসসাধ্য নহে—অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়াছে। বেলা নয়টার সময় আমরা ট্রেণে উঠিলাম। সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই সমাগতযাত্রী দ্বারা গাড়ী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কয়েক মিনিট তালবনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। বামে ও দক্ষিণে সমুদ্র, অনতিবিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর দিয়া রেল চলিয়াছে। সে শোভা বর্ণনাতীত। উভয় পার্শ্বে দিগন্তবিস্তৃত নীল জল। দুই চারিটী ক্ষুদ্র নৌকা কৃষ্ণবিন্দুর ন্যায় বোধ হইতেছিল। বামের সমুদ্র হ্রদের জলের ন্যায় স্থির। দক্ষিণে সমুদ্র ঘোর গর্জ্জন করিতে করিতে ভয়ানক তরঙ্গ তুলিয়া তটভূমিতে আঘাত করিতেছিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে চলিয়া আমরা ধনুষ্কোটী

ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। যেখানে স্নান করিতে হয়, সে স্থান এখান হইতে দেড় মাইল বা দুই মাইল দূরবর্ত্তী। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে একটী ট্রেণ আমাদিগকে ধনুষ্কোটী তীর্থ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। ভূমি এখানে শেষ হইয়াছে, এবং বামের ও দক্ষিণের সমুদ্র এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ধনুষ্কোটীর শুভ্র তরঙ্গভঙ্গ অতি মনোহর। বামের ও দক্ষিণের সমুদ্র যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে তরঙ্গভঙ্গগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক শ্রেণীর পশ্চাতে আর এক শ্রেণী তাহার পশ্চাতে আর এক শ্রেণী, এই ভাবে নীল সমুদ্রের উপর শিশুর মনোহর হাস্যের ন্যায় শুভ্র শোভা বিকীর্ণ করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্র সর্ব্বত্রই সুন্দর। অনন্ত বিস্তার, অসীম রহস্য, ভীমকান্তি ও তাহার সহিত বালকের ন্যায় চঞ্চল ক্রীড়াশীলতা—এই সবগুলি মিলিয়া সমুদ্রকে অতিশয় চিত্তাকর্ষক করে। কিন্তু ধনুষ্কোটী তীর্থে সমুদ্রের যে শোভা দেখিয়াছি, আর কোথাও সে ছবি দেখি নাই। ঊর্দ্ধে অনন্তবিস্তৃত আকাশ, নীচে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। চারিদিকে নীল জল, কেবল এক খণ্ড সঙ্কীর্ণ ভূমি এক দিকে তীরভূমির সহিত যোগ করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভূমিখণ্ডের উপর যাত্রীদলকে কত ক্ষুদ্র ও কত অল্পসংখ্যক বলিয়া বোধ হইল। এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ কি ক্ষুদ্র!—কত ক্ষুদ্র আকৃতি, কত ক্ষুদ্র শক্তি, কত অল্প জ্ঞান এবং কত ক্ষণস্থায়ী জীবন! মানুষ তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যায়, এবং সমগ্র ক্ষুদ্র জীবন ধরিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ক্ষুদ্র দ্বেষ ও হিংসায় পরিপূর্ণ করে। একবার যদি সে সংসার হইতে আসিয়া এইরূপ স্থলে অল্পক্ষণ দাঁড়ায়, তাহা হইলে সে তাহার ক্ষুদ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এবং যে সকল ক্ষুদ্র চেষ্টায় সে জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের অসারতাও উপলব্ধি করিতে পারে। হে মানব! এই ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী

সংসার হইতে মন তুলিয়া লও এবং যিনি এই সৃষ্টি অপেক্ষাও বিশাল, তোমার মন তাঁহাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে শোক, তাপ, দুঃখ, কষ্ট, সবই উত্তোলিত পদ্মপত্র হইতে জল বিন্দুর ন্যায় ঝরিয়া পড়িবে।

রামেশ্বর হইতে আমাদের সঙ্গে পাণ্ডার পুরোহিত আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে সংকল্প করাইবার পর আমরা স্নান করিলাম। স্নান করিয়া যখন বালির উপর দিয়া রেলপথ-অভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন একটি সাধু আমাদিগকে তাঁহার আশ্রমে আহ্বান করিলেন। অদূরে তাঁহাদের পর্ণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র আশ্রম দেখা যাইতেছিল। এখানে অনেকগুলি সন্ন্যাসী ভগবদারাধনায় তাহাদের শান্ত ও পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদের সরল ও অমায়িক ব্যবহারে আমরা আপ্যায়িত হইলাম। তাঁহারা প্রসাদ খাইতে দিলেন, এবং দূর হইতে আনীত সুস্বাদু জল দ্বারা আমাদের পিপাসা দূর করিলেন। আমরা যখন চলিয়া আসিতেছিলাম, তখন একটি সন্নাসী একটী শ্লেটের উপর বাঙ্গলা বর্ণমালা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বৃদ্ধ। বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার শ্লেটের উপর অক্ষরগুলি লিখিয়া পরে কলিকাতায় আসিয়া একখানি বাঙ্গলা ও দেবনাগরী বর্ণমালার বহি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

ট্রেণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিল। যাত্রিগণ ট্রেণের ছায়ায় দাঁড়াইয়া সমুদ্রের বাতাসে তাহাদের সিক্ত বস্ত্র শুখাইতেছিল। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল। ধনুষ্কোটী ষ্টেশনে আমরা ফিরিয়া গেলাম। রামেশ্বরের ট্রেণ ছাড়িতে তখনও কয়েক মিনিট বিলম্ব ছিল। ষ্টেশনের পাশেই হোটেল। আমরা তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া আসিয়া ট্রেণে উঠিলাম। যখন রামেশ্বর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম, তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সূর্য্যের প্রখর কিরণে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া আমরা

নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

প্রবাদ এই যে রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাল্মীকির রামায়ণে এই কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। রাবণ-বধের পর শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন পুষ্পক রথ হইতে তিনি সীতাদেবীকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেখাইয়া বলিয়াছিলেন :—

অত্র পূর্ব্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভুঃ।
এতৎ তু দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ॥
সেতুবন্ধ ইতিখ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতং
এতৎ পবিত্রং পরমং মহাপাতকনাশনং॥

—লঙ্কাকাণ্ডম্, ১২৫ম সর্গ, ২০ও ২১ শ্লোক।

এই শ্লোকদ্বয়ের টীকাতে আছে যে, সমুদ্রের প্রসাদের অনন্তর সেতুবন্ধন করিবার পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র এ স্থানে শিবস্থাপন করিয়াছেন। কূর্ম্মপুরাণে এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে পুরাণ অনুসারে এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ধনুষ্কোটী তীর্থ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা হইতে ফিরিয়াছিলেন, তখন সমুদ্র তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, "প্রভো, আপনি আমাকে বন্ধন করিলেন। এক্ষণে শৃগাল কুক্কুরেও আমাকে অবজ্ঞা করিয়া পার হইয়া যাইবে। আমাকে এই অপমান হইতে রক্ষা করুন।" সমুদ্রের প্রার্থনায় ভগবানের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তাঁহার আদেশ অনুসারে লক্ষ্মণ ধনুর কোটী বা অগ্রভাগ দ্বারা সেতু তিন স্থান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্য এই স্থানটি ধনুষ্কোটী তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে

পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া আমরা রামেশ্বর হইতে যাত্রা করিলাম। বেলা নয়টার সময় গাড়ী ছাড়িল। সমুদ্রের উপরিস্থিত পুল হইতে

সৌরকিরণোজ্জল সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। অনেকগুলি ছোট ছোট নৌকা পাল তুলিয়া সমুদ্রের উপর ভাসিতেছিল। একজন ডুবুরি ডিঙ্গি হইতে নামিয়া সমুদ্রের অগভীর জলে বার বার ডুব দিতেছিল। অদূরে একটি ষ্টীমার ধোঁয়া উড়াইয়া পূর্ব্ব দিকে চলিয়া যাইতেছিল। অবশেষে আমরা ভারতবর্ষের তীরে উপস্থিত হইলাম। বেলা বারটার সময় আমরা রামনাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আড়াইটার সময় গাড়ী মাদুরা ষ্টেশনে থামিল।

মাদুরা একটী বড় জংশন ষ্টেশন। মাদ্রাজ হইতে তুতীকরীন ও রামেশ্বর যাইবার পথ মাদুরা হইতে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ষ্টেশনের নিকটেই তিন চারিটি ছত্রম্। প্রতি ছত্রমেই বহুসংখ্যক লোক রহিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়া আমরা একটী ছত্রে খালি ঘর পাইলাম। জিনিস পত্র রাখিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা মন্দির দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

মাদুরা অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীন নাম দক্ষিণ মথুরা। বর্ত্তমান নাম 'মাদুরা' মথুরা শব্দের অপভ্রংশ। সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে উচ্চ গোপুরম্। গোপুরম্ আপাদমস্তক মূর্ত্তি দ্বারা সমাবৃত। অন্যান্য স্থানের গোপুরম্‌গুলির স্থানে স্থানে মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মাদুরার গোপুরম্ মূর্ত্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমাবৃত মূর্ত্তিগুলি সত্য সত্যই অসংখ্য। আমাদের দর্শক মূর্ত্তিগুলি একে একে দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতেছিল। মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই পৌরাণিক। গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া আমরা বাঁধান প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের চরিধারে চারিটী গোপুরম্। এক পার্শ্বে শিল্পখচিত বহু-স্তম্ভশোভিত একটি মণ্ডপ। মন্দিরের একস্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট দোকানে নানা বা বিক্রীত

হইতেছে। চিত্রিত কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 'হল' দেখিতে পাইলাম। একটী পুষ্করিণী রহিয়াছে—তাহার চারিধারে বাঁধান সোপানশ্রেণী। তখন অপরাহ্ণ হইয়াছিল, বহুসংখ্যক লোক সেই পুষ্করিণীর জলে স্নান করিতেছিল। বিমান-মন্দিরের স্বর্ণনির্ম্মিত শীর্ষদেশের উপর অস্তাচলবিলম্বী সূর্য্যের রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হইতেছিল এবং সন্ধ্যাকালীন পূজা দর্শনার্থ সমাগত যাত্রীর ভীড়ে মন্দির প্রাঙ্গন সমাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র শাড়ী পরিধান করিয়া রমণীবৃন্দ দলে দলে মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইতেছিলেন। মন্দিরের মহাদেবের নাম সুন্দরেশ্বর, দেবীরনাম মীনাক্ষী দেবী। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী দরজায় অসংখ্য প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিগ্রহদ্বয় দর্শন করিয়া আমরা রাত্রে ছত্রমে ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে মাদুরার রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। সুবৃহৎ স্তম্ভ, উচ্চ ছাদ, এবং বড় বড় খিলান-সংযুক্ত রাজপ্রাসাদের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এখানে আপাততঃ সরকারী আফিস হইতেছে। কোথাও লেখা আছে Registration office. কোথাও লেখা আছে Sub-collector's Court. একটী সুন্দর ও সুবৃহৎ শয়নকক্ষ বিচার গৃহে পরিণত হইয়াছে। যে উচ্চমঞ্চের উপর পালঙ্ক পাতিয়া নৃপতি শয়ন করিতেন তাহার উপর হাকিমের এজলাস হইয়াছে; যে সুবিস্তৃত হর্ম্ম্যতলে নর্ত্তকীগণ নৃত্য গীত দ্বারা রাজার নিদ্রা আকর্ষন করিত, সেখানে এক্ষণে সাক্ষীদিগকে হলপ পড়াইয়া জেরা করা হয়! কি বিসদৃশ পরিণাম!

নগরের কিছু দূরে তেপ্পাকুলাম নামক বৃহৎ সরোবর। সরোবরের মধ্যে একটী দ্বীপের উপর মন্দির, এবং নানাবিধ ফলের বাগান। উৎসবের সময় সুন্দরেশ্বরের ও মীনাক্ষী দেবীর ভোগ-মূর্ত্তি এই পুষ্করিণীর উপর নৌবিহার করেন। সেই সময় চারিদিকে প্রদীপ দিয়া সাজান হয়

এবং অগণিত ভক্ত সমাগত হইয়া আনন্দ করিতে থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন সমাগত হইয়া দক্ষিণ মথুরা বা মাদুরাতে আগমন করিয়াছিলেন, তখন একজন রামভক্ত ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে উপবাসী ও দুঃখিত দেখিয়া প্রভু দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

প্রভু কহে বিপ্র কাহে কর উপবাস।
কেন এত দুঃখ কেন করহ হুতাশ॥
বিপ্র কহে মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কানে শুনি॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥
প্রভু বলে এ ভাবনা নাহি কর আর।
পণ্ডিত হঞা মনে নাহি করহ বিচার॥
ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তারে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শনে।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণে॥
রাবণে আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে।

পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে ॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ ॥

ইহার পর মহাপ্রভু সেতুবন্ধে গিয়া কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, রাবণকে দেখিয়া সীতা অগ্নির শরণ লইলেন, এবং রাবণ মায়া সীতাকে হরণ করিলেন। তখন প্রভুর এত আনন্দ হইল যে, পুরাতন পুঁথির ঐ অংশ নকল করিয়া তাহা প্রাচীন পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করিলেন, এবং পুঁথির সেই অংশ লইয়াই দক্ষিণ-মথুরাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রামদাস বিপ্রকে সেই অংশ পাঠ করাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

বেলা তিনটার সময় মাদুরা হইতে Ceylon Boat mailএ চড়িলাম। মাদুরা হইতে ত্রিচিনাপল্লী পথটি অতি সুন্দর। কখনও দূরে আকাশের গায়ে ঘন নীল পর্ব্বতশ্রেণী শোভা পাইতেছে; কখনও রেল-লাইনের পাশেই ছোট ছোট পাহাড়গুলি দাঁড়াইয়া আছে। ঘনবিন্যস্ত তরুলতায় পর্ব্বতগাত্র সমাচ্ছাদিত। তাহার মধ্য দিয়া পাহাড়ে উঠিবার পথগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরে উঠিয়াছে। কোন ছোট পাহাড়ের ঠিক মাঝ-খান দিয়া সাদা পথটি সোজা ভাবে চলিয়া গিয়াছে, যেন সুবিন্যস্ত কোঁকড়ান চুলের মধ্য দিয়া সোজা সিঁতে কাটা হইয়াছে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা অধিত্যকার উপর কোথাও দুই চারিটি ক্ষুদ্র কুটীর, এবং কুটিরের চারিদিকে শস্যক্ষেত্র শোভা পাইতেছে। এখানে যাহারা বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত অতিবাহিত করে তাহাদের জীবন কি শান্তিময়! সভ্যতার সকল আড়ম্বরের বিনিময়ে এই শান্তিময় জীবন কত বেশী বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। মনে ত হয়, কিন্তু দারিদ্র ও অভাবের পীড়নে এখানকার অধিবাসীদের বাস্তবিক জীবন কিরূপ, তাহা কে বলিতে

পারে? এখানকার ভূমি বেশ উর্ব্বর। শস্যক্ষেত্রগুলি সমৃদ্ধিশালী। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি কৃষকপল্লী দেখা যাইতেছিল। কৃষক ও কৃষক রমণীগণ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল। বালক বালিকারা কুটীর সংলগ্ন অঙ্গনে খেলা করিতেছিল। সূর্য্যালোক মৃদু, মৃদুতর হইয়া অবশেষে ম্লান হইয়া গেল। সন্ধ্যা আসিয়া পৃথিবীর উপরের এই সুন্দর বিচিত্র দৃশ্যের উপর তাহার অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দিল। আকাশে দুই চারিটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর গাড়ী ত্রিচিনাপল্লী ষ্টেশনে পঁহুছিল। ত্রিচিনাপল্লীতে গাড়ী ত্রিশ মিনিট দাঁড়ায়। ষ্টেশনে হিন্দুদের হোটেল ছিল। আমরা সেখানে ভাত খাইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিতে লাগিল। চিঙ্গলপৎ ষ্টেশনে প্রভাত হইল। এখান হইতে মান্দ্রাজ দেড় ঘণ্টার পথ। সেণ্ট টমাস মাউণ্ট, সৈদাপেট, মম্বালম প্রভৃতি মান্দ্রাজের উপনগরস্থ ষ্টেশনগুলি অতিক্রম করিয়া আটটার পূর্ব্বে আমরা মান্দ্রাজের অন্তর্গত এগমোর ষ্টেশনে পঁহুছিলাম।

মান্দ্রাজে এখানকার মত বন্ধ গাড়ী নাই। সবগুলিই ফিটন গাড়ী। ইহার কারণ মান্দ্রাজে অবরোধ-প্রথা নাই, সুতরাং মেয়েদের জন্য চারি-দিক—বন্ধ গাড়ীর প্রয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকেরা ফিটন-গাড়ীতে বসিয়া যাতায়াত করেন। এই গাড়ীতে মাল লইবার সুবিধা নাই। যাহা হউক, একটা গাড়ী করিয়া আমরা মীলাপুরস্থ বন্ধুর বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বন্ধুর আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া অপরাহ্নে মীলাপুরস্থ শিবমন্দির দেখিতে গেলাম। একটী বৃহৎ বাঁধান সরোবরের পূর্ব্বদিকে এই মন্দির অবস্থিত। সরোবরের অপর তিনদিকে সুপ্রশস্ত রাজপথ ও অট্টালিকাশ্রেণী। মন্দিরের গোপুরম্, প্রশস্ত অঙ্গন ও শিল্পকার্য্যখচিত চত্বর দেখিয়া আমরা সমুদ্র-অভিমুখে

চলিলাম। সমুদ্রের ধারে একটী সুন্দর রাজপথ আছে; তাহাকে "মেরিনা" বলে। দিগন্তবিস্তৃত নীল জল ও তরঙ্গাভিহত তটভূমি দেখিতে দেখিতে বহুদূর পর্যান্ত বিস্তৃত এই সুদীর্ঘ পথে আমরা গাড়ী করিয়া যাইতেছিলাম। পথের ধারে প্রায়ই মাঠ—কচিৎ দুই একটী গৃহ দেখা যাইতেছে। দূরে হাইকোর্ট, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় মান্দ্রাজ-মেলে আমরা কলিকাতা ফিরিলাম। সারা রাত্রি গাড়ী চলিল। এলোর ষ্টেশনে প্রভাত হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে গাড়ী গোদাবরীর পুলের উপর উপস্থিত হইল। এই পুল ভারতবর্ষের মধ্যে দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সাগর-সঙ্গম-সন্নিকটে নদী অতি বিশালকায় ধারণ করিয়াছে। বিশেষতঃ সে বৎসর দীর্ঘকালস্থায়ী বর্ষার ফলে শরৎকালেও নদীগুলি প্রসন্নকান্তি ধারণ করিতে পারে নাই। গৈরিক বর্ণের বারিরাশিতে গোদাবরী কূলে কূলে পরিপূর্ণ। তীরবিরাজিত বৃক্ষশ্রেণীর পশ্চাতে নগরের মন্দিরচূড়াগুলি দেখা যাইতেছিল। বহুক্ষণ আমরা সে সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করিতে পারিলাম। অবশেষে পুল পার হইয়া গেল। গাড়ী নদীর ঠিক পার্শ্বেই অবস্থিত গোদাবরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

তীর্থযাত্রীগণ এইখানে নামিয়া থাকে। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী রাজামন্ত্রীই বড় ষ্টেশন। তেলেগু দেশের মধ্যে রাজামন্ত্রী একটী প্রধান নগরী। রাজামন্ত্রী ছাড়িয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে গোদাবরী-সলিলপুষ্ট 'কেনেল' (canal) বা খালগুলি দেখা যাইতেছিল। খালের মধ্যে নৌকা ভাসিতেছিল। খালের উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ তীরের উপর দিয়া লোক চলিতেছিল। ক্ষেত্রে প্রচুর-পরিমাণে শস্য হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে আমরা জনপদ দেখিতে

পাইতেছিলাম। ঘাটে লোকজন স্নান করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা কক্ষস্থ কুম্ভ পূর্ণ করিয়া জল লইয়া মৃদুপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিতেছে। সামলকোট জংশন ও টুন ষ্টেশন পার হইয়া সাড়ে বারটার সময় গাড়ী ওয়ালটেয়ারে উপস্থিত হইল। এইবার বি-এন্-আর্ আরম্ভ হইল। পথ আর শেষ হয় না। গাড়ী এক একবার বড় ষ্টেশনে দাঁড়ায়, আবার পূর্ণ বেগে দৌড়ায়। ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমাস্থিত প্রায় সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যটি আমরা অতিক্রম করিতেছিলাম। সেদিন রৌদ্র তেমন প্রখর ছিল না। গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়া আমাদের ক্লান্ত শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ করিতেছিল। উন্মুক্ত প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যাবলী তাহাদের প্রাচুর্য্যে আমাদের চক্ষু ও মন অভিভূত করিতেছিল। দুপুর কাটিয়া গেল, বৈকাল হইল, বৈকালও ফুরাইয়া গেল। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীর উপর রহস্যপূর্ণ আবরণ টানিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর গাড়ী বহরমপুর ষ্টেশনে পঁহুছিল। প্লাটফরমের আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যাত্রিগণ ব্যস্তভাবে চলাফেরা করিতেছিল। কয়েকটি সুসজ্জিত ভদ্রলোক ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বহরমপুরে গাড়ী অনেকক্ষণ দাঁড়াইল। তাহার পর হুস্ হুস্ শব্দ করিতে করিতে অন্ধকারে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক রাত্রি এক দিন ট্রেণে কাটিয়া গেল। সুবিধামত আহার হয় নাই। শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং অল্প অল্প নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল। আমাদের স্থির ছিল, খুর্দ্দায় নামিয়া ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া সকালের গাড়ীতে পুরী যাইব। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় গাড়ী খুর্দ্দায় পঁহুছিবে। আমরা খুর্দ্দার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়া কখন অতর্কিতভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়া-

ছিলাম, আর একটু হইলেই খুর্দ্দা পার হইয়া যাইত। ভাগ্যক্রমে খুর্দ্দা ষ্টেশনেই জাগিয়া উঠিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া বিশ্রামঘরে গিয়া বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলাম।

সকালের ট্রেণে পুরী যাত্রা করিলাম। রেল হইতে উড়িয়া গ্রামগুলির মধ্যে গৃহকর্ম্মনিরত উড়িয়া-রমণীগণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তাহারা হলদে রংয়ের কাপড় ছোট করিয়া পরিয়াছে, হাতে ও পায়ে বড় বড় ভারী গহনা রহিয়াছে। ষ্টেশনগুলিতে যাত্রীর খুব ভিড়। গাড়ী ষ্টেশনে আসিলেই তাহারা গাড়ীতে স্থান পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছিল। এইভাবে কয়েকটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমরা পুরী পঁহুছিলাম।

পুরীতে আমরা এবার কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। পুরীর সুপ্রশস্ত রাজপথ, বহুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্যগোচর জগন্নাথদেবের মন্দির, মন্দিরে যাত্রীর সমাগম, তাহাদের ভক্তি-বিহ্বল মুখচ্ছবি, মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ, সমুদ্রের রুদ্র ও মনোহর দৃশ্য ও তরঙ্গাবলির ভীষণ আস্ফালন—সকলই সুন্দর, এবং আজ কাল রেল হওয়াতে বহু বাঙ্গালীর সুপরিচিত। সন্ধ্যার সময় পুরী এক্‌প্রেসে আমরা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম।

প্রভাতে উঠিয়া সেই চিরপরিচিত বাঙ্গলা দেশের শোভা দেখিতে পাইলাম। দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র। মধ্যে মধ্যে সবুজ সমুদ্রে দ্বীপের ন্যায় ঘন তরুরাজিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম কোথাও রেল-লাইনের পার্শ্বে ছোট ছোট পুষ্করিণী এবং দুই চারিটি কৃষকদের কুটীর। চাষার মেয়েরা স্নান করিতেছিল। অল্প অল্প শীত পড়িয়াছিল, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দোলাই বাঁধিয়া প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে পরিচিত ষ্টেশনগুলি পার হইয়া গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

"চুঁচুড়ার কিনারায় যাঁর পীঠস্থান
হৃদয় ক্ষীরের খনি আকারে পাঠান।
হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা জ্ঞানগুড়ে
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রত সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে
দেশের দোছোট বটো—যোদ্ধা কথা গড়ে
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা তাল
সেকালের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ
দেখো হে পুতুল রাজা বাঙ্গালীর বা ঘ।"

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"সুভবা ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন।
গুরু-মহাশয় গুরু শুভ দরশন;
বঙ্গদেশ সাহিত্যের উন্নতি সাধক।
কাটিছেন সযতনে অজ্ঞান কণ্টক॥" ৺দীনবন্ধু মিত্র।

বঙ্গীয় গগনের গৌরবরবি, প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বঙ্গ সাহিত্য ও সমাজের শিক্ষাগুরু, প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া বাঙ্গালীকে দিতে হইবে না। পাশ্চত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আদিযুগে বঙ্গদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চত্য আদর্শে যখন দারুণ সংঘর্ষ বাঁধিয়াছিল, পরধর্ম্মের বিপুল মোহে স্বধর্ম্ম যখন বাঙ্গালীর চোখে নিতান্তই দরিদ্র, ম্লান বলিয়া অনুভূত হইতেছিল, দেশের দুর্দ্দিনে যখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিজাতীয় ভাবের অনুকরণে বিভোর হইয়াছেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন বাঙ্গলা জানেন না বলিতে গৌরব বোধ করেন, সেই শঙ্কট সময়ে চরিত্রের অটল মহিমায় প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে যিনি জাতীয়তার বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন—

আমাদের আচার, নীতি, আদর্শের গভীর মহিমা সুদৃঢ় যুক্তির সহায়তা বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন ;—ভারতের নবযুগের প্রবর্ত্তক, স্বদেশী-মন্ত্রের আদি পুরোহিত, শক্তিশালী বাঙ্গালীর পবিত্র রচনাবলী বাঙ্গালী হইয়া যিনি না পড়িলেন, তাঁহার বাঙ্গালী জীবনই বৃথা হইল। আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ দেশভক্ত এবং আদর্শ জ্ঞানীর এরূপ একত্র সমাবেত জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শিক্ষার প্রচার, সমাজের উন্নতি এবং জাতীয় গৌরবের স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি জীবনপাত করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার আজীবনের সঞ্চয় হইতে একলক্ষ ষাটি হাজার টাকা শিক্ষা লোকযার্থে ও আর্ত্তের সাহায্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা, সমাজ, আচার বিষয়ক পুস্তকাবলী, তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক মধুর সমালোচনা, তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলী', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গলার গৌরবের বস্তু। তাঁহার আলোক-সামান্য প্রতিভা, স্বজাতি প্রীতি, অপূর্ব্ব চরিত্র, উদার বিচার বুদ্ধি তাঁহাকে স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র পূজ্য করিয়াছে। তিনি রাজকীয় সি, আই, ই, উপাধি পাইয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন, বঙ্গবিহারে স্কুল পরিদর্শকরূপে বহু কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত তাঁহার গৌরব নহে। তাঁহার গৌরব তিনি স্বজাতিকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, দেশে একতা আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিহার প্রদেশে আদালত সমূহে হিন্দিভাষা প্রচলন প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সামাজিকতায় হিন্দুমুসলমান খৃষ্টানে যিনি কোন দিন ভেদ করেন নাই—ঋষির তুল্য নৈষ্ঠিক, জ্ঞানী ভূদেবের জ্ঞানের ফল অমূল্য গ্রন্থরাজি বাঙ্গালী পঞ্জিকার মত গৃহে গৃহে রক্ষা করুন। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হউক।

১৩এ, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত :—

পারিবারিক প্রবন্ধ

বাঙ্গালী পাঠককে পারিবারিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; উহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সমাদৃত। যিনি জীবনকে শান্তিময়, সুখময় করিতে চাহেন—গৃহ হইতে নানা প্রকার অশান্তি, বিদ্বেষ, হীনতা দূর করিতে চাহেন, তিনি গ্রন্থ পাঠে প্রভূত সহায়তা পাইবেন। লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কিরূপ ভাবে চলিলে মানুষ উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইতে পারে, তাহার পক্ষে কি অপ্রাপ্য থাকে না, আমাদের এই পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ তাহা নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার পরম স্নেহের দেশবাসীর কল্যাণ জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দাম্পত্য-প্রণয়, উদ্বাহ-সংস্কার, সতীর ধর্ম্ম, সৌভাগ্য-গর্ব্ব, দম্পত্য কলহ, লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপনা, কুটম্বিতা, পিতামাতা, সন্তানের শিক্ষা, পুত্রকন্যার শিক্ষা, পুত্রবধূ, রোগীর সেবা, চাকর প্রতিপালন, পশু পালন, অতিথি-সৎকার, স্ত্রীশিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, ভাইভগিনী, শিক্ষাভিত্তি কাজকরা, অর্থসঞ্চয়, শয়ন, নিদ্রা, ভোজন, গৃহশূন্যতা, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ প্রভৃতি বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে।

স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু এই পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থকারের অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা প্রসূত। কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ অধিক হয়, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পাঠ্য এমন সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই।"

"আমার জীবনে যে সকল ভুল করিয়াছি, দশবৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি পাইলে তাহার অনেকগুলি হইতে রক্ষা পাইতাম।"

—৺চন্দ্রনাথ বসু।

১৩।এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার, উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, সুন্দর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই, মূল্য ১৷৷৹ (এক টাকা আট আনা)।

আচার প্রবন্ধ

এ দেশের জলবায়ুর উপযুক্ত এবং অল্প আয়াস ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য কিরূপ বিধি পালন করিলে শরীর এবং মনের দৃঢ়তা, পটুতা ও উদারতা বৃদ্ধি হয় এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় এবং কি[illegible] এই জীবন সুখের হইতে পারে, তাহা এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সকলেরই পক্ষে ইহা একান্তই প্রয়োজনীয় পুস্তক।

উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য আড়াই টাকা।

কলিকাতা রিভিউ বলেন—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু অর্থ দান করিয়া জন্মভূমির অশেষ হিতের উপায় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধ প্রণয়ণ করিয়া যে অমূল্য রত্নরাজী রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি তজ্জন্য স্বদেশবাসীগণের নিকট বহুগুণ অধিক কৃতজ্ঞতার ভাজন।
